সাহারা

THE BANGIYA READING LIBRARY · CALCUTTA · ESTD. 1883

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যারত্ন এম্ এ প্রণীত।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৩৩৪

১৷০
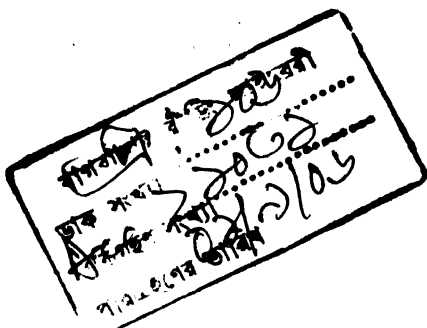
কলিকাতা

১৬।১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এবং

১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উপহার
D. Banerji

CALCUTTA. ESTD. 1888
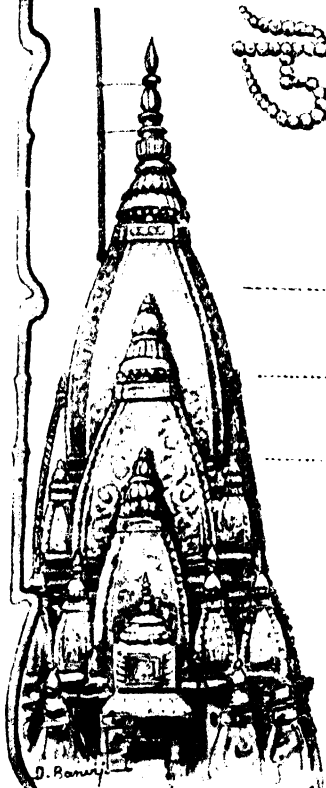
নিবেদন

'ফোয়ারা'য় বলিয়াছিলাম যে মরুভূমিতে ফোয়ারার ন্যায় আমার মত 'শিক্ষকের শুষ্কজীবনেও মাঝে মাঝে ভাবের ফোয়ারা খেলে।' 'পাগলা ঝোরা'য়ও তাহারই জের চলিয়াছিল, তবে শেষ দিকে 'বিশ্বেশ্বরের বিধানে আমার হাসির ফোয়ারা শুকাইয়াছে।' এক্ষণে চক্রীর চক্রের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তনে আমার জীবন সম্পূর্ণভাবে 'সাহারা'য় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি ঐ নামে অভিহিত হইল। এ অবস্থায় পূর্ব্বের মত ষোল ধারা, আঠারো ধারা, বা বিশ ধারা (বিষ-ধারা নহে) কোথা হইতে আসিবে? কষ্টে-সৃষ্টে বারো ধারা, তাহার সঙ্গে 'শেষ কথা' যুড়িয়া দিয়া যোগে-যাগে তেরো ধারা, এবং অপরের নিকট ধার-করা একটি ধারা গছাইয়া দিয়াও যোড়া-তাড়া দিয়া চৌদ্দ ধারার বেশী আর যুটিল না। অপরেরটি বাদ দিলে অন্যগুলিতে নির্ম্মল রসধারা অপেক্ষা ফেনার পরিমাণই বেশী।

মরুভূমিতে মৃগ-তৃষ্ণিকার বিড়ম্বনা আছে। 'সাহারা'য়ও তাহার অভাব নাই। দূর হইতে দেখিলে যাহা স্বাদু স্নিগ্ধ বারিধারা বলিয়া মনে হইবে, নিকটে গেলে দেখিবেন তাহা ধূ-ধূ বালি ভিন্ন আর কিছুই নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতে পারি, 'ভোজন-সাধন' নাম দেখিয়া এক শ্রেণীর পাঠকের কত না উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি হইবে, কিন্তু পাঠান্তে দেখিবেন, ইহা ভোজনের ছেঁদো কথায়ই পর্য্যবসিত। কাযে কিছুই নাই,—অর্থাৎ প্রবন্ধের কোথাও মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ-পত্র নাই! আরব্যোপন্যাসের Barmecide feastএর ন্যায়, গ্রাম্য প্রবাদ-বাক্যের 'মনে মনে রসবড়া খাওয়া'র ন্যায়, এ সব নিতান্তই বাজে বকুনি, ফাঁকা আওয়াজ, 'মধু নাইকো শুধুই তুলো'।

যাঁহারা সাহিত্যের রসাল ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নাম আমদানি করিলে রসভঙ্গের আশঙ্কা করেন, তাঁহারা না হয় ধরিয়া লইবেন যে আগাগোড়াই আহারের ব্যাপারের আলোচনা আছে বলিয়া পুস্তকের নাম 'সা-হারা।' (শেষের 'আ'-কারটি বাঙ্গালা ভাষার 'বিশেষত্ব'; যথা,—সুন্দরাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড, কাশীপরিক্রমা প্রভৃতি।—ইতি 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'-কারের টিপ্পনী)। ফল কথা, ইহাতে কাব্যের নবরস না পাইলেও চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়ের ষড়্‌রসের আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

বলা বাহুল্য, প্রবন্ধগুলি নিতান্ত একঘেয়ে। তথাপি সহৃদয় পাঠক যদি এতৎপাঠে কিঞ্চিৎ কালও অতিবাহিত করিতে পারেন ও কণামাত্রও আনন্দ আদায় করিতে পারেন, তাহা হইলে লেখকের আয়াস নিতান্ত পণ্ড-শ্রম হইবে না। আনন্দের সহিত শিক্ষাদান লেখকের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং কেহ যেন এই পুস্তক হইতে শিক্ষালাভের আশা না করেন। বিলাতী সুলেখক (সম্প্রতি পরলোকগত) Jerome. K. Jeromeএর কথায় বলি,—

What readers ask nowadays in a book is that it should improve, instruct and elevate. This book wouldn't elevate a cow. I cannot conscientiously recommend it for any useful purpose whatever. All that I can suggest is that when you get tired of reading "the best hundred books," you may take this up for half-an-hour. It will be a change.—[*Preface to* THE IDLE THOUGHTS OF AN IDLE FELLOW, *A Book for an Idle Holiday.*]

কলিকাতা
১লা আশ্বিন ১৩৩৪ } শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা

৺কাশী-বিশ্বেশ্বরের স্মৃতি ইদানীং মনে আসিলেই
যাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি ও স্নিগ্ধ কথালাপের স্মৃতিও উজ্জীবিত হয়,

৺কাশীবাসকালে যাঁহার সঙ্গ-সুখে কখনও বা ধন্য
কখনও বা বঞ্চিত হইয়াছি,

যাঁহার 'কাশীর কিঞ্চিৎ' হইতে বঙ্গীয় পাঠক
৺কাশীর জীবন-বৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব আস্বাদ পাইয়াছেন,

'সাহারা'র প্রবন্ধাবলি-রচনায়
যাঁহার সাহায্য ও সমবেদনা-লাভে কৃতার্থ হইয়াছি,

সেই সরস সাহিত্যস্রষ্টা, সাহিত্য-রসিক
ও সাহিত্য-সেবায় উৎসৃষ্টপ্রাণ,

'কাশীর কিঞ্চিৎ'এর নন্দিশর্ম্মা,
'চীনযাত্রা'র 'যাত্রী,' 'শেষ খেয়া'র খেয়ারি,
'কোষ্ঠীর ফলাফলে'র ব্যাখ্যাতা
'আমরা কি ও কে' ইত্যাকার প্রশ্নের উত্থাপক ও মীমাংসক,

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়ের করকমলে

এই সামান্য পুস্তকখানি
শ্রদ্ধা, প্রীতি, মৈত্রী ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ
উপহার দিলাম। ইতি

কলিকাতা
১লা আশ্বিন ১৩৩৪

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

ফোয়ারা (শোভন চতুর্থ সংস্করণ, পরিশিষ্ট-সমেত) ১॥০
পাগলা ঝোরা (দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত) ২৲
কাব্যসুধা (ননদ-ভাজ ইত্যাদি বঙ্কিম-সমালোচনা) ১৲
কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব (২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত) ॥০
অনুপ্রাস (চারিবর্ণে মুদ্রিত হরগৌরীর চিত্র-সমেত) ॥০
সখী (বঙ্কিম-সমালোচনা) ॥০
প্রেমের কথা ॥০
মোহিনী (ছোট গল্প) ॥০
ককারের অহঙ্কার (২য় সংস্করণ) ।/০
ব্যাকরণ-বিভীষিকা (৩য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত) ॥০
বাণান-সমস্যা (২য় সংস্করণ) ।০
সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা ৵০
* ছড়া ও গল্প (৫ম সংস্করণ) ॥০
* আহ্লাদে আটখানা (৩য় সংস্করণ) ॥০
* রসকরা ॥০
* সাত নদী ॥৵০

* বালকবালিকাদিগের পাঠ্য।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
১৬।১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

নৌকা—বর্ষার দৃশ্য
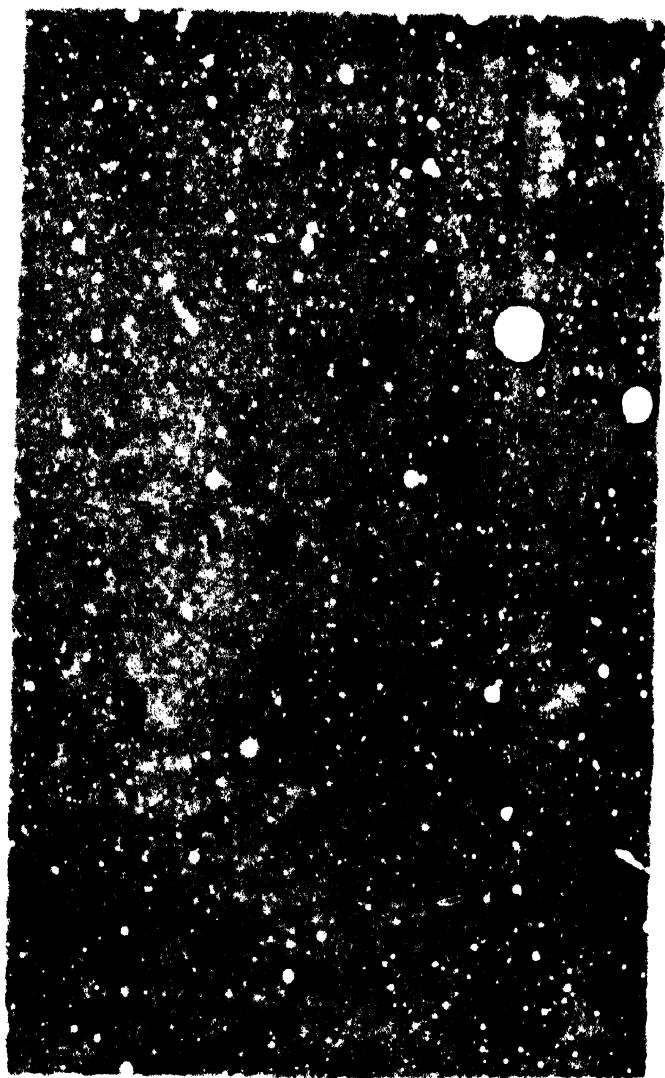
সাহারা

কাশীর বৈশিষ্ট্য

('ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩৩০)

[বৎসরাধিক কাল পরে—(এই দীর্ঘকাল রোগশোকার্ত্ত লেখকের নিকট দীর্ঘতর প্রতীয়মান হইয়াছে)—আবার 'ভারতবর্ষে' দর্শন দিলাম, পাঠক-নারায়ণের নিকট অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হইলাম। কিন্তু যে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে আমোদর শর্ম্মার বেনামীতে 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষে'র চাষ করিয়াছিলাম, 'বঙ্কিম-চর্চ্চরী' বানাইয়াছিলাম এবং 'বিচিত্র বর্ণবোধে'র সচিত্র পরিচয় দিয়াছিলাম, অথবা স্বনামীতে 'বিবাহে বিবিধ বাধা' ঘটাইয়াছিলাম ও 'ধর্ম্মে মতি' স্থির রাখিয়াছিলাম, সে স্ফূর্ত্তি সে আনন্দ আর নাই।[১] আবার যে শ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে 'সতীন ও সংমা', 'মা', 'ছদ্মবেশ', 'সখী', 'প্রেমের কথা' ও 'বিধবা'-বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা মাসের পর মাস চালাইয়া পাঠক-সম্প্রদায়ের ধৈর্য্য-পরীক্ষা করিয়াছিলাম, সে শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ও আর নাই। আজ এই গ্রহ-নিগৃহীত লেখক রোগজীর্ণ-দেহ, শোকদীর্ণ-হৃদয়। যাক্, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নিদারুণ করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া পাঠকের মনে অনর্থক কষ্ট দিতে চাহি না, পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করিতেও চাহি না। দীনের এই অর্ঘ্যে তুলসীচন্দন ও উদ্যান-জাত মনোহর সুরভিসার পুষ্পসম্ভার নাই, আছে শুধু বিল্বদল ও গঙ্গাজল—তবে সে বিল্বদল 'আনন্দ-কাননে' চয়ন করিয়াছি, সে 'গঙ্গাজল-লব-কণিকা' 'কাশীতলবাহিনী গঙ্গা' হইতে উত্তোলন করিয়াছি। ইতি মুখবন্ধ।]

---

(১) উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি 'পাগলা ঝোরা'য় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। 'সখী' ও 'প্রেমের কথা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি আজও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয় নাই।

'সা কাশী ত্রিপুরারিরাজনগরী পায়াদপায়াজ্জগৎ।'

বিষয়—আমার সেই চিরপ্রিয়, চিরশ্রেয়ঃ, চির-আকাঙ্ক্ষিত, চির-আরাধিত কাশী, হিন্দুর কাছে চির-পুরাতন, চিরনূতন, 'সকল তীর্থের রাণী' কাশী। কাশী, বারাণসী, অবিমুক্তক্ষেত্র, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান, আনন্দ-কানন, স্বর্গভূমি—কাশীর কতই নাম! কিন্তু আমার কাছে—ভক্ত হনুমানের কাছে যেমন 'রামঃ কমললোচনঃ'[২] তেমনি—'কাশী' এই দুই অক্ষরে ছোট্ট সুখোচ্চার্য্য নামটিই সব চেয়ে মিষ্ট লাগে। তাই প্রবন্ধের নামকরণে 'বারাণসীর বৈশিষ্ট্য' বসাইলে যদিও অনুপ্রাস সুপ্রকাশ হইত, তবুও সে লোভ সংবরণ করিয়াছি।

অনেক কাল হইতে এই পুণ্যধামে অনেকেই আসিয়াছেন। বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেব, শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য, কবীর, তুলসীদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দস্বামী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কৃষ্ণানন্দস্বামী ইত্যাদি অনেক দেবাত্মা বা দেবকল্প মহাপুরুষ কাশীধাম দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কাশীধামকেও ধন্য করিয়াছেন। দুইজন জৈন তীর্থঙ্কর—সুপার্শ্ব ও পার্শ্বনাথ—এই পুণ্যভূমিতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার বিদেশ হইতে, সেকালের চৈনিক পরিব্রাজক ধার্ম্মিকপ্রবর হিউএন্ সিয়াং, একালের মার্কিন পর্য্যাটক রসিকপ্রবর মার্ক্ টোয়েন্, প্রাচ্যের মোহমুগ্ধ ফরাসী লেখক পিয়ের্ লোটি, প্রাচ্যকলার পক্ষপাতী সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সহৃদয় ইংরেজ হেভেল্ (Havell) সাহেব, হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী স্থূলদর্শী খ্রীষ্টান্ মিশনারি পাদরী—ইঁহারাও আসিয়া 'ভুবনসুন্দরী বারাণসী'র সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্য দেখিয়া

---

২ শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

চমৎকৃত হইয়াছেন, কাশীদর্শনে ইঁহাদিগেরও হৃদয়-ফলকে একটা গভীর ছাপ (profound impression) পড়িয়াছে। সেকেলে 'পৌত্তলিক' প্রৌঢ় মহারাজ ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে একরূপ চোখে কাশী দেখিয়াছেন,[৩] আর একেলে 'অপৌত্তলিক হিন্দু' মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র যুবা ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একরূপ চোখে কাশী দেখিয়াছেন ;[৪] কিন্তু উভয়েই কাশীর সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার গুণগান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনে'র রিপোর্টার্ কাশীর উল্টা পিঠটা মসীলাঞ্ছিত করিয়াছেন। আবার হালে 'নন্দিশর্ম্মা' 'কাশীর কিঞ্চিৎ'-অবলম্বনে রসরঙ্গের হোলি খেলিয়াছেন। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র অতি অল্পকথায় 'বিষবৃক্ষে',[৫] শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'দিদি'তে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'অদৃষ্টচক্রে', এবং আরও অনেক ছোট বড় মাঝারি গল্প-লেখক নানা গল্পে কাশীর মহৎ ও মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান লেখক 'তীর্থদর্শন', 'বারাণসী-দর্শনে', 'সুখের প্রবাস', 'ধর্ম্মে মতি', 'কাশীবাস' এই রচনা-পঞ্চকে[৬] কাশী-সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যে কাশীর প্রতি কতদূর প্রবল প্রাণের টান, ইহা যদি পাঠক-সম্প্রদায় প্রণিধান করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এই অধন্য লেখকের লেখনীধারণ।

---

(৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কাশী-পরিক্রমা' দ্রষ্টব্য।

(৪) স্বল্পায়ুঃ বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলি (৫৫৭-৬৩ পৃঃ) বা ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রকাশিত স্বল্পায়ুঃ (আমাদের যৌবনকালের বড় সাধের) 'সাধনা,' পৌষ ১৩০০, (১৫৬-৬০ পৃঃ)—'বারাণসী'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৫) আশাপথে, পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

(৬) প্রথম তিনটি 'ফোয়ারা'র ও শেষের দুইটি 'পাগলা ঝোরা'র দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, এবার দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে কাশীতে আসিয়া, দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া, কাশীর বৈশিষ্ট্য যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, যে ভাবে মনের উপর ছাপ পড়িয়াছে, সে ভাবে সে চক্ষে পূর্ব্বে কখনও কাশী দেখি নাই। (যদিও পূর্ব্বে বহুবার অল্প বা অধিক দিনের জন্য কাশীবাসের সৌভাগ্য-লাভ ঘটিয়াছে)। রোগের তীব্র যাতনা-জনিত মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিই কি ইহার কারণ? না, 'জরারোগগ্রস্তঃ মহাক্ষীণ-দীনঃ বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ' হওয়াতে আজ অন্তশ্চক্ষুঃ ফুটিয়াছে?

কাশী হিন্দুর মহাতীর্থ হইলেও এখানে যে শুধু হিন্দুরই বাস, তাহা নহে। হিন্দুর 'ধর্ম্মধানী'তে [৭] 'ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর' অভাব নাই। ষ্টেশন্ হইতে গাড়ী করিয়া আসিয়া গোধূলিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিলেই খ্রীষ্টানের গির্জ্জা নয়ন-গোচর হয়; ইহা ছাড়া সহরের অন্যান্য মহল্লায়ও গির্জ্জা, মিশনারি স্কুল্ প্রভৃতি আছে। আবার বিশ্বেশ্বরদর্শনে গেলে তাহার অদূরেই ঔরঙ্গজেবের আমলের মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়; বিন্দুমাধব ('বেণী-মাধব')-দর্শনে গেলেও মুসলমানের কীর্ত্তি চক্ষে পড়ে; যাহাকে সাধারণ লোকে 'বেণীমাধবের ধ্বজা' বলে সেটি হিন্দুর দেবতার বিজয়-কেতন নহে, মুসলমানের মসজিদের মহোচ্চ মিনার। যাঁহারা কাশীতে নূতন আসিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী শীতলাঘাটে [৮] স্নান করেন—এই ঘাটটিই স্নানের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, 'বাঙ্গালী-পছন্দ' ঘাট—তাঁহারা

---

(৭) 'ধর্ম্মধানী' ও 'দেবধানী' বলেন্দ্রনাথের 'বারাণসী'-প্রবন্ধে পাইয়াছি। বৈয়াকরণ কি বলেন?

(৮) ইহা প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা-বাঈএর কীর্ত্তি। এই ঘাটের উপর ৺শীতলা দেবীর ও ৺দশাশ্বমেধেশ্বর শিবের মন্দির আছে। এই ঘাটের ঘাটোয়াল 'বিন্দু মহারাজ' অতি সজ্জন ছিলেন; বৎসরাধিক হইল তাঁহার ৺কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে।

বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই ঘাটের দক্ষিণে যে ঘাট (মুন্সীঘাট), সেটি মুসলমানদিগের একরকম একচেটিয়া। বঙ্গ-সীমন্তিনীগণ যে বেনারসী শাড়ীকে সুখ-সৌভাগ্যের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু মনে করেন, তাহা কাশীস্থ মুসলমান 'জোলা'দের হাতের তৈয়ারি। বাস্তবিক, এই মুসলমান 'জোলা'রা শুধু কাশীর কেন, ভারতের গৌরবের নিদান, কেননা ইহাদিগের প্রস্তুত সুবর্ণখচিত কিঙ্খাব প্রতীচীতে আদর ও খ্যাতিলাভ করিয়াছে, ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন-দর্শনে পাশ্চাত্য জাতিগণ বিস্ময়াভিভূত হইয়াছে। আবার শুধু খ্রীষ্টান্-মুসলমান কেন, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, দাদুপন্থী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই কাশীতে আছে। 'কাশী-পরিক্রমা'য় ইহার স্বরূপবর্ণন আছে—

"রামানন্দী, শ্যামানন্দী, নিমানন্দী কত।
নানক, কবীরপন্থী, অঘোর-সম্মত॥
ফকির, সুখরাসাহী, বৌদ্ধ যতিগণ।" ইত্যাদি।

কিন্তু আমি কাশীকে বিশেষভাবে হিন্দুর বাসভূমি বলিয়াই ধরিতেছি।

এই কাশীস্থ হিন্দুর মধ্যে আবার দুই শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর হিন্দু 'পশ্চিমে'র অন্যান্য সহরের ন্যায় কাশীতে বিষয়কর্ম্ম-উপলক্ষে বাস করেন; ইঁহারা মোরাদাবাদ, মীরাট, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, লুধিয়ানা, দিল্লী, লাহোর, দেরা গাজি খাঁ, দেরা ইস্মাইল খাঁ প্রভৃতি সহরেও বাস করিতে পারিতেন, দৈবগত্যা কাশীতে বাস করিতেছেন। ইঁহারা, কলিকাতার আফিস্-ওয়ালাদের মত, সকালে সকালে কলের জলে স্নান সারিয়া চারিটি ভাত মুখে গুঁজিয়া চাকরীতে বা ব্যবসায়ে বাহির হইয়া যান। 'উত্তরবাহিনী' গঙ্গা বা বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার সহিত ইঁহাদের কোনও সম্পর্ক নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বড় জোর, বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব-উপলক্ষে, ('জন্মের মধ্যে কর্ম্ম') ইঁহারা গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শন করেন, এই পর্য্যন্ত।

কেহ কেহ বা নখের কোণ দিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মস্তকে ছিটাইয়া (তাহাতে কেশাগ্রও ভিজে না) পতিতপাবনী সুরধুনীর সম্মানরক্ষা করেন। অনেকে গা ময়লা হইবার ভয়ে গঙ্গায় অবগাহন করেন না (বিশেষতঃ বর্ষাকালে), কাহারও কাহারও আবার শুনিয়াছি গঙ্গাস্নান সহে না, বুকে বেদনা, গলায় বেদনা, সর্দ্দিকাসী জ্বর হয়, এমন কি বাতে ধরে। যাহা হউক, আমি এই শ্রেণীর হিন্দুকে ঠিক কাশীবাসী-হিসাবে দেখিতেছি না। ইঁহারা কাশীবাসী নহেন, কাশী-প্রবাসী ; ইঁহারা নামে হিন্দু, কামে—।

আমি বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, যাঁহারা অর্থকামের চিন্তায় ও চেষ্টায় নহে, ধর্ম্মার্থী মোক্ষার্থী হইয়া কাশীবাস করেন, স্নান-দর্শন-স্পর্শন-অর্চ্চন-ধ্যানধারণা যাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, মুখ্য কল্প ; 'যাত্রা' করা যাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। কবির কথায় যাঁহাদিগের

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাংসঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥

ইঁহারাই প্রকৃত-পক্ষে 'কাশীবাসী' আর এই 'যাত্রা'ই কাশীর বৈশিষ্ট্য, অসাধারণত্ব, কাশীর 'জান' বা প্রাণ। ইঁহাদের কথা লিখিয়াই, ইঁহাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম বর্ণনা করিয়াই, লেখনীর লেখনীজন্ম সার্থক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জীবন-সায়াহ্নে ইঁহাদের দলে ভিড়িতে পারিলেই জন্ম সফল বলিয়া মনে করিব। মনের প্রবল আকিঞ্চন, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর-চরণে হৃদ্‌গত নিবেদন,

"আমি কবে কাশীবাসী হ'ব ?
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব।
গঙ্গাজল-বিল্বদলে বিশ্বেশ্বর-নাথে পূজিব।
অই বারাণসীর-জলেস্থলে ম'লে পরে মোক্ষ পাব।

অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ ল'ব ।৮
আর বম্ বম্ ভোলা ব'লে নৃত্য ক'রে গাল বাজাব ॥"

কিন্তু অন্নের সংস্থানের জন্যই অন্নপূর্ণার পুরী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকা ভিন্ন উপায় নাই ; সুতরাং হৃদয়ের এ আকাঙ্ক্ষা, আশা ও প্রয়াস 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে'। যাক্, ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া প্রকৃত অনুসরণ করি।

প্রাতঃকাল হইতে, শ্রীবিষ্ণুঃ, প্রত্যূষকাল হইতে,—শিব শিব শিব, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে এই 'যাত্রা' আরম্ভ হয়, আর দিবামানের প্রথম 'ছয় দণ্ড'-মধ্যে অর্থাৎ বেলা ৮টা ৯টায় শেষ হয়। যে যেমন সকাল উঠিতে পারে, যাহার যেমন অভ্যাস, অথবা যাহার যেমন ধর্ম্ম-কর্ম্মে আগ্রহের মাত্রা (degree), সে সেইরূপ সকালসকাল শয্যাত্যাগ করে। বলা বাহুল্য, প্রকৃত 'কাশীবাসী' সুখ-বিলাসী নিদ্রালস নহেন। পৌষ-মাঘে 'পশ্চিমে'র কন্‌কনে শীতেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। শয্যাত্যাগের পর মুখ-প্রক্ষালন, দন্তধাবন ও শরীরের ধর্ম্মপালনের জন্য বিধেয় প্রাতঃকালীন কার্য্যানুষ্ঠান সমাধা করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধান ও শুষ্কবস্ত্র (অনেকেরই পট্টবস্ত্র ও নামাবলি), গামছা, ধাতুনির্ম্মিত কমণ্ডলু বা পঞ্চপাত্র ও সাজি ('পুষ্পপাত্র চন্দন-সহিত') তথা জপের মালা লইয়া 'কাশীবাসী' গৃহের বাহির হয়েন। কাশীতলবাহিনী উত্তর-বাহিনী পতিতপাবনী সুরধুনীর জলে অবগাহন-স্নান করিয়া কেহ আর্দ্রবস্ত্রে জলে জলে, কেহ শুষ্কবস্ত্রে পাটে বসিয়া (ধর্ম্মার্থীদের সুবিধার জন্য ঘাটোয়ালরা সযত্নে এই সব কাঠের পাট পাতিয়া রাখে), কেহ দেবমন্দিরে বসিয়া (যথা, পূর্ব্বোক্ত অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে ৺শীতলামন্দিরে) আহ্নিক ও জপ সারিয়া লয়েন। দশাশ্বমেধ ও শীতলা-ঘাটেই অনেকে যান ; বারবিশেষে, যথা সোমবারে কেদারঘাটে, মাসবিশেষে, যথা বৈশাখে মণিকর্ণিকায়, জ্যৈষ্ঠে

দশাশ্বমেধে, শ্রাবণে কেদারঘাটে, কার্ত্তিকমাসে পঞ্চগঙ্গায়, [১] পর্ব্ববিশেষে, যথা স্নানযাত্রায় ও রথযাত্রায় অসিসঙ্গমে, যাওয়ার নিয়ম। সাধারণতঃ, যাহার যে ঘাটের উপর ভক্তি বা ঝোঁক, অথবা যাহার বাসস্থানের যে ঘাট নিকট, সে সেই ঘাটেই স্নানাহ্নিক করে।

এইবার গঙ্গাতীর ছাড়িয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু বা পঞ্চপাত্র-হস্তে ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার মন্দিরোদ্দেশে সকলের প্রয়াণ।

পথে সাক্ষি-বিনায়ক ও ঢুণ্টিরাজ (এবং শনৈশ্চর—'শনিচর') অবশ্য-দর্শনীয় ও পূজনীয়। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার মন্দিরে আরও অনেক দেবতা আছেন, বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের পিছনে 'শিবের কাছারী' জ্ঞানবাপী

---

(১) ৺বিন্দুমাধবের মন্দির-নিম্নস্থ ঘাটকে (অর্থাৎ যে ঘাটের উপর 'বেণীমাধবের ধ্বজা' বিদ্যমান তাহাকে) 'পঞ্চগঙ্গা' বলে। সহধর্ম্মিণীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, এই পঞ্চগঙ্গা-প্রয়াণ বড় আনন্দের ব্যাপার। সমস্ত কার্ত্তিক মাস ধরিয়া প্রভাতী তারা ডুবিয়া না যাইতে এইখানে ডুব দিতে হয়; সুতরাং অনেক রাত্রি থাকিতেই স্নানের সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইতে হয়। প্রায় সকলেই একা, কচিৎ এক পরিবারের পরিজন বা এক বাসার বাসিন্দা কয়েকজন দল বাঁধিয়া বাহির হয়, পথে যাইতে যাইতে ক্রমেই তাহারা দলে পুরু হয়। এই সব দলে পুরুষ বড় একটা থাকে না; অত রাত্রে সুখশয্যা ত্যাগ করা পুরুষের পোষায় না। স্ত্রীলোকদিগের এ সব বিষয়ে আগ্রহও বেশী এবং তাহারা অধিকতর কষ্টসহিষ্ণুও বটে। এই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সধবা বিধবা, নবীনা প্রবীণা বৃদ্ধা, সব রকমই থাকে, তবে অধিকাংশই প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা বিধবা। কেহ তন্ময় হইয়া জপ করিতেছে, কেহ মধুরকণ্ঠে নাম কীর্ত্তন করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ বা গুন্ গুন্ করিয়া, কেহ বা বেশ গলা ছাড়িয়া দিয়া, ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতেছে, আনন্দের রোল উঠিতেছে। লেখকের অবস্থা পরের মুখে ঝাল খাওয়া, শ্রীবিষ্ণুঃ—মিষ্টি চাখা; এখন তো রোগশয্যায় উত্থানশক্তি-রহিত, যখন সুস্থ সবল ছিলাম তখনও এত রাত্রি থাকিতে উঠিয়া স্নান না করি, এই মধুর কলধ্বনি শুনিবার, এই সুন্দর প্রাণস্পর্শী দৃশ্য দেখিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে তো এমন প্রবৃত্তি হইবে না।

মুক্তিমণ্ডপ প্রভৃতি বর্ত্তমান। অনেকে খুঁটাইয়া সবগুলিতেই যান। ঘাট হইতে মন্দিরের পথে ফুল-বিল্বপত্র কেনা হয়, সাজিতে আগে হইতেই আতপ-তণ্ডুল ('অক্ষত') থাকে, তাহার কিয়দংশ দেবোদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়, কিয়দংশ ভিক্ষুক-নারায়ণকে প্রদত্ত হয়। দুইচারিটি দানামাত্র এক এক জন ভিখারীর ভাগ্যে পড়ে, কিন্তু বহুসংখ্যক যাত্রীর নিকট এইরূপ পাইয়াই ('অল্পানামপি বস্তূনাম্' ইত্যাদি, ভাষা-কথায় 'রাই কুড়িয়ে বেল') তাহাদের দিন-গুজরানের মত সংস্থান হয়—মা অন্নপূর্ণার এমনই কৃপা। কথায় বলে, অন্নপূর্ণার পুরীতে কেহ উপবাসী থাকে না। ফুল-বিল্বপত্র কেনার কথায় একটু বক্তব্য আছে। অত সকাল অন্য দোকানপাট খোলে না, (কাশীতে দোকানপাট কলিকাতা অপেক্ষা বেশ একটু বেলায়ই খোলে। দোকানীরাও স্নান-দর্শনান্তে অন্নসংস্থানে মন দেয়, এই কারণে কি?) কিন্তু ফুলওয়ালীরা তখনই গঙ্গাস্নানে যাইবার গলিরাস্তায় ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে বসিয়াছে। [তাহারা অবশ্য অতি সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোক, অধিকাংশই বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া। কাব্যরসপিপাসু পাঠক তাহাদিগের মধ্যে কাব্যের নায়িকা 'রজনী' বা (Nydia) 'নিডিয়া' পাইবেন না।]

প্রাতে প্রধান দুইটি মন্দিরে (বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার)—ভয়ানক ভিড়, ভুক্তভোগিমাত্রেই জানেন [১০]। ইহার অধিকাংশই স্ত্রীলোক, এবং তাহার অধিকাংশই আবার বৃদ্ধা। কিন্তু বৃদ্ধা বলিয়া তাহারা অথর্ব্ব নহে, বেশ

(১০) সৌখীন তীর্থযাত্রীদিগের পক্ষে একটু বেলা করিয়া যাওয়াই সুবিধা, অত ভিড় ঠেলিতে হয় না। দুপুরে লোক খুব কম থাকে। বৈকালে বাড়িতে আরম্ভ হয়, আরতির সময় আবার বিলক্ষণ ভিড় হয়। আরতিকালে নানাযন্ত্রের বাদ্যের সহিত পূজারীগণের সমস্বরে স্তব-পাঠ ভক্তিভাবে শুনিবার জিনিশ, ও দেবতার 'শিঙ্গার'-বেশ—দুগ্ধ-গঙ্গাজলে ধৌত, মাল্য-শোভিত, চন্দনচর্চ্চিত—ভক্তিভাবে দেখিবার জিনিশ।

শক্ত; তাহাদের কনুইএর ঠেলায় পুরুষদিগকে হঠিয়া যাইতে হয়। 'অবলা প্রবলা' এরকমটি আর কোথাও দেখি নাই। চণ্ডীতে লেখে, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'। আর অন্নদামঙ্গলে লেখে, 'মায়া করি' মহামায়া হইলেন বুড়ী'। (পৌরাণিক দশমহাবিদ্যার 'ধূমাবতী' স্মর্ত্তব্য।) সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে, অন্নপূর্ণার পুরীর বুড়ীরা জরতীবেশে তাঁহারই, শক্তিরই, অংশজাতা। এত ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলিতেও সকলেরই বিশ্বেশ্বর-দর্শন ও স্পর্শনের আগ্রহ অটুট। কেহ কেহ আবার উভয় দেবতার সঙ্কীর্ণ গর্ভগৃহে জপাদিও করেন। অবশ্য গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্থানে জপাদি করাই সুবিধা। তাহাও অনেকে করেন। প্রণাম-প্রদক্ষিণান্তে গৃহাভিমুখে প্রয়াণ।

এই তো গেল 'নিত্যযাত্রা'। ইহা ছাড়া তিথিবিশেষে, বারবিশেষে, মাসবিশেষে, পর্ব্ববিশেষে, অথবা 'মানসিক' থাকিলে, অথবা ইচ্ছাসুখে, অন্যান্য দেবমন্দিরে যাওয়া আছে। যথা, (শনি-মঙ্গলবারে) মানসকালী বা আশাকালী, (শীতলাষ্টমীতে) শীতলা, (শুক্লপক্ষের শুক্রবারে) সঙ্কটা-বীরেশ্বর, (সোমবারে) কেদার, (মঙ্গলবারে) বটুকভৈরব, কালভৈরব, কামাখ্যা, পশুপতিনাথ (শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত), বৈদ্যনাথ, বিন্দুমাধব (বেণীমাধব) ইত্যাদি। কাশীর দেবতা অসংখ্য, তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যও অবর্ণনীয়। তাহার বর্ণনা করিতে গেলে শেষ হইবে না, পাঠক অবসর-মত 'কাশীখণ্ড' পাঠ করিয়া এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন; অথবা সংক্ষেপে 'কাশী-পরিক্রমা'-খানিতেও এ কার্য্য হইতে পারে।

এই অসংখ্য দেবদেবীর প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কাশীবাসীর বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা-দর্শন তো নিত্যযাত্রার প্রধান অঙ্গ; কেদার-গৌরী, বীরেশ্বর-সঙ্কটা-দর্শনও বার-বিশেষে হয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুর্গাবাড়ী যাওয়া, মা-দুর্গা ও জগজ্জননীর জননী

মা-মেনকার সাক্ষাৎকারলাভও তিথিবিশেষে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশালাক্ষীদর্শন শত-কে একজনও করেন কিনা সন্দেহ; তাঁহার মন্দির কোথায়, তাহা পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না। অথচ কাশী ৫১ পীঠের অন্যতম,—দেবী বিশালাক্ষী, শিব কালভৈরব। কালভৈরব কাশী-কোতোয়ালের নকরী লইয়া বিশ্বেশ্বরের তাঁবেদারী করিয়া কোনও প্রকারে টিকিয়া আছেন; কিন্তু দেবী বিশালাক্ষীর মাহাত্ম্য 'প্রত্যক্ষ-মাহেশ্বরী কাশীপুরাধীশ্বরী' অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যে একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। (একটু স্থূল রসিকতা করিয়া বলা যায়, পীঠের দেবতা পেটের দেবতার চাপে কোণঠেশা হইয়া আছেন।)

যাক্, আসল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তবে দেবতাদের প্রসঙ্গে এরূপ অন্যমনস্ক হওয়া ক্ষন্তব্য। দেখা গেল, দিবসের প্রথম প্রহরটা 'কাশীবাসী'র দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট। মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়, প্রাতে এমনটি হয় কেন? জানি ইহাই শাস্ত্রের বিধি। অদ্ভুতানন্দ-স্বামী (লাটু মহারাজ) বলিয়াছেন, 'এ সময় প্রকৃতি অনুকূল থাকে, আর তাড়াতাড়ি ইষ্টে মন বসে।' [১১] তাহাই বা কেন হয়? আমার মনে হয়, ইহার ভিতর একটি রহস্য আছে, যেজন্য প্রাতেই মানবের মনে এই দিব্য ভাবের উদ্ভব হয়। [১২] সে রহস্যটি এই—গভীর রাত্রে নিদ্রাবশে

---

(১১) শ্রীমদ্ অদ্ভুতানন্দ-শ্রীমুখ-নিঃসৃত সৎকথা ১ম ভাগ (স্বামী সিদ্ধানন্দ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত) ৯৮ পৃঃ।

(১২) অবশ্য অনেক লোকেরই ওরূপ কিছু হয় না, ও সব বালাই নাই। প্রাতে উঠিয়াই অর্থচিন্তা, অন্নচিন্তা—আর আমার মত লোভী রোগীর "আজ কি কি তরকারী খাইব, কিসের ডাল হইবে, দাদখানি চাল ফুরাইয়াছে কি না, 'চিনিপাতা দৈ, ডিমভরা কৈ' বাজার হইতে আনিতে যেন ভুল না হয়," এবংবিধ চিন্তা! 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

স্থূলদেহটা পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে, আত্মা দেহ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধগতি হইয়া আনন্দধামে আনন্দ আস্বাদন করিতে যায়, নিদ্রাভঙ্গে স্থূলদেহে ফিরিয়া আসে। (যেমন সন্তানের জাগরণের সাড়া পাইলেই জননী তাহার পার্শ্বে ছুটিয়া আসেন; অনেক সময়ে সন্তান টেরও পায় না যে জননী কাছছাড়া হইয়াছিলেন।) এই ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদের অব্যবহিত পরেও মানবের মন দিব্যভাবে পূর্ণ থাকে। তাহার পর, কয়েক দণ্ড ব্যাপিয়া দূরবর্ত্তী দেবালয়ে-দেবালয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে দুর্ব্বল মানবদেহে জীবধর্ম্মবশতঃ ক্লান্তিশ্রান্তি ক্ষুধাতৃষ্ণা আসে। এবঞ্চ স্থূলধর্ম্মা পৃথিবীর ধূলি-পঙ্ক-আবর্জ্জনা ও দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া মানবমনে আবার দেবভাবের পরিবর্ত্তে সাধারণ জীবভাব বলবৎ হয়। তাহার ফলে, ফিরিবার পথে যাত্রীরা রসদ সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফেরেন— তখন পেটের চিন্তাই বলবতী, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা'। আলু পটোল বেগুন কুমড়া হইতে আরম্ভ করিয়া খেড়ো ঢেঁড়স নিনুয়া কাঁকরোল ঝিঙে উচ্ছে করোলা কচু কাঁচালঙ্কা কচুর শাক ও ফুল (শুনিয়াছি সুখাদ্য), ডেঙো ডাঁটা, এমন কি কুঁদরু (তেলাকুচার জ্ঞাতি, পটোলের অনুকল্প), পোয়াল-ছাতা পর্য্যন্ত পূজাজপে পবিত্রীকৃত শ্রীহস্তে বিরাজ করেন, নামাবলির আঁচলে বাঁধা পড়েন, ফুলের সাজিতেও চড়েন। অনেক বিধবা বিড়ালের জন্য মাছ পর্য্যন্ত কিনিয়া লইতে ভুলেন না! এই শ্রেনীর কাহারও কাহারও ব্যাপারীদের কাছ হইতে আনাজ চুরি করার অখ্যাতিও আছে। ধরা পড়াতে লাঞ্ছিত হইতেও দেখা গিয়াছে। দেবভাব হইতে সাধারণ জীবভাব, তাহা হইতে এই দানবভাব বা দস্যুবৃত্তিতে অবতরণ আক্ষেপের বিষয় বটে, কিন্তু অনুষ্ঠানগত ধর্ম্মে এই গলদ ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশী। ইহারা সত্য সত্যই দিব্যভাবভাবিত নহে, মনে করে শাস্ত্রবিহিত আচার-অনুষ্ঠান করিলেই দিনগত পাপক্ষয় হইবে, কেহ

কেহ বা শুধু লোক-দেখান ভড়ং করে, ঠাট বজায় রাখে। তাই বেশ্যাদের গঙ্গাস্নানের ন্যায় ইহারা 'যাত্রা' করিয়াই মনকে চোখ ঠারে,—পাপক্ষালন হইল, দেহ-মন শুদ্ধ হইল ; বুঝে না যে এ 'হস্তিস্নান' বই আর কিছুই নহে। পরমুহূর্ত্তেই যে ধূলাকাদা সেই ধূলাকাদাতেই সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যায়। সেদিন শুনিলাম জনৈকা কাশীবাসিনী ব্যভিচারিণী প্রবীণা বিধবা 'কেদার-বদরী' করিয়া কাশীধামে ফিরিয়াছেন—পুনর্মূষিক (পুনর্দূষিকা ?) হইবার জন্য !

যাক্, মানবচরিত্রের এই কদর্য্য দিক্‌টা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। Idealistic দিক্‌টাই দেখাইতে প্রবৃত্তি হয়, আনন্দ হয়। আবার সেই দিক্‌ই প্রদর্শন করি। যাত্রান্তে বাজার করিয়া ফিরিয়া 'যাত্রী' নামাবলি জপের মালা সাজি কমণ্ডলু ঘরের কোণে একধারে ফেলিয়া রাখেন, অথবা আলনায় বা হুকে বা শিকেয় তুলিয়া রাখেন। তাহার পর অল্পক্ষণ বিশ্রামান্তে পাদপ্রক্ষালনের পর রন্ধন, দেবতাকে নিবেদন (তখনও দেবভাব একপাদ অবশিষ্ট), পরে ভোজন—'আহার কর, মনে কর, আহুতি দাও শ্যামা মা রে।' 'যৎ করোমি জগত্যর্থং তদস্তু তব পূজনম্'। 'নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি।' 'বিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্।' আহারান্তে মুখশুদ্ধি, পরে দু'দণ্ড গড়ান ; আহারের পর একটু আবল্য আসে, সুতরাং তন্দ্রাবেশ। ('মা দিবা স্বাপ্সীঃ', 'দিবাস্বপ্নং ন কুর্ব্বীত', 'আয়ুঃক্ষীণা দিবানিদ্রা' ইত্যাদি নিষেধবাক্য অল্পলোকেই জানেন বা মানেন।) তন্দ্রার ঘোরে আবার আত্মার স্থূলদেহত্যাগ ও আকাশমার্গে আনন্দধামে বিচরণ ও আনন্দ-আস্বাদন। ফলে তন্দ্রাভঙ্গে দেবভাবের জয় ; তাহার প্রভাবে অপরাহ্ণে 'কাশীবাসী'র কথকতা-কীর্ত্তন [১৩] পুরাণপাঠ প্রভৃতি-শ্রবণের জন্য

(১৩) কথকতা-কীর্ত্তনের আঙ্গিনাতেও স্ত্রীজাতির ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি কথা-কাটাকাটি। বিখ্যাত কথক ও কীর্ত্তনিয়া শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্যের মিষ্ট মিষ্ট ভৎর্সনাতেও তাঁহাদিগের চৈতন্য হয় না। অনেকে আবার কথা শুনিতে শুনিতে 'টেকো'

হরিসভা, জয়মিত্রের বা কুচবিহারের কালীবাড়ী, রাঙ্গামেটের সত্র প্রভৃতি স্থানে গমন এবং প্রদোষকালে দেবদর্শন গঙ্গাদর্শন-স্পর্শন ও গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাহ্নিক-জপাদি আচার-নিয়ম-পালন। আবার শ্রান্তি ক্লান্তি, ক্ষুৎ-পিপাসা, জীবধর্ম্ম বলবৎ, বৈকালিক ফলমূল 'মালাই' মিষ্টান্ন কিনিয়া গৃহে প্রত্যাগমন। ('মালাই' এথানে সকলের রাত্রের আহারে চাইই। ইহাতেই, রসময়ের দেহসজ্জায় চূড়ার উপর ময়ূরপাখার ন্যায়, রসলোলুপ রসনার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'।) আবার পরদিন প্রাতঃকাল হইতে 'যাত্রা'দির পালার পুনরাবৃত্তি—যতদিন না শিব 'তারকব্রহ্ম' নাম শুনাইয়া কাশীবাসী জীবকে মুক্তি দেন।

জানি না, আমার উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত এই রহস্যোদ্ভেদ রোগজনিত খেয়াল কি প্রকৃত তথ্য? যাহা হউক, ভাল কথার মিছাও ভাল, খোসখবরের ঝুটাও মিঠা। রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন, 'আছে ভাল মন্দ দু'টা কথা, যা' ভাল তা' করাই ভাল।' তেমনি 'যা' ভাল তা' বলাই ভাল। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ।' এই মীমাংসা মানিয়া লইতে ক্ষতি কি? জানি, কাশীধামে তথা মানবমনে সু কু দুইই আছে, জগতে কিছুই ষোল আনা খাঁটি নহে (ষোলকড়াই কাণা না হইলেই যথেষ্ট), শুধু খোদার উপর খোদকারিতে সেকরার হাতে পড়িয়াই যে সোণায় খাদ থাকে তাহা নহে, খনিতেও খাঁটি সোণা মিলে না, রসায়নবিদ্গণ বলেন। এ অবস্থায় ষোল আনা ভাল আশা করা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবপ্রকৃতির Idealistic দিক্ দেখিয়া ও দেখাইয়াই আমাদের আনন্দ হয়, খুঁজিয়া খুঁটাইয়া

চালান। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' তাই তো কোন্ বুড়ী পুরীর শ্রীমন্দিরে গিয়া পুরুষোত্তমের শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পুঁইমাচা দেখিয়াছিল। ইতি উৎকলখণ্ডের উপ-সংহারে বিট্‌কেল কাণ্ড!

খোঁচাইয়া কেঁচো খুঁড়িতে সাপ খুঁড়িয়া realistic দিক্ উদ্ঘাটিত করিয়া, কালী মাখিয়া কালী ঘাঁটিয়া কালী ছড়াইয়া কি লাভ, কি সুখ, কি ফল? 'ততঃ কিম্?' [১৪]

একে তো' দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া পাঠককেও ছাত্র ভ্রমে শিক্ষা দেওয়ার লোভ সামলাইতে পারি না; তাহার উপর স্বাস্থ্য-ভঙ্গের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি ফুরাইলেও বেকার বসিয়া আছি, অধ্যাপনা-প্রবৃত্তি প্রবল, অথচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মত শক্তি নাই (যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'The spirit is willing but the flesh is frail'); এ অবস্থায় লেক্চার্ ঝাড়ার ঝোঁক রোখে কে? যাক্, আবার আসল কথায় ফিরিয়া আসিয়া এই দীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ শেষ করি।

বাস্তবিক, এই সোণার কাশী, এই আনন্দ-কানন, এই স্বর্গভূমি, শেষ রাত্রির মঙ্গল-আরতি হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন রাত্রির প্রথম প্রহরান্তে শয়ন-আরতি পর্য্যন্ত দিব্যভাবে ভরপূর, আনন্দে ওতপ্রোত। 'কাশীবাসী'র কায়মনের সুরও ইহার সহিত তানলয়বদ্ধ। মঙ্গল-আরতির মধুর নহবত-বাদ্যে এই সুরটুকু কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, প্রাণ স্পর্শ করে, শয়ন-আরতির বাদ্যোদ্যম পর্য্যন্ত আনন্দে আনন্দে বিহার করিতে করিতে মনে-প্রাণে 'আনন্দ আর ধরে না রে!' তাহার পর সুষুপ্তি। (এই অভাগা লেখকের মত রোগীর জন্য নহে। 'O Sleep, O gentle

---

(১৪) একজন রসিক ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, কাশী প্রথম বেলায় অর্থাৎ প্রাতে কৈলাস—সকলের মুখেই 'হর হর বম্‌বম্' বোল; দ্বিতীয় বেলায় অর্থাৎ মধ্যাহ্নে জগন্নাথ-ক্ষেত্র—ব্রাহ্মণ পত্নীভাবে পরিচিতা নাপিতানী ধোপানী মুচিনীর হাতে খাইতেছেন; তৃতীয় বেলায় অর্থাৎ অপরাহ্নে নৈমিষারণ্য—সকলে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতেছেন; চতুর্থ বেলা অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকারে ('Tis only daylight that makes sin') শ্রীবৃন্দাবন অর্থাৎ কেলিবিলাস। Realism এর চূড়ান্ত বটে।

sleep, Nature's soft nurse, how have I frighted thee !') [এই! আবার পঠিত ও পাঠিত বিদ্যার চর্ব্বিতচর্ব্বণ!] অবশ্য যাহারা ধর্ম্মপ্রাণ, মোক্ষকাম, তাহাদেরই প্রাণে এই ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি, ডিমি ডিমি ডমরুবাদ্য, নানা যন্ত্রের অপূর্ব্ব সঙ্গত, শান্তিধারা সেচন করে, কর্ণে মধুবর্ষণ করে। অপরের কর্ণে ইহা পশে না, পশিলেও প্রাণ তাহাতে বসে না, রসে না, খসিয়া ধ্বসিয়া পড়ে। এই সব বহিরঙ্গ ব্যক্তিদের বহিঃকর্ণে বাজে—রাত্রে রাসভ-রাগিণী অর্থাৎ গাধার চীৎকার (যেমন দূরের গঙ্গা নিকট হয়, তেমনি এক্ষেত্রে ৺শীতলা মাতার প্রসাদে এবং রজকের কল্যাণে ব্যাসকাশীও শিব-কাশীর কাছাকাছি হইয়াছে!) এবং কুকুর-কীর্ত্তন (কুকুর যে বটুকভৈরবের বাহন!)—আর দিনমানে, ভোর না হইতে মাখনওয়ালীর মধুর মোলায়েম প্রভাতী, বেলা হইলে ফেরিওয়ালার নানা সুরের গিটকিরি, বেনারসীবোনা তাঁতের খটখটি,[১৫] অপরাহ্ণে ডাকপিয়নের জোর-গলায় 'চিঠ্‌ঠি'র ডাক, খবরের কাগজওয়ালার তারস্বরে 'ডেলি নুজ্‌' 'অমৃৎ বাজার' চীৎকার, আর সারাদিন, কখনও কখনও সারারাত ধরিয়া বানরের কিচকিচি ও ইতরশ্রেণীর হিন্দুস্থানী নারীদিগের কলহ-কাজিয়া। যাক্, বিস্তর বাজে বকিলাম। কবির কথা মনে পড়িয়া গেল—'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' অতএব এক্ষণে এইখানে বেদব্যাসের বিশ্রাম।

---

(১৫) লেখক মদনপুরা মহল্লায় ছিলেন, এই মহল্লা জোলাদিগের প্রধান কেল্লা, দুই চারি ঘর হিন্দু এখানে থাকেন। জ্বরের যন্ত্রণায় অস্থির রোগীর কর্ণে এই খটখটি যে 'কর্ণেষু বর্ষতি মধুধারাম্' কিরূপ, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহি না। স্ত্রী-কন্যার জন্য বেনারসী শাড়ী ও (blouse-piece) ব্লাউস্-পিস্ কেনার সাধে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে।

[আজ সেই স্নেহের কন্যা সকল সাধে বাদ সাধিয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে। আর হতভাগ্য আমি এই শোকের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বাঁচিয়া আছি।—পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের মন্তব্য।]

রোগশয্যার খেয়াল

(১ম কিস্তি)

(পূজার তত্ত্ব)

('মাসিক বসুমতী,' আশ্বিন ১৩৩০)

"Expect no healthy conclusions from me this month, reader; I can offer you only sick men's dreams."
LAMB: *'The Convalescent'* in the *Last Essays of Elia*.

জন্মখণ্ড

বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া যখনই কাশীবাসের অবকাশ পাইয়াছি—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশে এই অধমের সে সৌভাগ্যলাভ বহুবার হইয়াছে—তখনই ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার কৃপায় স্বাস্থ্যের উন্নতি, মনের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। এমন কি, কৃতবিদ্য কৃতী সদ্যোবিবাহিত যুবক জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যুজনিত নিদারুণ শোকে এই 'আনন্দকাননে' আসিয়া সান্ত্বনা ও শান্তি পাইয়াছি। কিন্তু এবার প্রায় বৎসরাবধি রোগভোগে ভগ্নস্বাস্থ্য ও (বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সদ্যঃ যশোভাগী) অষ্টাদশবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুজনিত মহাশোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া, কাশী ও কাশীশ্বরের শরণ লইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে উৎকট অশান্তি ভোগ করিয়াছি; এবং তাহাও অল্পদিনের জন্য নহে—দীর্ঘ চাতুর্ম্মাস্য রোগভোগ। তবে লাভের মধ্যে এইটুকু যে, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিলেও রোগযন্ত্রণার মধ্যে কল্পনার লীলার বিরাম ছিল না; বরং একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা বা উন্মাদনা-বশে বন্যাস্রোতের ন্যায় নব নব ভাবোচ্ছ্বাস হৃদয়সমুদ্রে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিত। (কবির ভাষায় বলিতে গেলে, 'শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস, কলাপের মত করেছে

বিকাশ।') সামলানই দায় হইত। সেই সব নব নব ভাবের অধিকাংশই তথনই তথনই সংগ্রহের অভাবে উপিয়া গিয়াছে, মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; নরলোকে সেগুলির প্রচার হইল না। (অবশ্য দেবলোকে প্রচার হইবার আটক নাই, যেহেতু, 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।') নবনির্দ্ধারিত লবণ-কর লইয়া একটা নাতিদীর্ঘ বিদ্রূপাত্মক (satirical) প্রবন্ধ, হোমিওপ্যাথি লইয়া তিনটি দৃশ্যে সমাপ্ত একখানি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ-নাটিকা (লেখকের প্রথমে হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা হয়, তাহাতে ফলোদয় না হওয়াতেই নাটিকার উৎপত্তি), এক টুকরা গবেষণা (কি বিষয়-অবলম্বনে, তাহা পর্য্যন্ত বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছি)—এইগুলি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। অথচ এইগুলি লেখকের প্রকাশিত রচনাবলি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। (Methinks I hear the Cynic say) বিশ্বনিন্দুক অবশ্য টিপ্পনী কাটিবেন, 'যে মাছটা পালায় সেইটাই বড় হয়।' যাহা হউক, দুই একটি প্রবন্ধ ও কয়েকটি 'খেয়াল' স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া উদ্ধার (rescue) করিতে পারিয়াছি; একটু সুস্থ হইয়াই খসড়া-আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; অদ্য পূজার বাজারে "খেয়াল" কয়টি 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকবর্গকে নবরত্ন-উপঢৌকন (!) দিতেছি। বোধ হয়, সব কয়টিতেই রোগশয্যার গন্ধ পাওয়া যাইবে।

"জানি না এর কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা নয়।
জানি না কে কোন্‌টা রাখে, কোন্‌টা লয়॥"

ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি কোল্‌রিজ্ (Coleridge) স্বপ্নে কবিতা রচনা করিয়া তাহা জাগ্রদবস্থায় অসম্পূর্ণ আকারে ('Kubla Khan') লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; স্কট্‌ল্যাণ্ডের খ্যাতনামা লেখক ষ্টিভ্‌ন্‌সন্ (R. L. Stevenson) তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা ('The strange case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde') স্ব

কথাটি স্বপ্নে পাইয়াছিলেন। (স্বপ্নাপ্ত ঔষধের চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার!) বাঙ্গালা সাহিত্যেও দেখা যায়, একাধিক কবি স্বপ্নে দেবদেবীর প্রত্যাদেশ পাইয়া কাব্য লিখিয়াছেন। আর অভাগা আমার ভাগ্যে জ্বরের ঘোরে ফলিয়াছে—এই খেয়ালগুলি। 'মৌক্তিকং ন গজে গজে।' ইতি জন্মখণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

১। কাশীতে নববর্ষা

[জ্যৈষ্ঠের, জ্বরের, ফোড়ার, যথা—(?) পরিমাণ কুইনিনের, এবং পশ্চিম-মুখো ঘরের—এই পাঁচ রকমের গরমে পঞ্চতপাঃ হইয়া যখন 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতে করিতে চাতকের মত শুষ্ককণ্ঠে 'ফটিকজলে'র যাচক, তখন সদ্যোবিপত্নীক 'অলকা'-সম্পাদক (হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ) দেখা করিতে আসিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, "এখানে বর্ষা আরম্ভ হয় কোন্ সময়ে বলিতে পারেন?" তিনি বলিলেন, "১লা আষাঢ়।" একেবারে আস্ত 'মেঘদূত!' আর তাঁহার অবস্থা কালিদাসের যক্ষ অপেক্ষাও শোচনীয়। (যাকৃ সে দুঃখের কথা।) তাঁহার এই ব্রহ্মবাক্য যথাসময়ে ফলিয়াছিল।] কাশীতে ঠিক 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' 'বর্ষা এলায়েছে তা'র মেঘময় বেণী।' তবে এ অঞ্চলের মহিলাকুলের চুলের গোছ বঙ্গাঙ্গনাগণের কেশকলাপের মত ঘন ও দীর্ঘ হয় না, তাই হেথায় বর্ষা-যোষার বেণী হইতে জল ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিতেছে না, ঝির ঝির করিয়া পড়িতেছে। মুষলধারে অর্থাৎ ঝম্-ঝম্ করিয়া হইতেছে না, সূচিধারে অর্থাৎ ফিস্ ফিস্ করিয়া হইতেছে।[১]

(১) শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়াই কথাটা লিখিয়া ফেলিয়াছি ও খোট্টাসুন্দরীদের খাটো চুল লইয়া খোঁটা দিয়াছি। পিছে মালুম-হো গিয়া—শ্রাবণের বৃষ্টিধারার কি প্রবল তোড়! শিলং চেরাপুঞ্জি কোথায় লাগে? ইহাকে মুষলধারে বলিলেও কম

যাহা হউক, ইহাতেই এবারকার জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর বসুমতী ঠাণ্ডা হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দুই ডিগ্রী নামিয়া গেল। এই জ্বরতপ্ত কুইনিন্-জব্দ রোগীর দগ্ধপ্রাণে আষাঢ়ের আসার-ধারার আসার সঙ্গে সঙ্গে আশার সঞ্চার হইল। 'কাশীতলবাহিনী' গঙ্গা কাশীর পাষাণময়ী পুরী শীতল করিতে পারেন নাই ; দু'ফোঁটা আকাশের জল তাহা করিল। এ যে স্বরগের ধারা, আর সুরধুনী স্বর্গ হইতে মর্ত্তের মাটীতে পড়িয়াই মাটী হইয়াছেন। (সত্যই তো তিনি আমাদের মা-টি, 'মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।')

২। মা-সরস্বতীর শাপ

জ্ঞানোদয় হইতে একনিষ্ঠ হইয়া মা-সরস্বতীর সাধনা করিয়াছি, অন্য দেবদেবীর ধার ধারিতাম না, শুধু ঠাকুরদেখা-হিসাবে তাঁহাদিগকে ভক্তি করিয়াছি। মা-সরস্বতীও একনিষ্ঠ সাধনায় প্রসন্না হইয়া এই অধমকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, (/০) অধ্যাপনা-প্রিয়তা, (৵০) রচনা-শক্তি। ইহা হইতেই আমার যা' কিছু ধনমান যশোভাগ্য। (বেশ একটু অহমিকা প্রকাশ করিলাম ; কিন্তু ভবের হাট হইতে দোকানপাট তুলিতে বসিয়াছি, এখন ইহার জন্য বোধ হয় ক্ষমার্হ বিবেচিত হইব।) পুনঃ পুনঃ উপযুক্ত পুত্রের অকাল-বিয়োগজনিত শোকে পঠন-পাঠনে, রচনায় ও ছাত্র-মণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতায় বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, আজীবন-সঞ্চিত রাজ-

---

করিয়া বলা হয় ; একেবারে উদূখলধারে, অথবা গুরুচাণ্ডালী ভাষায়, ঢেঁকিধারে। ইংরেজীতে বলিতে হইলে, 'It rains cats and dogs' নহে, 'It rains bulls and buffaloes'। আর মা গঙ্গাও খুব শোধ তুলিলেন—জলে সদর রাস্তা গলিরাস্তা পাথার—'ইন্দ্রভবন, 'পুষ্কর', 'কুরুক্ষেত্র' কিছুই এবার বাকী রহিল না। (এগুলি কাশীর গঙ্গার জলবৃদ্ধির ব্যাপার, ঠিক কি শাস্ত্রোক্ত বস্তু, জানি না।)
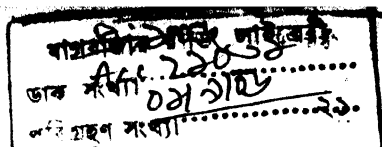
ভাষায় রচিত গ্রন্থরাশি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে, বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত 'চন্দ্র-শেখরে'র মত অগ্নিতে আহুতি দিতে ঝোঁক হইত। ইহাতেই তো মা-সরস্বতী বেশ একটু রুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার উপর আবার মায়ের পার্থিব পীঠস্থান (কাগজ) পীড়াকালে শুধু দু'পা দিয়া মাড়াইয়াই ক্ষান্ত হই নাই, তদপেক্ষাও কদর্য্য কার্য্যে লাগাইয়াছি।[২] তাই মা অধিকতর কুপিত হইয়া দক্ষিণ করতলে (Carbuncle) কার্ব্বঙ্ক্লের উদ্ভব করিয়া দিয়া হাতটি আড়ষ্ট করিলেন, 'বাহু-প্রতিষ্টম্ভেন' 'বিবৃদ্ধমন্যু' প্রকাশ করিলেন, ফলে রচনাশক্তি রহিত হইল। মায়ের শাপ হইতে কোন্ দেবতা রক্ষা করিতে পারেন?

এই মন্তব্য খসড়া-অবস্থায় দেখিয়া আমার জনৈক আত্মীয় আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, "এটা আপনার বিষম ভুল; 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কদাপি নয়।' ছেলে বেসামাল হইয়া যদি মায়ের কোল নোংরা করিয়া দেয়, তাহাতে কি মা রাগ করেন? রাগ করিয়া তিনি কি শাপ-মন্যি দিতে পারেন? 'ন মাতা শপতে পুত্রম্।' আর মায়ের শাপ তো ছেলের লাগে না।"

এখন দেখিতেছি, আত্মীয়বর আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য স্তোক-বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, কথাগুলি খাঁটি সত্য। কার্ব্বঙ্ক্ল্ সারিলে প্রথমেই লেখন-কুশলতা ফিরাইয়া পাইয়াছি; তখনও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুখে অন্নগ্রাস তুলিতে পারি না, অথচ লেখনী-চালনায় হস্ত বেশ তৎপর হইয়াছিল। ধন্য মায়ের অবিকারী স্নেহ, ধন্য তাঁহার অহৈতুকী কৃপা!

পুনশ্চ।—কার্ব্বঙ্ক্লের ক্ষত ও বেদনা সারিয়াছে, কিন্তু হাত আড়ষ্টই আছে, তা' আবার ডা'ন হাত। সুতরাং পদে পদে পরাধীন হইয়া

---

(২) একটু বীভৎস-রসের সঞ্চার করিলাম। রোগের ক্ষেত্রে কার্য্যটা অপরিহার্য্য; সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রেও একটু গড়াইয়া পড়িলে উপায় কি?

পড়িয়াছি। এমন কি, 'দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারে'র জন্যও (মুখে অন্নের গ্রাস তুলিবার জন্য, ভাত মাখিবার জন্য) পরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। (অবশ্য সাহায্যকারিণী ঠিক 'পর' নহেন।) জ্যোতিষীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, এই যে বৎসরাধিককাল রোগে ভুগিতেছি, ইহা গ্রহনিগ্রহ। আচ্ছা, এই পরাধীনতা কোন্ গ্রহের প্রকোপে? তিনিই বুঝি ভারতেরও ভাগ্য-বিধাতা?

পুনঃ পুনশ্চ।—জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ঘা, ফোড়া ইত্যাদি 'মঙ্গলে'র প্রকোপে ঘটে। আশ্চর্য্য বটে, 'মঙ্গল' অমঙ্গল ঘটান! যাহার যেমন অদৃষ্ট! আজন্মদুঃখিনী সীতাদেবীর ভাগ্যে 'অশোকের বন' 'শোকের ভবন' হইয়াছিল। আর বাল্যে মাতৃহারা, যৌবনকাল হইতে এই অকাল-বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পুত্রহারা, হতভাগ্য আমার অদৃষ্টে 'মঙ্গল' অমঙ্গল বিধান করিতেছেন, 'আনন্দ-কাননে' আসিয়াও নিরানন্দ নিবারণ হইতেছে না, প্রত্যুত কায়িক ও মানসিক যন্ত্রণা 'দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা' হইতেছে। কবি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—'বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।' 'যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্' বলিয়াই বুক বাঁধিতে হইবে।

৩। ক্ষৌরকর্ম্ম ও নির্ব্বেদ

[দীর্ঘকাল রোগভোগের পর আরোগ্যস্নানের দিন ক্ষৌরকার্য্যের সময় মনে এই খেয়ালটির উদয় হইয়াছিল।]

পহেলা দফা। প্রথম প্রথম যৌবনারম্ভে যখন ঠোঁটের উপর অল্প অল্প গোঁফ ওঠে, যেন ইট-পাথরের আশে পাশে ভিজা জমিতে দূর্ব্বাঘাস গজায়—'বদনমণ্ডল, চাঁদ নিরমল, ঈষৎ গোঁফের রেখা'—তখন সেই গোঁফের তোয়াজ দেখে কে? 'সাহেবদের' গৃহপ্রাঙ্গণস্থ (Lawn) 'লনে' 'সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি' নবদূর্ব্বাদল জন্মাইবার জন্য মালীর যত্নও ইহার

কাছে হারি মানে। ‘দণ্ডে শতবার’ আয়না ধরিয়া দেখা, সেই কোমল, মসৃণ, রোমরাজির (‘soft down of youth’) উপর সাদরে আঙ্গুল বুলান (যেন নবীনা জননী ক্রোড়স্থ শিশুর অঙ্গে সস্নেহে হাত বুলাইয়া অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন); আর কিরূপে নিবিড়কৃষ্ণ ‘ভ্রমরপাঁতির দেখা’ অগৌণে মিলিবে, ‘সেই ভাবনা রাত্রিদিনে।’ অশৌচান্তে কামাইতে হইলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়, বলিতে চাহে—‘শির দেঙ্গে, মোচ নেহি দেঙ্গে।’ বার বার কামাইলে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, ঘন (কিন্তু কর্কশ!) হয় বলিয়া আশ্বাস দিলেও মন মানে না, দু’দিনেরও বিরহ সহ্য হয় না। (স্ত্রৈণ পুরুষের প্রাণেশ্বরীকে প্রসবের জন্য পিত্রালয়ে প্রেরণের ন্যায়।) [৩]

দোসরা দশা। পরে যৌবন ভাটাইয়া আসিলে নির্ব্বেদের সঞ্চার আরম্ভ হয়, মুসলমান-খৃষ্টানের চিহ্ন জবরজঙ্গ জঙ্গলী দাড়ী কামাইয়া ফেলা হয়। (দাড়ী-চশমা ব্রাহ্মের লক্ষণ, এরূপ একটা ধারণাও এক সময়ে ছিল।) দাড়ী ফেলায় চেহারাটা বেশ ছিমছাম, ভদ্র, সভ্য দেখায়। [৪]

---

(৩) গোঁফ-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দাড়ী-সম্বন্ধেও কতকটা সেই কথা বলা চলে। অবশ্য আমাদের যৌবনকালের কথা বলিতেছি, হালের ছোক্‌রা-বাবুদের কথা বলিতেছি না। তাঁহাদের ধুতী, চুড়ীদার, লপেটা, মাথার চুলে সিঁথি কাটা, রিষ্ট্-ওয়াচ্, সবই মেয়েলি ঢংএ (effeminate); তাহারই সঙ্গে মিল রাখিয়া স্বহস্তে ‘নিরাপদ্’ ক্ষুর (safety razor) চালাইয়া তাঁহারা মুখমণ্ডলের সর্ব্বত্র সমূলে কেশকুল ধ্বংস করিয়া (Kroppএর ক্ষুরে crop up করিয়া), যাত্রার দলের সখী সাজেন, (কি ভাগ্যে জ্র কামান না!) কেবল মাথার সাম্‌নে এক থকা ঝাঁকড়া চুল রাখেন (ইংরেজী ‘Time's forelock’এর নজিরে?), ইহাই হইল হাল ফ্যাশান্। (ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মস্তকের মধ্যস্থলে স্থূলশিখা রাখারই যত অপরাধ!) সম্মুখ দেখিলে নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড্ দেশের জীববিশেষের সহিত সাদৃশ্যই চোখে ঠেকে। (তবে প্রৌঢ়দের, বিশেষতঃ ‘চতুর্থে’ চতুর্থপক্ষাশ্রয়ীদের বলি, এরূপ চাঁচিয়া পুঁছিয়া কামানর একটা মস্ত সুবিধা—৭৫ বৎসরেও ১৫ বৎসরের অজাতশ্মশ্রু বালক সাজা যায়।)

(৪) ঐতিহাসিকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে এই কারণে রুষজাতির সভ্যতা-বিধানের মূলপুরুষ পিটার্ দি গ্রেট্ দাড়ীর উপর টেক্স বসাইয়াছিলেন এবং জোর করিয়া সকলকে

তেসরা দশা। প্রৌঢ় বয়সে, পাকা প্রবীণ হইলে, গোঁফের মায়াও কাটিয়া যায়, ক্রমে নির্ব্বেদ ঘনীভূত হয়।[৫] তখন গোঁফ ফেলার ধূম পড়ে। (শত্রুপক্ষ বলেন, নির্ব্বেদ-ফির্ব্বেদ ও-সব বাজে কথা। মাথার চুলের আগে গোঁফ পাকিতে সুরু করে, গোঁফ গোয়েন্দাগিরি করিয়া বয়স ধরাইয়া দেয়, তাই গৃহশত্রু বিভীষণ গোঁফের ধ্বংস।)

চৌঠা দশা। দাড়ী গেল, গোঁফ গেল, বাকী রহিল মাথার চুল। এ দিকে বার্দ্ধক্যও আসিল; এখন 'চতুর্থে কিং করিষ্যতি', দেখা যাউক। কিন্তু এ যে ঝুনো, আর নির্ব্বেদের দাঁত ফুটে না, 'সে বড় কঠিন ঠাঁই।' জরায় জরায় জরিয়া শিরোদেশ বিরলকেশ হইয়া পড়ে, মাথাময় টাকে ঢাকে, তথাপি সেই পাতলা দু'চার গাছ চুলের মায়া যায় না। সেই কয়গাছিই যেন গ্রীক্-পুরাণোক্ত দেবীর হস্তধৃত জীবনসূত্র ('thread of life'), অথবা য়িহুদি বীর (Samson) স্যাম্‌সনের ঝাঁকড়া চুলের মত পৌরুষের আধার। হায় রে মায়া! তখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বা

দাড়ী কামাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে (Every rule has its exception); কাহারও কাহারও মুখে দাড়ী দিব্যি মানায়। ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দাড়ীর তরফে ওকালতী করিবার একটা প্রবল ঝোঁক হইতেছে, কিন্তু ঝোঁকটা কষ্টেসৃষ্টে দমন করিলাম। কেননা, তাহাতে দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ীর ভারে ফুট্‌নোট্ বেজায় ভারী হইবে; ছোট্ট প্যারার পিছনে প্রকাণ্ড পাদটীকা নিতান্তই বেমানান হইবে—সেই আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত (পরীবানুর ভ্রাতা) দেড় ফুট্ খাড়াই লোকটির ত্রিশ ফুট্ লম্বা দাড়ীর মতই দেখাইবে। আর পাদটীকায় সম্মানাস্পদ ব্যক্তি-দিগকে স্থান দেওয়া শিষ্টাচার-সম্মত নহে। অতএব দোসরা দশার নজিরে দাড়ী বর্জ্জন করিলাম। তবে বারান্তরে সবিস্তরে দাড়ীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিব, 'জানান' দিয়া রাখিলাম। দাড়ীধারী সম্পাদক ও পাঠক আশ্বস্ত হউন।

(৫) যুবাদের বেলায় গোঁফ ফেলাও যদি কেহ নির্ব্বেদের লক্ষণ বলিয়া বসেন এবং "পূর্ব্বে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্ত ইতি মে মতিঃ। ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে ॥" এই শ্লোক ঝাড়িয়া বাহবা দেন, তবে নাচার।

বৌদ্ধশ্রমণের মত মস্তক মুণ্ডন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ফল কথা, বাঙ্গালী হিন্দুর নির্ব্বেদ মুখেই (দাড়ী-গোঁফে) থাকিয়া যায়, মাথায় কখনও উঠে না, শিরোধার্য্য হয় না। এমন কি, কেহ কেহ মহাগুরুনিপাতেও মস্তক মুণ্ডন না করিয়া পুরোহিতকে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য ধরিয়া দিয়া প্রতিনিধিতে সারেন। (নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া প্রতিপন্ন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।) ইঁহারা, বোধ হয়, ভয় করেন, মাথা মুড়াইলে লোকে ঘোল ঢালিয়া দিবে বা গোচোর ঠাওরাইবে!

৪। দশ আনা ছয় আনা

[এ কালের ছোকরাবাবুদের চুলছাঁটার কথা বলিতেছি না, তাহার মুড়া তো আগেভাগেই মারিয়া রাখিয়াছি—৩নং ফুট্‌নোট্ দেখুন। জমিদারীর সরিকানা স্বত্বের কথাও বলিতেছি না। নিজের দেহতত্ত্ব, রোগভোগের কথা লইয়াই আছি।]

এক দিন জনৈক দূরপ্রবাসী বন্ধুর পত্র পাইলাম, তিনি লিখিয়াছেন, 'আপনার পত্র পড়িয়া বুঝিতেছি, দশ আনা রকম সারিয়াছেন।' বন্ধুটি দেখিলাম, দূরবাসী হইয়া দূরদর্শীও সাজিতে চাহেন, নতুবা রোগীকে না দেখিয়া, শুধু রোকায় সংবাদ জানিয়া, অত দূর হইতে কিরূপে—কোন্ শুভঙ্করী প্রণালীতে—আমার আরোগ্য-কষা আয়ত্ত করিলেন এবং এরূপ শব্দভেদী বাণ ঝাড়িলেন? যাহা হউক, বন্ধুবর শেষটা অদূরদর্শী বা অপরিণামদর্শীই প্রমাণিত হইলেন। কেননা, যখন তাঁহার পত্র পাইলাম, তখন বার বার তিনবার পড়িয়াছি। আমি উত্তরে লিখিলাম, "আপনার অঙ্কটা হয় তো মূলে ঠিক কষা হইয়াছে, কিন্তু জানেন তো, দশ আনা (॥৵০) ছয় আনা (।৵০) হইতে বেশীক্ষণ লাগে না—একটা চোখের ওয়াস্তা!" এক জন তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীর সহিত সে দিন বহুকাল

পরে দেখা হওয়াতে তিনি ঝাঁ করিয়া বলিয়া বসিলেন, 'আপনার চেহারা দেখিয়া বেশ সারিয়া উঠিতেছেন বুঝা যায়।' আর যাবে কোথা? পরদিনই ঘাড়মুড় ভাঙ্গিয়া ডেঙ্গুর আক্রমণ। সেই যে চোখ লাগিল, তাহাতেই বিপত্তি ঘটিল। একটা চোখের ওয়াস্তা নহে কি?

শুভানুধ্যায়ীটি একচোখোও বটে; কেননা, তিনি সারার লক্ষণটুকুই বড় করিয়া দেখিলেন, আর দীর্ঘকাল রোগভোগে যে দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, দেখিলে চেনা যায় না, এত রোগা হইয়া গিয়াছি, সে দিকে তাঁহার নজর পড়িল না। লোকটি বোধ হয় optimist, সব জিনিশের ভাল দিক্‌টাই দেখেন। অথবা খোসখবর দিয়া আমাকে খুসী করিতে, আমার চমক লাগাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ ইচ্ছার জন্য অবশ্য আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু শনির দৃষ্টির মত তাঁহার দৃষ্টিই যে আমাকে কাবু করিয়া ফেলিল, সে কথাও তো ভুলিতে পারিতেছি না, আমি যে সেইটাই বড় করিয়া দেখিতেছি। 'যেখানে ব্যথা, সেইখানেই হাত।'

৫। ঝিঙ্গের ঝোলে বৈচিত্র্য [৬]

[ছানার জল বা 'হোয়ে' (whey) ও দুধসাগুর সঙ্গে সঙ্গে যখন মুখের একটু 'যুত' করিবার ইচ্ছায় কোনওরূপ 'নোন্‌তা' খাইবার জন্য উমেদারি করিতে লাগিলাম, তখন সদাশয় ডাক্তার বাবু মূলা, ডুমুর, কাঁচা পেঁপে, খোসা

(৬) এইটি ও ইহার পরবর্ত্তী তিনটি আমার 'খেয়াল' নহে; যে ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহারই খোসগল্প। তবে রোগীর ঔষধ-পথ্যের ন্যায় যখন তিনি এই খোসগল্প কয়টিও আমার রোগের উপলক্ষেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন এগুলি আমারই সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। অন্ততঃ এই লম্বোদরের (সম্প্রতি রোগভোগে কৃশোদরের) লেখনী-সাহায্যে এগুলির নরলোকে প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু শাস্ত্রীয় উপাখ্যানই তো অপরের মারফত প্রচারিত হইয়াছে, এইরূপ প্রসিদ্ধি।

ও বীচি ফেলিয়া (ল্যাজামুড়া বাদ দিয়া!) কচি পটোল, ও পল্‌তা, এই পাঁচ আনাজের নিরামিষ ঝোল, পল্‌তার ঝোল ও সুক্ত খাইবার অনুমতি দিলেন; তবে শুধু ঝোলটুকুই পেটে পড়িবে, আনাজগুলি নহে, এ বিষয়েও সাবধান করিয়া দিলেন—(বাবাজীর পাঁঠার মাংস একধারে সরাইয়া রাখিয়া ঝোলের বাটিতে চুমুক দেওয়ার ন্যায়)। ইহা নিতান্ত একঘেয়ে হইবে, এই-রূপ মৃদু আপত্তি করাতে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, 'ইহাতেই যথেষ্ট রকমারি (variety) হইবে' এবং সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গল্পটি করিলেন।]

"এক মুন্‌সেফ বাবু সস্তার সওদা হিসাবে নিত্য 'অখদ্দে' ঝিঙ্গের ঝোল খাইতেন। তাঁহার এক জন বন্ধু এক দিন তাঁহাকে বলিলেন, 'ভাই, রোজ রোজই এক আনাজ খাও, একঘেয়ে লাগে না?' মুন্‌সেফ বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'এক ঝিঙ্গেকেই কোনও দিন ফালা ফালা করিয়া কুটি, কোনও দিন চাকা চাকা করিয়া কুটি, কোনও দিন ডুমো ডুমো করিয়া কুটি, এতেই তো দিন দিন রকমারি হয়। আর কি চাই?' বন্ধুবর নিরুত্তর।"

গল্পটি বলিয়া ডাক্তারবাবু উচ্চ-হাস্য করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু আমার পলতার স্মরণে 'তিতায় তিতিল দেহ।'

৬। 'গিরিশ যদি থাকৃত?'

[যখন ঝোলের একধাপ উপরে আনাজে উঠিয়াছি, পেঁপের ডাল্‌না, ডুমুরের ডাল্‌না, নিমুয়ার ঘণ্ট, পটোল-ভাতে খাইতে অনুমতি পাইয়াছি, তখন এক দিন ডাক্তার বাবুর কাছে আরজি পেশ করিলাম, 'একটু যদি নৈনিতাল আলু-ভাতে খেতে পেতাম।' তিনি অবশ্য বুঝাইলেন, 'আলু আর বিলিতী কুমড়ো পেট গরম করে, হজম হ'তেও কষ্ট, ও সব তো চল্‌বে না।' আমি বলিলাম, 'তা' বটে, তবু।' এই 'তবু' শুনিয়া তিনি বলিলেন।]

"আপনার দেখ্‌ছি, সেই গিরিশের পিসির মত হ'ল। পিসির বাড়ী একটা পেয়ারা-গাছ ছিল। যখন তখন এসে পাড়ার ছোঁড়ারা পেয়ারা পাড়্‌ত। বুড়ী তাড়া দিলে তা'রা কেয়ার্ করত না। নিরুপায় হ'য়ে বুড়ী তাদের ভয় দেখাবার জন্যে বল্‌ত, 'দাঁড়া তো রে, গিরিশকে ডাকি।' ছেলেরা বল্‌ত, 'সে কি পিসি মা? গিরিশ তো কল্‌কাতায় কালেজে পড়্‌তে গিয়েছে।' পিসি মা তখন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌তেন, 'তা' বটে, বাবা, তা' বটে, কিন্তু—গিরিশ যদি থাকৃত?' আলুও যদি আপনার খেতে থাক্‌ত!"

৭। 'পাল্‌কী উঠাও—জাহান্নম্ যাও।'

[দুর্ব্বল শরীরে হাঁটিতে কেন, উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি না, অথচ ডাক্তার বাবুর অভিমত—নির্ম্মল বায়ু সেবন না করিলে শরীর শীঘ্র সুস্থ হইবে না; এই জন্য তিনি আমাকে সকালে-বিকালে পাল্কী চড়িয়া ভিক্টোরিয়া পার্কে গিয়া তথায় ঘণ্টা খানেক করিয়া শুইয়া বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া নিম্নলিখিত গল্পটি তুলিলেন।]

"জেলার 'মেজেষ্টার্' সাহেব বেজায় স্থূলকায়, স্বাস্থ্যের দিকে খর নজর, হাওয়া খাওয়া রীতিমত চাই; কিন্তু না পারেন হাঁটিতে, না পারেন ঘোড়ায় বা সাইক্লে চাপিতে। ব্যবস্থা হইল, পাল্কী চড়িয়া প্রাতে বায়ুসেবন করিবেন। সাহেবের দুইটি বুলি, পাল্কীতে উঠিয়াই বলেন, 'পাল্কী উঠাও', আর বেহারারা 'হুজুর, কাঁহা লে যায়ে গা' জিজ্ঞাসা করিলে হুকুম ঝাড়েন, 'জাহান্নম্ যাও।' সাহেব দিব্য আরামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়াছেন, বেহারারা গুরুভার-বহনে গলদ্‌ঘর্ম্ম, অথচ থামিবার, বোঝা নামাইবারও হুকুম মিলে না। এই রকম করিয়া রোজ ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বেচারারা হায়রান। যে দল এক দিন

আসে, সে দল আর দ্বিতীয় দিন আসে না। কিন্তু নাজির পেশকার আবার এক দল সন্ধান করিয়া আনে। কিছুদিন এই ভাবে চলিল। শেষে অতিষ্ঠ হইয়া বেহারারা এক যুক্তি করিল। পরদিন তাহারা সাহেবকে ঘণ্টা খানেক বহিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, 'হুজুর, আউর কাঁহা লে যায়ে গা,' তিনি তাঁহার সেই বাঁধা বুলি আওড়াইলেন। তাহারা সটান একটা মজা বিলে পাল্কী লইয়া গিয়া যেন পা হড়কাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, এই ভান করিয়া সাহেবকে একেবারে কাত করিয়া ফেলিয়া দিয়া, যেন বেয়াকুবের মত দাঁড়াইল। সাহেব একে স্থূলকায়, তাহাতে 'মগ্নঃ পঙ্কে সুদুস্তরে,' 'পঞ্চতন্ত্রে'র হাতীর মত দশা হইবার উপক্রম। অনেক চেষ্টায় বেহারারা তাঁহাকে টানিয়া ছেঁচড়াইয়া শুক্‌না ডাঙ্গায় তুলিল। সেই দিন হইতে সাহেবের জাহান্নমে যাইবার সাধ ফুরাইল, পাল্কী চড়ার সখও মিটিল।" [১]

৮। 'তুম্‌ হাম্‌সে বহুৎ জাস্তি কর্‌কে কাঁঠাল খায়া?'

"'মেজেষ্টার্' সাহেব সখ করিয়া 'নয়া চিজ' পাকা কাঁঠাল খাইয়া গোঁফদাড়ীতে কাঁঠালের আঠা লাগাতে বিব্রত হইলেন। পেশকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে আঠা উঠে। সে সরিষার তেলের কথা বলিল। 'সাহেব' তো ও (ন্যাস্‌টি, Nasty) নোংরা জিনিশ কিছুতেই ছুঁইবেন না। শেষে গোঁফদাড়ী কামাইয়া অব্যাহতি পাইলেন।

"কিছুদিন পরে পেশকারের পিতৃশ্রাদ্ধে সাহেব নিমন্ত্রিত হইলেন। সভাস্থ হইয়া তিনি দেখিলেন, পেশকারের শুধু গোঁফদাড়ী নহে, মস্তক পর্য্যন্ত

(১) এই গল্প-সম্বন্ধে লেখকের একটু খোঁকা আছে। প্রবল-প্রতাপ 'মেজেষ্টার্' সাহেবকে বিপন্ন করিয়া বেহারারা কি এত সহজেই পার পাইল? তবে এ সব আপত্তি তুলিলে গল্পের রসভঙ্গ হয়।

মুণ্ডিত, কেবল কাঁঠালের বোঁটার মত স্থূল একগোছা চুল মাথার মধ্যস্থলে রহিয়াছে। সাহেব কুশাগ্রীয়ধী, চট্ করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া সপ্রতিভ-ভাবে বলিলেন, '(Well) ওয়েল্, পেশকার, তুম্ হাম্‌সে বহুৎ জাস্তি কর্‌কে কাঁঠাল খায়া?' কাঁঠাল না খাইলে যে মানুষের এ রকম তেলগোল করিয়া কামাইবার প্রয়োজন হয়, ইহা অবশ্য সাহেবের বুদ্ধির অগম্য।"

[লেখকের দৌহিত্রের ফোড়া অস্ত্র করিবার সময় বালককে অন্য-মনস্ক করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিতবুদ্ধি ডাক্তারবাবু পাকা কাঁঠালের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন, পূর্ব্বের গল্পগুলির মত লেখককে পথ্য দেওয়ার প্রসঙ্গে নহে। যাক্, পাকা কাঁঠাল খাইতে না দিলেও (কাশীতে উহা অখাদ্য) করুণাসিন্ধু ডাক্তার বাবু লেখককে সুপক্ক বোম্বাই ও ন্যাংড়া আম, পাকা পেঁপে এবং লিচু, তরমুজ, খরমুজার সরবত এলাহি খাইতে দিয়াছিলেন (বেলের সরবত, আনারসের সরবতের তো কথাই নাই)। এমন সুব্যবস্থা কয়জন ডাক্তারে করে? ভোজনবিলাসী রোগীর ধাতটি তিনি ঠিক ধরিয়াছিলেন। তাই প্রথম প্রথম রাশ টানিয়া ধরিলেও তাহার পরে সময় বুঝিয়া নানা মুখরোচক খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদি দিন পাই তো গুণের ডাক্তার বাবুর কথা সময়ান্তরে বিস্তারিত-ভাবে বলিব।]

[কিন্তু সে কথা বলি বলি করিয়া আর বলা হইল না। তাই এখন সংক্ষেপে সারিতে হইতেছে। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম (বোধ হয় মার্কিন্ ডাক্তার ও লেখক Holmes হোম্‌সের একখানি পুস্তকে) যে আদর্শ ডাক্তারকে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে দেখিলেই রোগীর নাড়ী সুস্থ হইয়া উঠে, রোগ-যন্ত্রণার উপশম হয়, রোগীর তাঁহার উপর এতই বিশ্বাস। এ কথা আমার এই চিকিৎসক-সম্বন্ধে খুবই খাটে। তাঁহার বিজ্ঞতা, ধীরতা, অমায়িকতার কথা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি চিকিৎসা করিয়াই, রোগীর শয়ন-ভোজন সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াই

ক্ষান্ত হন নাই, নিজের ঘর হইতে প্রবাসস্থ রোগীর প্রয়োজন-সাধনের জন্য ফীডিং-কাপ্ বেড্-প্যান্ প্রভৃতি দ্রব্য পর্য্যন্ত সরবরাহ করিয়াছেন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর মধ্যে এমন সহৃদয় পরোপকারী সজ্জন কয়জন মিলে? খোস-গল্প বলিয়া ও অন্যান্য উপায়ে রোগীর প্রফুল্লতা-বিধানের চেষ্টার কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাঁহার নাম-ধামও এই সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। (আশা করি উদার-প্রকৃতি ডাক্তারবাবু ইহা অনধিকারচর্চ্চা মনে করিয়া রুষ্ট হইবেন না, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন বিবেচনা করিয়া তুষ্ট হইবেন।) তাঁহার নাম—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী (অবসর-প্রাপ্ত সিভিল্ সার্জ্জান্)। মদনপুরা মহল্লায় বড় রাস্তার উপর রায় বাহাদুর ৺কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ীর বিরাট্ অট্টালিকার পার্শ্বেই একটি দ্বিতল বাটীতে থাকেন। তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া সুস্থদেহে প্রসন্নমনে বহুবৎসর ধরিয়া আমার ন্যায় বিপন্ন রোগীর আরোগ্য-বিধান করুন, ৺বিশ্বেশ্বরের নিকট এই ঐকান্তিক প্রার্থনা।] (পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের মন্তব্য)।

৯। ঘর-জামাই

জামাই-জাতটা খুব মানী, অল্পেতেই তাঁহাদের রাগ-অভিমান হয়, 'পাণের থেকে চূণ খসিলেই' শ্বশুরবাড়ীর সকলকে প্রমাদ-গণিতে হয়; এই জন্যই পণ্ডিতজনে বলিয়া থাকেন, 'জামাতা দশমো গ্রহঃ।' ৮ একটুতেই বাবাজীরা ফোঁস করিয়া উঠেন—যেন জাতসাপ, গোখুরা। কিন্তু ঘর-জামাইএর সে তেজ, সে ঝাঁঝ, সে রোক, সে দর্পদন্ত কিছুই

(৮) 'কচিত্তুষ্টঃ কচিদ্‌বক্রী কচিত্তু ক্ষমিচ্ছতি।
কন্যারাশিং সদা ভুঙ্‌ক্তে জামাতা দশমোগ্রহঃ॥'

থাকে না, 'বরটি নয় যেন চোরটি !' [৯] একেবারে বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া—যেন সাপুড়ের ঘরের বিষদাঁত-ভাঙ্গা গোখুরা।

সরীসৃপের সহিত তুলনা করাতে আশা করি, এই সম্প্রদায় রাগ করিবেন না। একটি চল্‌তি হিন্দী প্রবচনে ইঁহাদিগকে চতুষ্পদের কোঠায় ফেলিয়া 'চৌঠা কুত্তা ঘর-জামাই' [১০] বলা হইয়াছে। আমি তো তাহার তুলনায় 'ভেতো' বাঙ্গালীর ভাষায় অনেক কম করিয়া বলিলাম। হিন্দী করিয়া বলিলেই যে গালাগালিতে জোর ধরে!

[অন্য 'খেয়াল'গুলির, লেখকের পীড়ার ব্যাপারের সহিত একটা না একটা যোগসূত্র আছে। প্রত্যেকটির বেলায় যথাস্থানে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু রাজা চার্ল্‌সের মাথার মত ('King Charles's head') 'ঘর-জামাই' এই 'খেয়াল'গুলির ভিতর কি করিয়া ঢুকিল, তাহার কোনই হদিশ পাইলাম না। যা হোক্, খস্‌ড়ায় 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং লেখকে দোষো নাস্তি কশ্চন।' এইটা দিয়া নবরত্নের নয় (৯) মিলিল; তবে পীড়ার সহিত এটার যোগ না থাকাতে যদি পাঠক এটাকে নাকচ করেন, তা' বেশ, এটা নয় (নহে); নবরত্নের স্থলে (অষ্টরত্না নহে) অষ্টবসু মিলিল; বসু-শব্দেরও গো শব্দের মত 'নানা অর্থ অভিধানে ভণে,' তন্মধ্যে একটি অর্থ 'রত্ন' (স্বয়ং 'বসুমতী'ই তাহার প্রমাণ)। অতএব পাঠক আশ্বস্ত হউন, পূজার বাজারে তাঁহার রত্নলাভই বজায় থাকিল।

---

(৯) 'হবির্বিনা হরির্যাতি বিনাপীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।'

এই শ্লোকটি বোধ হয় অনেকে জানেন। এই চারি জামাইএর মধ্যে ধনঞ্জয়ই আদর্শ (domesticated) 'গৃহজামাতা।' তবে সংস্কৃতভাষায় রচিত শ্লোকে যাহাই থাকুক, শ্বশুরবাড়ীর লোকে তাচ্ছিল্য করিয়া এই ঘরজামাইটিকে নিশ্চিতই 'ধনা' বলিত! ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্‌।

(১০) 'পহেলা কুত্তা কুত্তা পাজে, দোসরা কুত্তা ঘর ঘর ডোলে।
তেসরা কুত্তা বহিন-ঘর ভাই, চৌঠা কুত্তা ঘর-জামাই।'

দাড়ী-মাহাত্ম্য [১]

('মাসিক বসুমতী', কার্ত্তিক ১৩৩০)

'রোগ-শয্যার খেয়ালে' 'ক্ষৌরকর্ম্ম ও নির্ব্বেদ'-প্রসঙ্গে বলিয়াছি, দাড়ী ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান্-মুসলমানের চিহ্ন। (২৩ পৃঃ দেখুন)। বোধ হয়, জ্বরের ঘোরে বেশ একটু বেহুঁস অবস্থায় ফস্ করিয়া এই বেফাঁস কথাটা বলিয়া বসিয়াছি। পরে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, কথাটা ধোপে টেঁকে না, অথবা পণ্ডিতী ভাষায়, বিচারসহ নহে। কেননা, হিন্দুর পরমারাধ্য সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং স্বয়ম্ভুরই অর্থাৎ খোদ বিধাতা পুরুষেরই চতুর্ম্মুখ শ্মশ্রুসমাকুল। 'পিতামহে'র বদনমণ্ডল দাড়ী না থাকিলে মানায়ও না। এখনও সেই নজিরে ঠাকুরদাদারা দাড়ী রাখেন, নাতী-নাতনীরা লম্বা দাড়ী গোঁফ দেখিয়া কখনও ভয়ে অভিভূত, কখনও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়, আবার কখনও ভালবাসার আতিশয্যে উহাতে টান দিয়া পুলকিত হয়—যদিও 'নীতিবোধে'র ভেকের গল্পের মত, এক পক্ষের কৌতুক অপর পক্ষের সাঙ্ঘাতিক। কোনও কোনও ছবিতে রুদ্ররূপী মহাদেবের

---

(১) এই প্রবন্ধ-প্রকাশের দশবৎসর পূর্ব্বে লেখকের সতীর্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় ('নব্যভারত', আষাঢ় ১৩২০) 'দাড়ীর কথা' প্রচার করেন। সে সময়ে উহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। পরে উহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-প্রকাশের পরে আমার পুত্র উক্ত প্রবন্ধের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। রকমারি দাড়ী-সম্বন্ধে 'বড় হও ত দাড়ী রাখ'-শীর্ষক একটি সচিত্র বিচিত্র প্রবন্ধ 'সচিত্র শিশিরে' (অগ্রহায়ণ ১৩৩০) বাহির হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠককে এই প্রবন্ধও সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। (পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য)।

মুখমণ্ডলেও দাড়ী দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়।[২] মহাযোগী মহাদেবের জটাকলাপের সহিত শ্মশ্রুরাজি বেশ মিশ খায়, সন্দেহ নাই। তাহার পর, সেকালে (সত্যযুগে) মুনি-ঋষিদিগের অযত্নসংবর্দ্ধিত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু থাকিত। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যাঁহারা যোগনিরত, তাঁহারা ক্ষৌরকর্ম্মের অবসর পাইবেন কখন্? সুতরাং তাঁহাদিগের জটাপাকান চুল ও 'জীর্ণকূর্চ্চ' অর্থাৎ পাকা দাড়ী। অবশ্য সত্যযুগের সঠিক সংবাদ আমরা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অবগত নহি, কিন্তু এ কালের যাত্রার আসরে ইহার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়,—নারদ মুনির লম্বা পাকা দাড়ী সকলেরই সুপরিচিত। ভারতচন্দ্রের প্রসাদাৎ জানিতে পারি, ঋষিদের ক্ষৌরকর্ম্মের অবসর-অভাবে দাড়ী গজাইত। শুধু তাহা নহে, তাঁহাদের কাহারও কাহারও দাড়ীর সখও বিলক্ষণ ছিল। অত্র প্রমাণং যথা,—দক্ষযজ্ঞধ্বংসকালে শিবকিঙ্করগণ 'ভার্গবের **সৌষ্ঠবের** দাড়ী-গোঁফ ছিঁড়িল।' এখন কলির প্রকোপে মুনি-ঋষিরা লোপ পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও বহু হিন্দুসন্তান রোগবালাই দূর করিবার উদ্দেশ্যে 'বাবার দাড়ী' (তারকেশ্বরের মানত) রাখেন। সুতরাং দাড়ী হিন্দুর নিতান্ত নিজস্ব সামগ্রী, ইহা ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান্-মুসলমানের চিহ্ন বলিয়া তিন ফুঁয়ে উড়াইবার বস্তু নহে। (আজকাল এক শ্রেণীর না-গৃহী না-সন্ন্যাসী—না-ঘরকা—না-ঘাটকা দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা ধোপার কড়ির সাশ্রয় করিবার জন্য গেরুয়া পরেন আর নাপিতকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে দাড়ী রাখেন। তাঁহাদিগের কথা এ প্রসঙ্গে ধর্ত্তব্য নহে।) যাহা হউক, দাড়ীর নিন্দা করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি।

(২) সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ৺ অন্নদাপ্রসাদ বাগচির অঙ্কিত 'মহাদেবঃ সতীদেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি'র ছবি। অন্নদামঙ্গলে গৌরীর 'পাকাদাড়ী বুড়া বর' ঘটাইব বলিয়া নারদ শাসাইতেছেন ও নারীদিগের শিবনিন্দায় 'বুড়ার দাড়ী শণের নুড়ী' বলিয়া আক্ষেপ আছে।

এক্ষণে অপরাধক্ষমাপণ-স্তোত্রপাঠ ভিন্ন উপায় নাই। যে মুখে একবার 'চ্যাংমুড়ী কাণী' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছি, সেই মুখেই 'জয় ব্রহ্মাণী' বলিয়া স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। জয় শ্মশ্রু-বাবার (শ্বশ্রূ-মাতার নহে) জয়!

দাড়ী পুরুষত্বব্যঞ্জক, শৌর্য্যবীর্য্যের বাহ্য বিকাশ, সিংহের কেশরের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত। তবে ইহা 'কচিৎ কচিৎ ব্যভিচারী' ছাগীর গলায় যথা দাড়ী। অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা শেক্‌স্‌পীয়ারের ২।১ খানি নাটকে) যে নারীর দাড়ীর বার্ত্তা শুনা যায়, সে কলির ধর্ম্ম, ব্যভিচারের উদাহরণ; ঐ সকল ক্ষেত্রে সে 'মেয়ে পুরুষের বাবা'। আর এই উদ্ভট ঘটনা 'অবলা প্রবলা'র দেশের; আমাদের এই নির্বীর্য্য পুরুষের দেশে নারীর বড় জোর গোঁফের কথা কচিৎ শ্রুতিগোচর (নয়নগোচর?) হয়। যাক্, আর এ সব কুৎসার কথায় কায নাই।

সত্য কথা সরাসরিভাবে স্বীকার করাই ভাল, 'প্রাগহং যৌবন-দশায়াম্' বয়োধর্ম্মবশতঃ সযত্নে দাড়ীর চাষ করিয়াছিলাম, যদিও অধুনা লাঙ্গূলহীন শৃগালের দশায় উপনীত হইয়া দাড়ীর নিন্দা করিয়াছি। আমাদের বংশে ইহার বড় একটা রেওয়াজ নাই; কেবল এক জন পিতৃব্যের দেখিয়াছি; তিনি পুলিসের লোক ছিলেন, তাই বোধ হয়, আমাদের বংশগত শিষ্ট শান্ত আকৃতিকে পুলিসোচিত পরুষত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আমার যৌবনকালের দাড়ী 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' নিয়মের নিদর্শন। কেননা, পরম হিন্দু পূজনীয় মাতুল মহাশয়ের (ভাগলপুর কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল্ ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের) এককালে দাড়ী ছিল। পরে মদ্বর্ণিত নির্ব্বেদের দশায়, (পূর্ব্বপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ২৪ পৃঃ) দাড়ী গোঁফ উভয়েরই উচ্ছেদ হয়। আমিও এত কালে মাতুল মহাশয়ের ধারা বজায় রাখিয়াছি। তবে আমার দাড়ী ঠিক নির্ব্বেদের প্রভাবে যায় নাই, গিয়াছিল গ্রীষ্মকালে

মুখমণ্ডলে ফোড়ার জ্বালায়। অবশ্য শত্রুপক্ষ সে সময়ে টিটকারী দিতে ছাড়েন নাই যে, টালার হাঙ্গামার দরুণ আমি দাড়ী ফেলিয়া পরিত্রাণ পাই। দাড়ী ফেলা ঠিক উক্ত ঘটনার সমকালেই ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা 'কাকতালীয়'-ন্যায়ের (post hoc, ergo propter hoc) উদাহরণ বই আর কিছুই নহে। এতৎপ্রসঙ্গে এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, চেহারার জন্য দাড়ী রাখার অবস্থায় এ পক্ষ কখনও কখনও মুসলমানের দ্বারা 'মিঞা সাহেব' বলিয়া অভ্যর্থিত হইয়াছেন এবং কাবুলী মেওয়াওয়ালার উচ্ছিষ্ট গড়গড়া টানিতে সাদরে আহূত হইয়াছেন। হয় তো দাড়ী ফেলার মূলে সে লাঞ্ছনার স্মৃতিও পরোক্ষভাবে ছিল। এ সব sub-conscious selfএর কথা, মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব, মদ্‌বিধ ক্ষুদ্র-প্রাণ 'কেবল'-সাহিত্যিকের বোধাতীত। যাহা হউক, যখন দাড়ীর নিন্দা করিয়াছিলাম তখন নিজের পূর্ব্বকথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সংস্কৃতবাগীশ বলিবেন, 'আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি', আর মেয়েলি ভাষায় বলিবে, 'আপনার পানে চায় না' ইত্যাদি। যাক্, নিজের বকেয়া হালের পুরাতন কাসুন্দি না ঘাঁটিয়া অতঃপর শ্মশ্রুধারীদিগের নামগুণানুকীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাতিদীর্ঘ দাড়ী এবঞ্চ প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা জটিয়া বাবার দীর্ঘ দাড়ী ও নিবিড় জটা, অশেষ-বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির উদ্রেক করে। শুধু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কেন, আদর্শ ব্রাহ্মণ শুদ্ধসত্ত্ব গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি উন্নতদেহ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু দেখিলে প্রাচীন ঋষিদিগের কথা মনে পড়িত। ঋষি রবীন্দ্রনাথ তথা তাঁহার অগ্রজগণ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,* ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, * তথা

(*) পুস্তকাকারে প্রকাশকালে উভয় ভ্রাতাই পরলোকগত।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় পিতৃধারা বজায় রাখিয়াছেন। আবার ৺বলেন্দ্র-নাথ ও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর যৌবনে পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। ৺রাজনারায়ণ বসুর আকৃতি-গাম্ভীর্য্যে ও দাড়ীর নিবিড়তায় সিংহসম তেজস্বিতা প্রকাশিত হইত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র শ্বশুরের ধারা পাইয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের নহে, থিয়সফিষ্ট্-সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ত্রয়োদশ বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শন-শাখার সভাপতি, সম্প্রতি পরলোকগত ৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের শ্বেতশ্মশ্রুও শোভায় অতুলনীয় ছিল। ক্যানিং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ৺যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদজ্ঞ ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত—এতদুভয়কে সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুর জন্য বেশ মুনিগোঁসাইএর মত মানাইত। বেদজ্ঞানের কথা যখন উঠিল, তখন সেকালের ৺ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ও একালের ৺বহুবল্লভ শাস্ত্রী এই দুই জন বেদবিদের দাড়ীও এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ভাই ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ৺দুর্গামোহন দাস—ব্রাহ্মসমাজের এই ত্রিমূর্ত্তিও শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালীর সেরা ব্যারিষ্টার্ মিষ্টার্ ডব্লিউ সি বোনার্জ্জির জমকালো দাড়ী তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সর্ব্বাংশে উপযোগীই ছিল। পদ-পসারে সমান সমান না গেলেও দাড়ীর বহরে ও বাহারে, তথা প্রতিভা ও চরিত্র-গৌরবে, ব্যারিষ্টার্ ৺আনন্দমোহন বসুও কম যাইতেন না। দানশৌণ্ড স্যার্ তারকনাথ পালিতের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের বাগ্মি-প্রবর শ্রীযুক্ত [*] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আমাদের যৌবনকালের হীরো ম্যাট্‌সিনি বাঁড়ুয্যে, ও আজকালকার মিনিষ্টার্ স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ) ও পূর্ব্ববঙ্গের বাগ্মিবর ৺অম্বিকাচরণ মজুমদার—বক্তৃতাবাজ এই যুড়ীর দাড়ীর জোরে বক্তৃতার তোড় আরও বাড়িয়া যাইত। দেশসেবক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর

(*) পুস্তকাকারে প্রকাশকালে পরলোকগত।

চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাড়ীধারী বক্তৃতাকারীর শেষ-মেষ। কিন্তু এখন দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে, দাড়ী নাড়িয়া বক্তৃতা দিয়া ভারত-উদ্ধার আর চলে না, আসর আর জমে না, তাই চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু। রাষ্ট্রনীতির পিচ্ছিল পন্থাঃ পরিহার-পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ পরমহংসদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্মশ্রুধারণ করিয়াছেন শুনিয়াছি।

সাহিত্যের আসরে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের নবযুগের প্রবর্ত্তয়িতা 'মেঘনাদ-বধ'-রচয়িতা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দিকে ; 'হেলেনা'-কাব্যের রচয়িতা ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রতিভায় না হইলেও দাড়ীর দৈর্ঘ্যে 'হেক্টরবধ'-কাব্যের রচয়িতার পার্শ্বে স্থান পাইবার উপযুক্ত। একাধারে বঙ্গের শেক্স্‌পীয়ার্‌ ও গ্যারিক্‌ ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষও এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। 'ফুলজানি'র জনক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার শেষটা গুম্ফশ্মশ্রুহীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাদর আহ্বান 'লয়ে দাড়ী, লয়ে হাসি, অবতীর্ণ হও আসি', শ্রীশচন্দ্রের দাড়ীকে অমরত্ব দিয়াছে। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,(১) ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,(১) সর্ব্বকনিষ্ঠ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'নব্যভারতে'র লেখক ৺রসিকলাল রায় এবং 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র লেখক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়(১) দাড়ীর কদর রাখিয়াছেন।

সম্পাদক-মহলে দাড়ীর দণ্ডকারণ্য দাঁড়াইয়াছে। 'সাধারণী'-সম্পাদক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিরাট্‌ বপুঃ দাড়ীর দৈর্ঘ্যের দরুণ বেশ জম্‌-জমাট ছিল। 'বঙ্গবাসী'র ৺বিহারীলাল সরকার ওরূপ 'ব্যাচোরকো

(১) পুস্তকাকারে প্রকাশকালে ইঁহারা পরলোকগত।

বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্ম্মহাভুজঃ' না হইলেও দাড়ীর ভারে কায হাসিল করিয়া গিয়াছেন। 'সঞ্জীবনী'র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমা'র মিত্রের নাম 'নরাণাং শ্মশুরক্রমঃ'-হিসাবে একবার গ্রহণ করিয়াছি। 'নব্যভারতে'র ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর নাম এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। 'প্রবাসীর' শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লম্বমান দাড়ী 'প্রবাসী'র প্রচারের পরিমাণের পরিমাপক। চারুচন্দ্রও এককালে দাড়ীধারী ছিলেন। 'সন্দেশে'র সরবরাহকার ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর স্মৃতি এই প্রসঙ্গে উজ্জীবিত হয়। 'বসুমতী'র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রপ্রসাদ, তথা বর্ষীয়ান্ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবুকে ভুলিলে প্রত্য-বায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

নিজে শিক্ষাব্যবসায়ী হইয়া শিক্ষা-বিভাগের দিকে না চাহিলে ঠিকে-ভুল হইবে। সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—দেশ-মাতৃকার সুসন্তান সদা সমাজহিতরত চিরকুমারব্রত উৎসাহে চিরযৌবনধারী চিররুগ্ণ কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগী স্যার্-উপাধি-লাঞ্ছিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য—দীর্ঘ কর্ম্মকালের পর অবসরভোগী শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র রায় বাহাদুর। তিনি যখন ভক্তিপ্রেমায় গদ্‌গদ হইয়া দাড়ী নাড়িয়া কীর্ত্তন-অঙ্গ ধরেন, তখন বাস্তবিকই তাঁহাকে বাবাজী বাবাজী বলিয়া ভ্রম হয়। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'-সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সুদীর্ঘ শ্মশ্রু পরমহংসদেবের ভক্ত শিষ্যেরই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। ডক্‌টর্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডক্‌টর্ হীরালাল হালদার, প্রিন্সিপ্যাল্ ক্ষুদিরাম বসু—এই দার্শনিক-ত্রয়ের আনাভিপ্রসারী দাড়ীর দৈর্ঘ্য তাঁহাদিগের দার্শনিকতার গভীরতার সমান অনুপাতে। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,* শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায়,* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোরাজ—এই ত্রিমূর্ত্তির লম্বা দাড়ী প্রথম বাঙ্গালী র‍্যাংলার্ (wrangler) ৺আনন্দমোহন বসুর ন্যায় প্রগাঢ় গণিতজ্ঞানের

(*) পুস্তকাকারে প্রকাশকালে উভয়েই পরলোকগত।

সাক্ষ্যদান করে। দাদার দেখাদেখি শ্রীমান্ মুক্তিদারঞ্জনও ঐ পথের পথিক। ফলতঃ খোদ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে যদিও গোঁফদাড়ী মায় মাথার আধাআধি পর্য্যন্ত কামাইতেন, তথাপি তাঁহার কলেজের আবহাওয়া দাড়ী-গজানর পক্ষে খুবই অনুকূল বলিয়া ধারণা হয়। সাক্ষী—শুধু একালের কেন, সেকালের প্রিন্সিপ্যাল্ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী (বিদ্যাসাগর-জামাতা) ও ব্যারিষ্টার্ মিঃ এন্ ঘোষ, উক্ত কলেজের বহুবৎসরের একনিষ্ঠ সেবক, পরে সেন্ট্র্যাল্ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু; এমন কি, সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক, আমাদের ছাত্রজীবনে ৺ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ীকে ও পরে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পর্য্যন্ত ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। পক্ষান্তরে, সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল্ ৺ উমেশচন্দ্র দত্তের গুম্ফশ্মশ্রুর অভাব ও বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল্ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্রের শ্মশ্রুর অভাব ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল্ চট্টোরাজ মহোদয় মায় সুদ পূরণ করিয়াছেন।

রীপন্ কলেজের (লর্ড রীপনের দাড়ী ছিল) খোদ মালিক (?) সুরেন্দ্রনাথের দাড়ীর কথা পূর্ব্বেই প্রসঙ্গান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অমৃত বাবুর অ-মৃত অবস্থায় মুখমণ্ডল শ্মশ্রুশোভিত ছিল—তিনি রীপন্ তথা সুরেন্দ্রনাথের মান রাখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল্-পরম্পরায় ও পাট নাই, মাতব্বর প্রোফেসার্-মহলেও উহার রেওয়াজ নাই। সেকালের কৃষ্ণকমল বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, 'অভয়ের কথা'র প্রচারক ক্ষেত্রবাবু, সকলেই মুণ্ডিত-মুখমণ্ডল। এটা খোদ সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র প্রতিরোধ না কি?

দুঃখের সহিত বলিতে হয়, আমাদের কলেজে শ্রদ্ধাস্পদ প্রিন্সিপ্যাল্ মহাশয় যে 'example set' করিয়াছেন তাহা সাঙ্ঘাতিক। শাস্ত্রে বলে

'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥'

দাড়ীর তো কথাই নাই, ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে তিনি নির্ব্বেদ-বশতঃ গোঁফ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। 'সাবধানের বিনাশ নাই'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান লেখক তাঁহার পদাঙ্ক (ক্ষুরাঙ্ক বলিলে উৎকট শ্লেষের মত শুনায়) অনুসরণ করিয়াছেন—পাছে শারীরিক অপটুতার অজুহাতে চাকরী যায়।[৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ভাইস্‌দিগের মধ্যে কেহ দাড়ীধারী ছিলেন না, ইহা অনেকের পক্ষে একটা আপশোষের বিষয় ছিল (অর্থাৎ দাড়ীধারী ডিগ্রীধারীদিগের একটা grievance ছিল)। সদাশয় লর্ড লিটন্ সে আপশোষ দূর করিয়াছেন। তবে মাননীয় বসুজা মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়বাহুল্যের পরিবর্ত্তে ব্যয়-সঙ্কোচে অবহিত হইবেন, তাহারই অসন্দিগ্ধ প্রমাণ—নিজের দাড়ী পর্য্যন্ত কাঁচি চালাইয়া কাটাছাঁটা, কেয়ারি করা![৮] (আচ্ছা, স্যার্ আশুতোষ সরস্বতীর দাড়ী থাকিলে কিরূপ মানাইত? ওঃ হরি, আমারই যে বিসমোল্লায় গলদ। সিংহের কেসর থাকে, 'বেঙ্গল টাইগারে'র কেসর থাকে না, থাকে বিপুল গুম্ফ ও প্রখর নখরদশন, তাহার আঘাতে ব্রিটিশ্-সিংহ পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত!)

---

(৭) এই প্রবন্ধ বঙ্গবাসী কলেজ্ ইউনিয়নের (৪ঠা অক্টোবরের) অধিবেশনে লেখক-কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। সাধারণের নিকট নীরস বিবেচিত হইবে বলিয়া উক্ত কলেজের ২।৪ জন অধ্যাপকের নাম মুদ্রণকালে পরিত্যক্ত হইল।

(৮) বসু মহাশয় এক্ষণে পরলোকগত। অধুনা আবার শ্মশ্রুহীন বাঙ্গালী উক্ত আসনে আসীন। দাড়ীধারী ডিগ্রীধারীদিগের সুখের স্বপন অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। (পুস্তকাকারে প্রকাশকালের টিপ্পনী।)

'তেরোস্পর্শ'

(বড়দিনের সওগাত)

('মাসিক বসুমতী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)

[কাশীতে এবার যেমন প্রচণ্ড গরম, তেমনই (reaction) প্রতিক্রিয়া-হিসাবে পচা বর্ষা, তেমনই প্রবল বন্যা ; গঙ্গার জলবৃদ্ধির জন্য 'ইন্দ্রদমন', 'পুষ্কর' ও 'কুরুক্ষেত্র' কাণ্ড ; বর্ষা, বন্যা ও পূর্ব্বগামী গ্রীষ্মের প্রকোপে ডেঙ্গু, উদরাময় ও ফোড়া ('গরমি-গোটা' heat-boils or mango-boils) ; লেখক নিজে এ তিনে তো ভুগিয়াছেন, আবার গ্রীষ্ম, কুইনিন্ ও পশ্চিম-মুখো ঘরে বাস, এই ত্রিতাপও সহিয়াছেন ; সর্ব্বত্র এই তিনের প্রভাব অনুভব করিয়া প্রবল রোগযন্ত্রণার মধ্যে 'তেরোস্পর্শে'র খেয়াল মাথায় চাপিয়াছে। পূজার বাজারে পাঠকদিগকে নবরত্ন উপহার দিয়াছি ; এটি দশম রত্ন, বড়দিনের সওগাতের জন্য রাখিয়াছি—কেননা, এটি দমে ভারী, নয়টির বোঝার উপর শাক-আঁটিটা হিসাবে চড়ান চলিত না। তা, নবরত্নের উপর দশমে দোষ কি ? 'অধিকন্তু ন দোষায়'—বিশেষতঃ রত্নের বেলায় ! দশম রত্ন দরে চড়া। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের কালে জন্ম হইলে 'দশম রত্ন' হইতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন।—ইতি মুখবন্ধ।]

তিন তিথি একদিনে পড়িলে পঞ্জিকাকার তাহাকে বলেন 'ত্র্যহস্পর্শ।' সে দিনে যাত্রা নাস্তি, শুভকর্ম্মও নিষিদ্ধ। 'বিবাহ-যাত্রা-শুভ-পুষ্টিকর্ম্ম সর্ব্বং ন কার্য্যং ত্রিদিনস্পৃশে তু।'[১] (অবশ্য, নিত্যকর্ম্ম, সন্ধ্যাহ্নিক,

---

(১) পঞ্জিকায় আর একটি সদৃশ শব্দ আছে—'ত্রিস্পৃশা'—একাদশী-বিশেষ। তিন তিথি একাদশীর দিনে পড়িলে 'হরিভক্তিবিলাস'-মতে তাহাকে বলে 'ত্রিস্পৃশা।'

পূজা-জপ, যাগ-হোম, আহার-নির্হার, নিষিদ্ধ নহে। সে দিনে মা-বাপের শ্রাদ্ধ পড়িলে তাহাও স্থগিত থাকিবে না ; আর সে দিনে মড়া মরিলেও তাহাকে 'বাসিমড়া' করিয়া রাখা চলিবে না।) ইহা শনির শেষ ও বৃহস্পতির শেষ অপেক্ষাও সাঙ্ঘাতিক, কেননা, শুধু একবেলা আধবেলার ওয়াস্তা নহে, সমস্ত দিনটা ধরিয়াই দোষাশ্রিত। অশ্লেষা-মঘা দুই ভগিনীই কেবল ইহার সমান খুঁটের। ডি, এল্ রায় 'বিষ্যুৎবারের বারবেলা'র গান বাঁধিলেন, ত্র্যহস্পর্শের বেলায় বাঁধিলেন না কেন? বোধ হয়, 'দুর্জ্জনকে দূর হ'তে করি পরিহার' এই নীতি অবলম্বন করিয়া 'ত্র্যহস্পর্শ'কে ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই। বেপরোয়া বিলাত-ফেরতাও যাহাকে ডরান, সে বড় সহজ পাত্র নহে। (শনির শেষও ভয়াবহ; গজানন, নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ পর্য্যন্ত রবিনন্দনের হাতে নাকাল হইয়াছেন। তাই পূর্ব্বোক্ত কবি 'বিষ্যুৎবারের বারবেলা'র মত শনিবারের বারবেলা লইয়া 'উচ্চবাচ্য' করেন নাই।)

কিন্তু আবার বাঙ্গালা 'তেরোস্পর্শ' দেবভাষার 'ত্র্যহস্পর্শ' অপেক্ষাও ব্যাপক ব্যাপার। ইহা শুধু কালবাচক নহে। পল্লীসমাজে দলাদলির ঘোঁটে, বা হাল চাল, মামলার সলা-পরামর্শে, তিন মাথা একত্র হইলে, আর দশজনে গা-টেপাটিপি করে, 'এই রে তেরোস্পর্শ যুটেছে।' বস্তুতঃ 'তিন' সংখ্যাই যেন আতঙ্কের বস্তু। [মানুষ দুইএর সঙ্গে আজন্ম নিবিড়ভাবে পরিচিত, যেহেতু, তাহার দুই কাণ, দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র, দুই হাত, দুই পা (দুই নৌকায় নহে)। দুই উতরিয়া অজানা তিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তাই কি আতঙ্ক?]

এইবার তিনের ভয়ঙ্করত্বের প্রমাণ দিই।

নারায়ণ বামন-অবতারে বলি-রাজার নিকট ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়াই বিভ্রাট্ ঘটাইয়াছিলেন। আবার কৃষ্ণ-অবতারে ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি ধরিয়াই

গোপীর কুল মজাইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে পরশুরাম-অবতারে তিনবার নহে, ৩×৭=২১ বার (ত্রিসপ্তকৃত্বঃ), পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। ত্রিলোচনের ত্রিশূলাস্ফালন সংহারের সূচনা করে। ত্রিপুরাসুর, ত্রিজটা রাক্ষসী, ত্রিশিখ-ত্রিশিরাঃ ইত্যাদি রাক্ষসের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ সঙ্কট-সঙ্কুল। মেনকার মাতৃ-হৃদয়ে তিন দিনের আনন্দ সুখের বটে, কিন্তু তাহার পরেই যে 'সুখস্যানন্তরং দুঃখম্', 'হরিষে বিষাদ', 'যত হাসি তত কান্না', ইহা প্রণিধান করিবেন। পুত্র অবর্ত্তমানে তেরাত্তিরের শ্রাদ্ধ—সুতরাং ইহাও সুখের বিষয় নহে। ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধও নিতান্ত অপার্য্যমাণে। তিন ব্রাহ্মণে যাত্রা নিষিদ্ধ, (সঙ্গে এক শূদ্র থাকিলে তো সোণায় সোহাগা)। ত্রিতাপজ্বালায় জনন-মরণ-শীল জীব জরজর। 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে',—মানুষের হাত নহে। 'তিন সত্য', বা তামা-তুলসী-গঙ্গাজল, এই তিন পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শপথ, মা-কালীর দিব্য, গুরুর দিব্য প্রভৃতি কঠিন কঠিন শপথ অপেক্ষা বেশী (binding) জোরালো নহে কি ?

সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণে তিন লিঙ্গ প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা ঘটায়। পাটীগণিতের ত্রৈরাশিক ও জ্যামিতির ত্রিভুজও এ পক্ষে বড় কম যান না। ত্রিকোণমিতির ত্রিভুজের ব্যাপার (solution of triangles) আরও জটিল। 'তিন নয় তিন ছয় তিন আঠারো কত হয় ? [২]' পাটীগণিতের এই বরযাত্রী-ঠকান প্রশ্নও স্মরণীয়। সংখ্যাতত্ত্বে তিনের দোষ কাটাইবার জন্যই বোধ হয় 'রাম দুই সাড়ে তিন' আবৃত্তির প্রথা। জ্বর ত্রিদোষজ হইলে বাঁকিয়া বসে। তেকাঁটা বা তেশিরা মনসা-সিজুর কাঁটার বড় জ্বালা। তেপান্তর (ত্রিপ্রান্তর ?) মাঠে পড়িলে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটে। তেতালার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। টিমে-

(২) উত্তর—এক কম এক শ অর্থাৎ ৯৯।

তেতালা গায়িতে ও বাজাইতেও নাকি বেশ একটু বেগ পাইতে হয়। তিন মেয়ের পর ছেলে, বা তিন ছেলের পর মেয়ে হওয়া অলক্ষণ, মেয়ে-মহলে এইরূপ সংস্কার। তাই 'শৈল' (সৈল=সহিল) নাম রাখিয়া দোষ কাটানর প্রথা আছে। নিশির ডাকের তিন ডাকের পরে বিপদ্ থাকে না। তিন কুলে কেহ না থাকা, তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকা, ত্রিভুবন শূন্য দেখা, ত্রিশূন্যে অবস্থান, প্রবলের ত্রিসীমা মাড়ান, কোনটাই ভাল নহে। 'তেমাথা' পথে 'ঠ্যাকনা' করে, তেকাঠায় ঠেকা বড় দায়, 'তেএঁটে' মাথা সকলের চক্ষুঃশূল, 'তেথাকি' ভুঁড়ি বিদ্রূপের বস্তু। (ঈর্ষ্যারও নহে কি ?) তিন পিণ্ডে প্রেতাত্মা তৃপ্ত হয়, তিন ঝাঁটায় ভূত ছাড়ে, তিন চড়, বা তিন থাপ্পড়, বা তিন তাড়ায় বাঁকা লোক সিধা হয়, আর তিন ফুঁয়ে সোজা লোককে উড়াইয়া দেয়; 'তিন নয় তিন ছয়' করিয়া ফেলা লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ, 'তিন টপকায়' কায সারা ব্যস্তবাগীশের ধরণ, আর 'পুরাতন ভৃত্য'—

"একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে বাকী কোথা নাহি জানে।"

যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা। ওল কচু মান, তিনই সমান। বাদল বামুন বান, দক্ষিণে পেলে যান। শনির সাত মঙ্গলের তিন, আর সব দিন দিন। সবই তিনের ওড়ন-পাড়ন।

'তিন তাস' খেলা জুয়াখেলারই প্রকারভেদ। বার বার তিনবার নিষেধ (warning) রূপেই বেশী প্রচলিত। তিন তিন বার ফেল্ হইলে লজ্জায় মুখ দেখান যায় না। পক্ষান্তরে, তিন তিনটা পাশ্ (অর্থাৎ বিএ পাশ্) বেটার বিয়ে দিয়ে বরের মায়ের দেমাক দেখে কে ?

এই 'ত্রির' সঙ্গে শব্দ-সাদৃশ্য থাকাতেই বোধ হয় 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী', 'স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ', আর

এই সবের জন্যই শাস্ত্রে বলে, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' ('স্ত্রীভাগ্যে পুরুষের ধন,' 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি,' 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু,' 'স্ত্রিয়োদেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্,' এগুলি বোধ হয় 'উপচার-পদ', স্ত্রীজাতির মন ভুলানর জন্য সৃষ্ট।)

আরও দেখুন, 'তিন শত্তুর' কাহাকেও দিতে নাই। (আমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মুখ-শুদ্ধির জন্য তিনটি পাণ বরাদ্দ দেখিয়া আমার একটি নবাগতা ছোট্ট ভাগ্নী বলিয়াছিল, "মামীমা, মামাবাবু কি তবে শত্তুর? তাঁকে তিনটি পাণ দেন যে!") 'এই তিন শত্তুর' ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই কি দেশীয় কলেজের কর্ত্তারা, অল্প বেতনে দরিদ্র ছাত্রের উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তয়িতা উদারচেতাঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট ছাত্র-বেতন তিন টাকার জায়গায় ৪৲ টাকা করিয়াছিলেন? এবং বৎসর বৎসর ব্রহ্মোত্তরের বেড়া বদলাইয়া জমী-বৃদ্ধির ন্যায়, প্রতি বৎসরই এক টাকা এক টাকা করিয়া বাড়াইতেছেন? ক্রমে টিকিট্ পোষ্ট্-কার্ডের মূল্যের ন্যায় ডবল্ করিয়া তুলিয়াছেন, তবুও নিবৃত্তি নাই। সরকারের উপরও এক কাটি! জানি না, ইহার শেষ কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয়, বেতনের হার যত উচ্চ হইতেছে, গজকচ্ছপের শরীর-বৃদ্ধির ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজ্‌গুলির ছাত্রসংখ্যাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে।

আবার দেখুন, গোলদীঘি লালদীঘি হেদুয়ার মত 'তিনকোণা তলাও' (Wellesley Square) এই তিনের ফেরে পড়িয়া (অনুপ্রাস-সত্ত্বেও) লোকপ্রিয় (popular) হইতে পারিল না। এই কারণে সাহিত্যক্ষেত্রে ত্রৈমাসিকেরও অনাদর। ঐ একই কারণে দুই জনে বিন্তী-খেলার ও চারি জনে গ্রাবু প্রভৃতি খেলার যেমন রেওয়াজ, তিন জনে ডাক্-বুরুজ খেলার তেমন রেওয়াজ নাই। থ্রী-কাস্‌ল্ সিগারেট ভারতের মুখ-অগ্নির ব্যবস্থা করিয়া বিলাতের পেটের জ্বালা শীতল

করিতেছে। বাইসিক্লে চড়া শক্ত কায, তাই বালকের অবলম্ব ট্রাইসিক্ল্ ত্রিচক্রযান। ধনে মানে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইলে 'ত্রিবেদী' ঠাকুর সকলের শ্রদ্ধাভাজন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যখন বুদ্ধিবিদ্যা-ব্রহ্মণ্যের বদলে কেবল লাঠি-লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া দরওয়ানী করিতে আসেন, তখন তিনি দ্বিবেদী চতুর্ব্বেদীর মত সোজাসুজি দোবে চোবে হন না, বাঁকিয়া বসিয়া 'তেওয়ারি' হইয়া 'তেরিমেরি' করেন!

আবার পূরণেও 'তিন' কম সাঙ্ঘাতিক নহেন। বিরূপাক্ষের তৃতীয় চক্ষুই মদনভস্ম করিয়াছিল, বামনের তৃতীয় চরণই বলির বিপত্তি বাধাইয়াছিল; 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ'ও এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য। গুণের মধ্যে তমোগুণ তৃতীয়, সুতরাং 'বিদ্যার বিদ্যা'র ন্যায় 'গুণ হ'য়ে দোষ হ'ল'। ৩নং রেগুলেশান্ যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার, তাহা আবার নূতন করিয়া সন ১৩৩০ সালে মালুম হইতেছে। নীলামের তৃতীয় ঘায়ে কা'রও সর্ব্বনাশ, কা'রও পৌষ মাস। তৃতীয় পক্ষে বিবাহ অলক্ষণ বলিয়া আগে ফুলগাছের সঙ্গে সাতপাক ঘুরাইয়া লইয়া পরে তৃতীয় পক্ষকে চতুর্থ পক্ষ বলিয়া চালান হয়। তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীর আরোহীর দুর্গতির সীমা নাই, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রকে ভর্ত্তি করিতে বহু কলেজ্ নারাজ, এমন কি, তৃতীয় শ্রেণীতে এম্, এ পাশ্ হইলে কলেজে চাকরী পাওয়া দুর্ঘট; third-rate intellect বলিয়াই যেন ইঁহাদিগকে ধরিয়া লওয়া হয়। (ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই জাত্-ব্যবসার কথায় আসিয়া পড়িলাম—talking shop!)

তিনের অন্ত নাই। ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিগণ বা ত্রিবর্গ, সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণ, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক ত্রিতাপ, 'মনোবুদ্ধিরহঙ্কারঃ' ত্রিতত্ত্ব, ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না তিন নাড়ী, বায়ু পিত্ত কফ দেহের তিন

ধাতু, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত-ভেদে বৈদিক উচ্চারণ, হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত স্বর-বর্ণের তিন প্রকার উচ্চারণ, উদারা মুদারা তারা গানের তিন গ্রাম, তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্য, দৈর্ঘ্য প্রস্থবেধ, 'বোধোদয়ে' তিন প্রকার পদার্থ, পদার্থের কঠিন জলীয় বাষ্পীয় তিন প্রকার অবস্থা, চর্ব্বচূষ্যলেহ্য তিন প্রকার খাদ্য (পেয় স্বতন্ত্র), তিন প্রকার ভগ্নাংশ, তিন মাসে কোয়ার্টার্ ও ইংরেজী ঋতু (4 seasons), টাকা আনা পাই, তেল লুণ লকড়ি, জমাখরচ বা জমা ওয়াশিল বাকী, বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড়, ইংল্যাণ্ড্ স্কট্‌ল্যাণ্ড্ আয়ার্ল্যাণ্ড্, (tricolor flag), আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, এং বেং চেং, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোক, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল—সর্ব্বত্রই তিন বর্ত্তমান। এত তিনের মধ্যে কোন কোন স্থলে গোলেমালে তিন ভালও হইয়া গিয়াছে। যথা, পতিতপাবনী সুরধুনী, ত্রিমার্গগা, ত্রিস্রোতা বা ত্রিধারা হইয়া, ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, 'ত্রিবেণী' যুক্ত বা মুক্ত, উভয় অবস্থায়ই মহামুক্তিদা, পরন্তু স্নানে পর্ব্ববিশেষে ত্রিকুল কেন, ত্রিকোটিকুল উদ্ধার করেন। গঙ্গা-অসি-বরণা-সঙ্গমে কাশী সকল তীর্থের রাণী। আর গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থরাজ। অক্ষয়-তৃতীয়ায় সত্যযুগোৎপত্তি, ত্রেতাযুগ, ভূর্ভুবঃস্বঃ, তিন প্রধান বেদ, তিন উচ্চবর্ণ (আর্য্য), সত্যং শিবং সুন্দরম্, স্বর্গবর্গে ত্রিদিব-ত্রিদশালয়ঃ, ত্রিবিষ্টপ বা ত্রিপিষ্টপ, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিবিক্রম, ত্র্যম্বক, ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন, ত্রিনয়না, ত্রিনাথ, ত্রিবিদ্যা বা ত্রয়ী, ত্রিসন্ধ্যা, ত্র্যক্ষর প্রণব, শৈবের ত্রিপত্র ও ত্রিপুণ্ড্র, বৈষ্ণবের ত্রিকণ্ঠী ও ত্রিভঙ্গমুরারি, গৌরনিতাই অদ্বৈতপ্রভু, নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব-সেবন, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, ক্ষীর সর নবনী, খড়া চূড়া পাঁচন-বাড়ী, শ্রীদাম সুদাম সুবল-সখা, ললিতা বিশাখা বৃন্দা সখী, গায়ত্রীদেবীর তিন মূর্ত্তি ধ্যান, তিন বার শ্রীবিষ্ণু উচ্চারণ-

পূর্ব্বক আচমন, তিন গণ্ডূষ গঙ্গাজলপান, তিন ফেরতায় এক দণ্ডী ও এইরূপ তিন দণ্ডী পৈতা, ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়, মনে বনে ও কোণে ধ্যান, তন্ মন্ ধন্, কায়মনোবাক্যে, ৩৩ বা ৩৩ কোটি দেবতা, ত্রৈলঙ্গস্বামী,—এমন কি, বৌদ্ধের ত্রিরত্ন, ত্রিপিটক, খৃষ্টানের Trinity, আদি সাধারণ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রিধারা, সঞ্জীবনীর মটো স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী, এমন কি, হিংটিং ছট্ পর্য্যন্ত—পরম পবিত্র। ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের 'নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে'। 'সর্ব্বসিদ্ধেস্ত্রয়োদশী' যাত্রিক দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বেজায় মিষ্ট হইলেও ত্রিমধু ব্রাহ্মণের পাতে বেশ সাজে, তেহাই দিলে গীত-বাদ্য খুব মজে, আর বাঁয়াতবলা ডুগ্‌ডুগী ঢোলকের চাঁটার কর্ণ-বধিরকারী শব্দের তুলনায় ত্রিতন্ত্রীর (সেতারের) ঝঙ্কার বড় মধুর বাজে। নারীদেহে ত্রিবলি-রেখায় চক্ষুঃ জুড়ায়, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে একঘেয়ে পয়ারের পর ত্রিপদীচ্ছন্দে কর্ণ জুড়ায়, 'তেমাথার' পরামর্শে হৃদয় জুড়ায়। বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের (৩×৩=৯) আদর, বাঙ্গালা স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পাশের কদর, গ্রহদোষ-খণ্ডনে ত্রিলৌহের ও ত্রিরত্নের তথা নবরত্নের[৩] এবং রোগ-প্রশমনে ত্রিকটু ও ত্রিফলার অসামান্য গুণ। দুঃখের বিষয়, ত্রিফলার জলেও রোগশয্যাশায়ী লেখকের উপকার হইতেছে না। অতএব এইখানেই 'তেরোস্পর্শ'কে পরিহার; পাঠক তো পরিত্রাণ পাইলেন, লেখকের ললাটলিপিতে যাহাই লিখিত থাকুক না কেন! [৪] [Three cheers ! Hip hip, hurrah !]

---

(৩) লেখক এই জন্য অঙ্গুরীয়ে ত্রিলৌহ ও ত্রিরত্ন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও নবরত্ন-ধারণেরও পরামর্শ পাইয়াছেন।

(৪) এই উদাহরণমালা-পরিবর্দ্ধনে এবং অন্যান্য প্রবন্ধ-সংশোধনে শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ 'কাশীর কিঞ্চিৎ'-কার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। (পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।)

রোগশয্যার খেয়াল

২য় কিস্তি

(পৌষ-পার্ব্বণের তত্ব)

('মাসিক বসুমতী', পৌষ ১৩৩০)

'Misery makes sport to mock itself.'—SHAKESPEARE.

[পূজার তত্ত্বে পাঠকবর্গকে নবরত্ন উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পৌষের তত্ত্বে ত্রিরত্ন উপঢৌকন দিতেছি! 'তেরোস্পর্শে'র জের ত্রিরত্নই তো সঙ্গত। এক ডজন পূর্ণ হইল। 'তেরোস্পর্শ' (বড়দিনের সওগাত) লইয়া তের রত্ন হইলে এক ডজনকে baker's dozen মনে করিলেই হিসাবের গোল চুকিয়া যাইবে। (লেখকেরও তো এখন 'বেকার' অবস্থা!) রত্নসংখ্যা তের হওয়াতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই; এই তো সে দিন (কার্ত্তিকের) 'মাসিক বসুমতী'তে একুশ রত্নের সন্ধান পাইলাম। ফলতঃ তিন বা নয়ে রত্ন ফুরাইবার কথা নহে। কেন না, বসুমতী অনন্ত-রত্নপ্রসবিনী!]

১। কাশী না কাঁসি?

অন্য অন্য বার কাশীবাস করিতে আসিয়া কাশী চায করিয়া ফেলি। (শুনিয়াছি, উদ্ভট বচনও আছে, 'কাশীতে হণ্টনং কুর্য্যাৎ।' এই হাঁটার চোটেই অর্থাৎ 'নিত্যযাত্রা'র ফলেই কাশীর বুড়াবুড়ীদের মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ুঃ।) দশাশ্বমেধ-কেদার ঘাটে বৈকালিক বিচরণ তো ঘটেই, বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা-ঢুণ্ঢিরাজ-শনৈশ্চর-সাক্ষিবিনায়ক এই পঞ্চদেবতার 'প্রাতরেব ইষ্টদর্শনম্' তো বটেই। ইহা ছাড়া আজ দশাশ্বমেধ-ঘাট

শীতলা-ঘাট হইতে ঘাটে ঘাটে অসি-সঙ্গম; কা'ল মণিকর্ণিকা-ঘাট হইতে ঘাটে ঘাটে পঞ্চগঙ্গা-ঘাট (বরুণা-সঙ্গম পর্য্যন্ত ঘাটে ঘাটে হাঁটা ঘটে নাই); পরশু অসি-সঙ্গমে নৃসিংহ-জগন্নাথ-দর্শন; 'তরশু' বরুণাসঙ্গমে আদিকেশব-খড়্গা-বিনায়ক-দর্শন; কোনও দিন পঞ্চগঙ্গা-ঘাটে বিন্দুমাধব-দর্শন (ধ্বজারোহণে কখনও সাহস হয় নাই); কোনও দিন গোপাল-মন্দিরে গোপালবিগ্রহ ও তাঁহার বহুমূল্য আসবাব-দর্শন; কোনও দিন দুর্গা-বাড়ী মেনকার বাড়ী; গুরুধাম, আনন্দবাগ, সঙ্কটমোচন; কোনও দিন অদ্বৈত-আশ্রম, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, শান্তিকুঞ্জ, জ্ঞানগেহ, হিন্দুকলেজ্ হইয়া কামাখ্যা-বটুকনাথ-পশুপতিনাথ-বৈদ্যনাথ-শঙ্কর-মঠ-দর্শনান্তে 'গৈবী' পর্য্যন্ত 'ধাওয়া' করা; কোনও দিন নাদেশ্বর-প্রাসাদ ও কুইন্‌স্ কলেজ্; কোনও দিন 'রথতলা' ছাড়াইয়া বহু দূরে রাজা মোতিচাঁদের বাগান, কোনও দিন এক্কারোহণে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়-পরিদর্শন, ইত্যাদি। ফলতঃ, ঘূরণচক্রের বিরাম থাকে না।

আর এবার কাশীবাস কাশীগ্রাস হইয়াছে (যেমন রাহুগ্রাস কালগ্রাস)। শয়ন-কক্ষের কুক্ষি, রোগশয্যারূপ পূতনার ক্রোড় আমাকে গ্রাস করিয়াছে; 'যাত্রা'য় বাহির হওয়া দূরে থাকুক, বিছানা হইতে পা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ানও অসাধ্য হইয়াছে। নারায়ণের অনন্ত-শয্যা বা ভীষ্মের শরশয্যা বলিলে ছোট মুখে বড় কথা বলা হয়, (blasphemy) দেব বা দেবকল্প মানবের অবমাননা করা হয়, তাই সে তুলনার কথা তুলিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। নারায়ণের যোগনিদ্রা, আর আমার রোগনিদ্রা, না, না, রোগতন্দ্রা; অসহ্য যন্ত্রণার পর মধ্যে মধ্যে অবসাদ-বশতঃ ঝিমুনি আসে; যেমন চোরের রাত্রিবাসই লাভ, তেমনি আতুরের ঐ কাকনিদ্রা-টুকুই (dog-sleep) লাভ। ভীষ্মদেব শর-শয্যায় পড়িয়া কত জ্ঞান-উপদেশ দিয়াছিলেন, কত

তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন—আর আমি 'খেয়াল' ধরিয়াছি (ধ্রুপদ যে এই ক্ষুদ্র শক্তির অতীত), চুট্‌কী-চটক চালাইয়া পাঠকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছি—অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য রোগযন্ত্রণা ভুলিতেছি। গুপ্ত-কবির পাঁঠা যেমন 'আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে', তেমনি আমিও নিজের দুর্দ্দশা লইয়া নিজেই রঙ্গ করিতেছি। (এবারকার উপমাটা বোধ হয় লাগসই হইল!) শেক্‌স্‌পীয়ারের কথাটা বড় পাকা—'Misery makes sport to mock itself.'

এবার কাশীবাস রাহুগ্রাসই বটে। বাস্তবিক, জ্যোতিষীরাও বলিয়াছেন, রাহু আমার প্রতি বিরূপ; 'ক্রূর' কেতুও রাহুর শানাইয়ের সঙ্গে পোঁ ধরিয়াছেন, ইনি যে 'জয়কেতে!' ইহার উপর কুজের কুঁজরোমিও আছে, স্বয়ং মঙ্গল অমঙ্গল ঘটাইতেছেন। ('হা শম্ভু, তুমিও বাম!' 'Thou too, Brutus!') আবার সুরগুরু বৃহস্পতি ও অসুরগুরু শুক্র 'বক্র' হইয়া অর্থাৎ বাঁকিয়া বসিয়া ম্লেচ্ছভাষার 'গুরু মহাশয়' এ অধীনের ঘরশত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; 'অন্যে পরে কা কথা' অপিচ, চন্দ্র. নিজে রাহুগ্রাসের যন্ত্রণা জানিয়াও আমাকে এই রোগগ্রাসে ফেলিয়াছেন। আর সবের সেরা, শনির দৃষ্টিও এই আতুরের উপর পড়িয়াছে। শনি যে-সে নহেন, 'যমাগ্রজ,' সুতরাং তাঁহার প্রতাপ যম-যন্ত্রণার উপরও এক কাঠি উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? অথচ জ্যোতিঃশাস্ত্রে নাকি লেখে, শনি ক্লীবগ্রহ। ক্লীবের এই দাপট তুরকী অন্তঃপুরের (Turkish harem) খোজা প্রহরীদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ফলতঃ এতগুলি গ্রহের ফেরে পড়িয়া আমার দশা দাঁড়াইয়াছে—সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত। তাই এবার কাশীবাস আর 'সুখের প্রবাস'[১] নহে, দুঃখের আবাস। কাশীবাস কাশীত্রাস হইয়া পড়িয়াছে।

(১) লেখকের 'ফোয়ারা'র উক্ত-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রহ্লাদের যেমন কৃষ্ণনামের আদ্যক্ষর 'ক অক্ষর' শুনিয়া অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত, তেমনি এই অধমের কাশীধামের আদ্যক্ষর 'ক অক্ষর' শুনিয়া পুলকসঞ্চার হইত। কিন্তু এবার পুলকের পরিবর্ত্তে আতঙ্কের আবির্ভাব হইতেছে (যেমন জলাতঙ্ক!)। 'যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'—এই তো চিরদিন জানিতাম। কিন্তু আমার এবার কাশীতে গতি গতিকে অনন্ত দুর্গতি হইয়া দাঁড়াইল। অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে 'গতি' হইলে [২] তো সদ্গতি অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্তিই হইত; কিন্তু পাপীর ভাগ্যে এমন সদ্গতি মিলিবে কেন? তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, কাশী না ফাঁসি?

২। কাশীতে অগস্ত্যযাত্রা

অগস্ত্য কাশী হইতে অগস্ত্যযাত্রা করিয়াছিলেন, আর আমার কাশীতে অগস্ত্যযাত্রা হইয়াছে। শুভ বৈশাখের পঞ্চম দিবসে এখানে পৌছিয়াছি; আর শ্রাবণ শেষ হইতে চলিল, স্থাণুবৎ অচল হইয়া এখানে আছি। পাকা চারি মাস না হইলেও কাঁচি তো বটে। কাঁচিই বা বলি কেন?

(২) শুনিয়াছি, লেখকের কাশীপ্রাপ্তির গুজবও কলিকাতায় রটিয়াছিল। মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটিলে নাকি আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। তাই বুঝি মৃত্যুঞ্জয় জীবনের পাট্টা নূতন করিয়া (fresh lease of life) দিয়াছেন। (মহামৃত্যুঞ্জয়-কবচ-ধারণের ফলেও এরূপ ঘটিতে পারে।) তা' যেরূপ ভুগিয়াছি, অন্য লোক হইলে টিকিত না, যাই কাঠপ্রাণ তাই মরি নাই। 'ভাগ্যে ভাগ্যে রহল পরাণ।' মরিব কেন? মরিলে তো সকল যন্ত্রণা ফুরায়। 'দুঃখ-সংবেদনায়ৈব ময়ি চৈতন্যমাহিতম্।' 'জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা।' 'চিরজীবী করিল গোঁসাই।' সে দিন একটি বৈজ্ঞানিক মত দেখিলাম, স্থূলকায় লোক অল্পায়ুঃ হয়। চক্রী এই চিরদুঃখীকে দীর্ঘজীবী করিবার অভিপ্রায়েই সম্প্রতি কৃশকায় করিয়া দিয়াছেন। 'প্রভু বিষম দয়ালু', 'Great are thy tender mercies, O Lord!'

মাসগুলা তো সবই আষাঢ়াস্ত দিনের মত দীর্ঘ, ৩১।৩২ দিনের পাকি ওজনের, কোনটাই সোজাসুজি ৩০ দিনের নহে, কাঁচি ২৮।২৯ দিনের তো নহেই। পৌছানর পরদিন অক্ষয়তৃতীয়া ছিল, সে দিন নাকি সত্যযুগোৎপত্তি। কিন্তু আমার কপালে কলির প্রকোপে সত্যযুগের সুখভোগের পরিবর্ত্তে দুঃখভোগই ঘটিল। কোথায় কাশী-কোতোয়াল কালভৈরব কাশীর উৎপাতগুলাকে (undesirables) ঝাঁটাইয়া কাশী হইতে তাড়ায়, গঙ্গাপার করিয়া দিয়া তবে ছাড়ে, আর আমাকে দেখিতেছি ধরিয়া বাঁধিয়া মারিতেছে। পড়িয়া পড়িয়া মা'র খাইতেছি, চোরের মা'র হজম করিতেছি, নিদারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এ যেন নাগপাশে বন্ধন, বত্রিশ বন্ধনে বত্রিশ নাড়ী টন্‌টন্‌ করিতেছে। ক্রূর গ্রহের এমনি নিগ্রহ, অবিরত কেবলই পাক দিয়া বিপাকে ফেলিতেছে। যখনই যাইবার দিন করিতেছি, তখনই একটা না একটা বিঘ্ন ঘটাইয়া দিনটাকে পণ্ড করিতেছে। আর যাত্রিক দিনগুলাও কি লম্বা লম্বা অন্তরে—২৯।৩০ আষাঢ়, ১২।১৩।১৪ শ্রাবণ, ২৩।২৫।২৯।৩১ শ্রাবণ। ইহাও গ্রহের ফের। নিজে যদি মন্দের ভাল হইলাম, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা একে একে শয্যাগত হইতে লাগিল—ফোড়া, ডেঙ্গু, আমাশয়। ফলে, যাত্রা বন্ধ।

বৎসরখানেকের মধ্যে স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিন স্থানে গেলাম—গত গ্রীষ্মের ছুটিতে পুরীতে—সেইখানেই রোগের সূত্রপাত করিয়া আসিলাম, পরন্তু পুত্র দুইটি বিষম টাইফয়েড্‌ জ্বরে আক্রান্ত হইল, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে লইয়া ফিরিলাম—ফিরিয়া কি কঠোর শাস্তি পাইলাম, তাহা বলিয়া আর পাঠকবর্গকে মনঃকষ্ট দিব না। তাহার পর, বড়দিনের বন্ধে বাঁকীপুর গেলাম, সেখানে একপক্ষকাল-বাসেই রক্ত-আমাশয় তো আবার চাগিলই, পরন্তু পা ফুলিল, 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ।' মানে মানে

'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতির অনুসরণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। তাল সামলাইতে মাস দুই গেল। একটু সুস্থ হইয়া শরীর সারার জন্য এবার গ্রীষ্মের ছুটি হইতেই কাশী ছুটিলাম। এই 'বার বার তিনবার' বায়ুপরিবর্ত্তনের চেষ্টার শেষবার ফল সব্‌সে আচ্ছা হইল, যথেষ্ট আক্কেল হইল, অর্থনাশ মনস্তাপ রোগভোগের চূড়ান্ত হইল। তাই এবার সঙ্কল্প করিয়াছি, যো-সো করিয়া একবার কলিকাতা ফিরিতে পারিলে আর নেড়া বেলতলায় যায় না, 'ন গঙ্গদত্তঃ পুনরেতি কূপম্।' [৩] কলিকাতার কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিয়া প্রাণবায়ু বাহির হইবার উপক্রম হইলেও আর বায়ুপরিবর্ত্তনে বাহির হইব না। ভরা ভাদর না পড়িতে পড়িতে ভাগ্যে ভাগ্যে ফিরিতে পারিলে বাঁচি। [৪]

৩। শম্বূকের দশা

স্কুলে পড়ুয়া-অবস্থায় তখনকার দিনে প্রচলিত বার্ণার্ড্ স্মিথের এরিথ্‌মেটিকে (চক্রবর্ত্তী চট্টরাজ গৌরীশঙ্কর বিপিন-গুপ্ত তখনও গোকুলে বাড়িতেছেন) snailএর অঙ্ক কষিতে অনেক বেগ পাইতে হইত। তাই এই অকাল-বার্দ্ধক্যে অঙ্কশাস্ত্রের প্রায় আর সব ভুলিয়াছি, কিন্তু উল্লিখিত অঙ্কটি বেশ মনে আছে। (Snail) শম্বূকের অদ্ভুত অভ্যাস—সে রোজ গাছে খানিক করিয়া উঠে, আবার খানিক করিয়া নামে; তবে যতটা উঠে, তা'র চেয়ে কম নামে। (এটা কিন্তু Gravitation অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের ঠিক উল্টা!) সুতরাং সে শেষে এক দিন গাছের আগায়

---

(৩) কাশী শিবের পুরী, আর শিবের বিশ্বমূলে বাস। বৃদ্ধকালেশ্বরের কূপের জলও রোগীর জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জ্ঞানবাপীও স্মর্ত্তব্য। ইতি 'অলঙ্কারেণ বক্তব্যানিঃ।'

(৪) পাঠকবর্গ আশ্বস্ত হউন, লেখক মহাশয় ভরা ভাদ্রের পূর্ব্বেই প্রাণে প্রাণে ঠিকানায় পৌঁছিয়াছেন।—সম্পাদক।

উঠিয়াছিল। অঙ্কের প্রশ্ন—এইরূপ উঠানামার হিড়িকে সে কত দিনে গাছের আগায় উঠিবে? (অবশ্য গাছের উচ্চতা ও উঠানামার হার অঙ্কে প্রদত্ত আছে।) অঙ্কটা কষিবার সময় বড় গোলযোগ ঠেকিত। সোজাসুজি বিয়োগ ও ভাগ করিয়া কষিয়া গেলে উত্তরটি বইএর সঙ্গে মিলিত না। কষিবার একটি সঙ্কেত মাষ্টার মহাশয় শিখাইয়াছিলেন—শম্বূক শেষ দিন নামিবে না, অতএব এক দিনের নামার পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই সঙ্কেতে কিন্তু আমার মাথা আরও গুলাইয়া যাইত। শম্বূক শেষ দিন নামে না কেন? তাহার চিরজীবনের অভ্যাস, তাহার জাতীয়-প্রকৃতিগত সংস্কার (instinct) বদলাইয়া যাইবে কেন? উচ্চে উঠিয়া পায়াভারী হইবে? 'নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য' মদগর্ব্বে আর মাটিতে পা দিবে না? আসল কথা, একবার গাছের আগায় পৌঁছিলে অঙ্কের সমাধান হইল, তাহার পর শামুক নামুক বা উঠুক, বাঁচুক বা মরুক, তাহার সহিত অঙ্কের আর কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু এ ভাবে মাষ্টার মহাশয় কথাটা কোনও দিন বুঝান নাই। (যাক্, আর গুরুনিন্দা করিব না। এই সব পাপেই তো রোগভোগ দুঃখকষ্ট পাইতেছি। আর পাপের ভরা বাড়াইব না।)

আমারও দশা ঠিক এই শম্বূকের মতই। এক দিন বলসঞ্চয় করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিতেছি, আবার পরদিন রোগে পড়িয়া বলক্ষয়ে শয্যাশায়ী হইতেছি। তবে সঞ্চয় বোধ হয় ক্ষয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, নতুবা খাড়া হইয়া উঠিতে, চলিতে ফিরিতে (যদিও টলিতে টলিতে) পারিতাম না। ঠিক শম্বূকের মতই উঠার হার পড়ার হার অপেক্ষা অল্প বেশী। অতি ধীরে ধীরে আরোগ্যের দিকে আগাইতেছি। 'শনৈঃ পন্থাঃ।' যথালাভ।

Snail, snail-slow হইলেও শেষটা গাছের আগায়, গন্তব্যস্থলে, goalএ, পৌঁছিয়াছিল। আমি কোনও দিন কলিকাতায় পৌঁছিব কি?

সশরীরে না হইলেও, মনে মনে কলিকাতার পথে খানিক করিয়া আগাইতেছি, আবার রোগে পড়িয়া ধপ্‌ করিয়া সে পথ হইতে পড়িয়া যাইতেছি। (পুনঃশম্বূক!) জানি না, কবে এ উঠানামার অন্ত হইবে? ৫ শম্বূক হয় তো গাছের আগায় উঠিয়া আবার নামিয়াছিল। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একবার ঠিকানায় পৌছিলে আর কখনও 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'—বিবাহের বরযাত্রী হইয়াও নহে, সাহিত্য-সম্মিলনের বর হইয়াও নহে। ৬

CALCUTTA · THE BAGBAZAR READING LIBRARY · ESTD. 1883

---
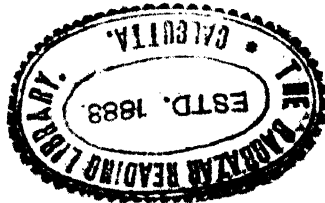
(৫) উঠানামার কথায় বৈজ্ঞানিক-বৃন্দ হয় তো একটা গলদ ধরিয়া বসিবেন আর তুলনাটিতে খুঁত কাড়িবেন—শম্বূক উঠে গাছের আগার দিকে, upএ, আর নামে গাছের গোড়ার দিকে, downএ; কিন্তু আমার কলিকাতার দিকে down journey, up journey নহে, যদিও uphill work বটে!

(৬) রোগের দাপটে প্রাণের আকুলতায় কাশী-বিশ্বেশ্বর-সম্বন্ধে অনেক কঠোর কথা বলিয়াছি। তাই বিশ্বনাথ বড় জব্দ করিয়াছেন। আবার কাশীবাসের পুনঃ পুনঃ আকাঙ্ক্ষা হইলেও আকাঙ্ক্ষা-পরিপূরণে ক্রমাগতই বাধা ঘটিয়াছে। যাহা হউক, এতদিনে তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন। দীর্ঘ চারি বৎসর পরে আবার কাশী আসিয়াছি। (পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।)

রোগের নিদান

('মাসিক বসুমতী,' মাঘ ১৩৩০)

তিন বৎসর পূর্ব্বে মাসাধিক কাল রোগভোগের অবসানে স্বাস্থ্য-লাভের স্ফূর্ত্তিতে নিতান্ত হাল্‌কাভাবে "ফোড়ার ফাঁড়া" (The carbuncle-crisis) নাম দিয়া পীড়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং বন্ধুসমাজে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ব্যাপারটাকে রঙ্গব্যঙ্গের বিষয়ে পরিণত করিয়াছিলাম। পাঠক-সাধারণের গোচর করিবার জন্য প্রবন্ধটি বঙ্গের বাহিরের একখানি অপ্রসিদ্ধনামা (অধুনালুপ্ত) মাসিক পত্রে [১] মুদ্রিত করাইয়াই ক্ষান্ত হই নাই, সেই অকিঞ্চিৎকর রচনাকে স্থায়িত্ব (?) দিবার চেষ্টায় গ্রন্থভুক্ত করিয়াছি, সাহিত্যের জমিনে শিকড় গাড়িয়া বসিবার আশায় 'পাগলা ঝোরা'র হাস্যরসধারায় অভিষিক্ত করিয়াছি। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, ইহা হাসি-মস্কারা, রঙ্গতামাসার জিনিশ নহে; আকাশে ধূমকেতুর উদয় যেমন নানারূপ আপদ্-বিপদের সূচনা করে বলিয়া প্রাকৃত-জনের ধারণা, তেমনই দেহে কার্ব্বঙ্ক্‌লের উদ্ভব ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যভঙ্গের পূর্ব্বলক্ষণ, অভিজ্ঞগণের নাকি এই অভিমত। ডাক্তারী শাস্ত্রে নাকি বলে, বহুদিন ধরিয়া বদহজম হইলে, mal-assimilation of food হইলে, তবে দেহে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। অতএব শরীরস্থ এই শত্রুকে লইয়া ফষ্টিনষ্টি করিয়া নিজের ও পাঠকের আমোদ-উপভোগের চেষ্টা না করিয়া যদি সাবধান হইবার এই ইঙ্গিত (warning) সময় থাকিতে গ্রাহ্য করিতাম, তখন হইতেই সংযতাহার হইতাম, তাহা হইলে আজ এমন অকালে 'জরারোগযুক্তঃ মহাক্ষীণদীনঃ বিপত্তৌ

(১) ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত 'প্রবাস-জ্যোতিঃ'।

প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ' হইয়া, physical & intellectual wreck হইয়া, সকল কাযের বাহির হইয়া, পড়িয়া থাকিতাম না।

এবারও কার্ব্বঙ্ক্‌ল্ করাল ধূমকেতুর ন্যায় পুচ্ছবিস্তার করিয়াছে—যদিও এবার ইহা মূলব্যাধি নহে, জ্বর অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতা বায়ুক্রূরতা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গরূপে, episode হিসাবে, বোঝার উপর শাক-আঁটিটা (?) হইয়া দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ববার হইয়াছিল উদরের বামভাগে, এবার হইয়াছে দক্ষিণ হস্ততালুতে; বোধ হয়, ইহার গূঢ় ইঙ্গিত—এ অধম উদরের, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে অসাবধান, অসংযমী,—সাবধান সংযমী হইবার জন্য দুই দুই বার তাগিদ। এখন ঠেকিয়া শিখিয়া যথাশক্তি যথাসম্ভব সাবধান সংযমী হইবার চেষ্টায় আছি; নীতিবাক্যেও আছে, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এখন বেশ বুঝিতেছি, আদর্শ ব্রাহ্মণের প্রিয় সাত্ত্বিক আহার—গব্যঘৃত, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, পরমান্ন, ক্ষীর, রাবড়ী, মালাই, ক্ষীরের মিঠাই (লাড্ডু, কালাকাঁদ, বরফী, রাঘবশাই), তথা কাশীর শশীর এবং তস্য জামাতার দোকানের ঘৃতপক্ব 'খাবার'—মিহিদানা, সীতাভোগ, দরবেশ, নিখুঁতি, বঁদে, খাজা, গজা, কচুরি, নিমকি, শিঙ্গাড়া, তিখুরের জেলাপী, ছানার পোলাও—এ সব লোভনীয় খাদ্য হইতে চিরজীবন বঞ্চিত থাকিতে হইবে; এমন কি, গৃহিণীর শ্রীহস্তে প্রস্তুত লুচি-পরোটা ও (শীতকালে) কড়াইসুঁটির কচুরি, ফুলকপির শিঙ্গাড়া, হিং দেওয়া ডালপুরী, পাঁপর-ভাজা এবং পৌষপার্ব্বণের রকম রকম পিঠেপুলি [২]

(২) নানাবিধ চর্ব্ব্যচুষ্যলেহ্য আহার্য্যের নামের লম্বা ফিরিস্তীতে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন, লেখকের এই অবস্থায় নামই সার হইয়াছে। শাস্ত্রে বলে, ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন; নামগ্রহণে অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক ফলও তো হইতে পারে। (তা ছাড়া কলিতে নাম-কীর্ত্তনের

আর কখন ভোগে লাগিবে না—'সকলে খাইবে, আমি বসিয়া দেখিব!' একখানি ফুল্‌কা লুচি (এক রত্তি বেগুন পোড়া দিয়া!) খাইব, তাহাও এখন আকাশকুসুম হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষার দিনের গরম মুড়ি, চা'লভাজা, চিড়েভাজা, ছোলাভাজা, তিলভাজা, কাঁঠালবীচিভাজা তৈললবণ-লঙ্কা-যোগে (বেগুনী ফুলুরী পকুরী আলুর চপ্ প্রভৃতি তেলে-ভাজার তো কথাই নাই)—শুধু আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়াই থাকিবে। আমিষের হাটে পাকা রুই-কাতলার মুড়া, গলদা চিংড়ি, গঙ্গার ইলিশ, ভেট্‌কি ভাঙ্গন শিলংমাছ—এ সব তো এখন বিধবার সাধে পরিণত। এই রামছাগলের দেশে কচি পাঁঠার তু'খানা নরম হাড় এই বেলা দাঁত থাকিতে থাকিতে চিবাইব, সে আশায় জলাঞ্জলি। কই মাগুর শিঙ্গি, বড় জোর, বাচা বাটা ট্যাংরা পাব্দা খয়রা—আর রোগীর পথ্য মৌরলা মাছের ঝোল—এই পর্য্যন্ত সীমামুড়া। বুঝি, জানি, মন বাঁধিয়া সহিয়া আছি।[৩] তবে ডাল-তরকারিতে, ভাতে ভাজায়, ঝালে ঝোলে অম্বলেও

অশেষ গুণ!) যেমন হরিনাম-কীর্ত্তনে ভজন-পিয়াসীর নয়নের জল গড়ায়, তেমনই মুখপ্রিয় খাদ্যের নামকীর্ত্তনে ভোজনবিলাসীর জিহ্বায় জল আসে।

(৩) সহৃদয় পাঠকবর্গ আশ্বস্ত হউন, এতটা অবসাদের ও বিষাদের কারণ আর বর্ত্তমান নাই। রোগশয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই এই কাহিনীর খসড়া হইয়াছিল—আগে মগজে, পরে কাগজে। তাহার পর, ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইয়াছে। সদ্যোরোগমুক্ত হইয়া বর্ষার দিনে দুই এক গাল চিড়েভাজা খাইতে চাহিলে কাশীর গুণসিন্ধু ডাক্তার বাবু বলিয়াছিলেন—"স্বাভাবিক ভাবে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে চিড়েভাজা কেন, ছোলাভাজা পর্য্যন্ত খাইতে দিব।" আমি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলাম, "ইচ্ছামত খাইতে ও চলিতে ফিরিতে পারিলেই স্বাভাবিক ভাবে শারীরিক সকল ক্রিয়া হইবে।" উভয়েরই বাক্য ফলিয়াছে। এখন আর আহারে বাঁধাধরা ব্যবস্থা নাই, নিষেধের কসাকসি নাই,—ক্রমে ক্রমে রহিয়া সহিয়া (জনার্দ্দন-স্মরণ করিয়া) আকাঙ্ক্ষিত বহুতর আহার্য্যেরই স্বাদ লইতে পারিয়াছি, তবে অবশ্য পরিমিত ভাবে এবং কালেভদ্রে।

হয় তো একটু আধটু অত্যাচার করিয়া বসি (এখন তো এই শাদাসিধা আহারই সম্বল) এবং তাহার ফলভোগও করি। এই শাক-পাতা-কচু-কাঁচকলার ⁴ ক্ষেত্রেও রাশ টানিতে হইলে আর কি লইয়া বাঁচি, পাঠকবর্গই বলুন। জানি না, এই মাত্রা-অতিক্রমের জন্য আবার তৃতীয় বার (বার বার তিন বার) warning পাইব কিনা, (alarm-bell) বিপৎসূচক ঘণ্টা বাজিবে কিনা, তৃতীয় আর একটি স্থানে, আরও নিম্ন-অঙ্গে, একেবারে মূলাধার ঘেঁষিয়া কার্ব্বঙ্কলের উদয় হইয়া মূলে হাবাৎ হইবার শেষ নোটিস্ দিবে কিনা। হয় তো তাহাতেও সোর হইবে না। শেষে—সাপের মত—মরিয়া সোজা হইব। ভূত হইয়া 'ভূতে পঞ্চুন্তি'র দলে ভিড়িব। তবে আশ্বাসের কথা—আমার এক ভোজনবাগীশ বন্ধু বলিতেন, "কেহ বা খাইয়া মরে, কেহ বা না খাইয়া মরে ; ইহার মধ্যে কাপুরুষের মত না খাইয়া মরার চেয়ে বীরের মত খাইয়া মরাই ভাল।" (বলা বাহুল্য, বন্ধুবর জীবন-মধ্যাহ্নেই এ জগৎ ছাড়িয়াছেন। টীকা অনাবশ্যক।)

সত্যকথা বলিতে কি, আমি চিরদিনই ভোজনবিলাসী—শত্রুপক্ষ বলেন, ঔদরিক বা পেটুক। এ কথা চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে 'পত্নীতন্ত্রে' ⁵

বিশেষরূপে দুষ্পাচ্য আহার্য্যগুলির এতদিন পরখ করি নাই—মাঘের প্রচণ্ড শীতের অপেক্ষায় ছিলাম। পাঠকবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন, গুরুপাক ভোজ্যও পরিপাক করিতেছি। এখন মাত্রা ঠিক রাখিতে পারিলে হয়।

(৪) কলমের টানে কাঁচকলা লিখিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু পেটের পীড়ার সময় অতিরিক্ত কাঁচকলা-ভক্ষণের ফলে এক্ষণে দারুণ কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিয়াছে, এই অজুহতে ডাক্তারবাবু কাঁচকলা একদম বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, "হবিষ্যের চিরসাথী কদলী-রন্ধন। হেসে দেখ তাহাতেও বিধি-বিড়ম্বন!' ব্রাহ্মণত্বের আর রহিল কি?

(৫) লেখকের 'ফোয়ারা'-নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

খোলসা স্বীকার করিয়াছি। যৌবনকালে আহারে যে অত্যাচার-অনাচার করিয়াছি, তাহা তখনকার দাঁতের জোরে ও অগ্নির তেজে মানাইয়া গিয়াছে। কিন্তু পঁচিশে যাহা সহে, পঞ্চাশে (ও তদূর্দ্ধ বয়সে) তাহা সহে না। এ কথাটা এখন বেশ অবলীলাক্রমে বলিতেছি বটে, কিন্তু আয় থাকিতে এ কথা বুঝি নাই বা খেয়াল করি নাই, এখন ঠেকিয়া শিখিয়া, ভুক্তভোগী—শ্রীবিষ্ণুঃ, ভুক্তরোগী—হইয়া বুঝিয়াছি। প্রৌঢ় বয়সে স্খলিত ও শিথিলদন্ত অবস্থায় হাত গুটাই নাই, ইহাই হইতেছে আসল গলদ—ইহাকেই ইংরেজিতে বলে, 'digging one's grave with one's teeth,' অর্থাৎ খন্তা-কোদাল চালাইয়া নহে, নিজের দন্ত চালাইয়া নিজের গোর খোঁড়া। তাই আজ দীর্ঘকাল রোগভোগে শয্যাগত থাকিবার পর আরোগ্যলাভ করিয়াও জীবন্মৃত হইয়া আছি—সকল কাযেই পরবশ হইয়াছি, আত্মীয়ের অনাত্মীয়ের অনুকম্পার বা অবহেলার পাত্র হইয়াছি। যৌবনের অসংযমের, অপরাধের, পাপের—এই কঠোর দণ্ড।

ভোজন-বিলাসকে 'পাপ' বলিতেছি, ইহাতে হয় তো অনেকে বিস্মিত হইবেন। কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্,' তখন দেহের উপর অত্যাচার করিয়া দেহের অনিষ্ট করিলে, স্বাস্থ্য নষ্ট করিলে, ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং ইহা পাপ নহে কি? তাই—

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"

শাস্ত্রে এইরূপ নিষেধবাক্য আছে। রোগ পাপের ফল, এই বিশ্বাসেই অনেক দিন রোগে ভুগিলে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত-চান্দ্রায়ণাদির ব্যবস্থা আছে; সূর্য্যস্তবরাজে 'সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-সর্ব্বরোগোপশমনার্থে বিনিয়োগঃ' আছে। [বলা বাহুল্য, ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া 'বিষয়কর্ম্ম' হইতে বাধ্য হইয়া অবসর গ্রহণ করাতে অখণ্ড অবকাশে ম্লেচ্ছভাষার সাহিত্যচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া

আজ শাস্ত্র ঘাঁটিতেছি, 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্' বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।]

এ সব শাস্ত্রের বাণী নব্যতন্ত্রের পাঠকগণ হয় তো উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানও এই মতেরই পরিপোষক। শিক্ষকতা করিবার সময় ব্ল্যাকি সাহেবের 'Self-culture'-নামক পুস্তকে অনেকটা এই ধরণের কথাই যেন পড়িয়াছিলাম। তিনিও আহারাদি-বিষয়ে নিয়মলঙ্ঘনকে 'Sin' (পাপ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতের এক জন বড় ডাক্তার আরও খোলসা করিয়া কথাটা বলিয়াছেন—

"In childhood we had been taught that suffering and death came into the world through Sin. Now physicians knew that the Sin for which man was continuously paying the penalty was not necessarily his failure to comply with an arbitrary code of morality, but was in every case due to ignorance or disregard of the immutable workings of Nature." *

শাস্ত্রের দোহাই বা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দোহাই না দিলেও এই মোটা কথাটা বুঝিতে বা বুঝাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। তবে—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভুক্তভোগী না হইলে এ সব খেয়াল হয় না। দুরধিগম্য শাস্ত্রের বা দুরূহ বিদেশী ভাষার সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাল্যাবধি পঠিত পুস্তকে এই শ্রেণীর হিত উপদেশের অভাব ছিল না। কিন্তু তখন সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর ও প্রবৃত্তি ঘটে নাই। যখন মাইনার্ স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে পদ্যপাঠ প্রথমভাগে পড়িলাম,—

(*) "The Wisdom of the Body"—Harveian Oration at the Royal College of Physicians (Prof. E. H. Starling).

"রসনা সুতৃপ্ত বটে মিষ্ট রসে হয়।
উদরের পীড়া কিন্তু জনমে নিশ্চয়॥"

তখন, ইহা যে আমার মোণ্ডামিঠাই খাওয়ার অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারে, পণ্ডিতমহাশয়ের পাঠনার গুণে এরূপ অন্তর্মুখীন ভাব মনে কোনও দিন উদিত হয় নাই; দুরূহ শব্দের অর্থ করিতে ও কবিতা দুই ছত্র গদ্য-আকারে (Prose-order) পরিণত করিতেই মানসিক সবটুকু শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল। আবার মাইনার্ স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া পরীক্ষায় পাশ্ হইয়া যখন এন্‌ট্রেন্স্ স্কুলে প্রবেশ করিলাম, তখন দেবভাষার প্রথম শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে "অতিভোজনং হি রোগমূলম্" পড়িলাম বটে, কিন্তু তখনও আহারে সংযমের দিকে ঝোঁক পড়িল না, ক্ষুদ্র চূর্ণকটির অন্তর্নিহিত শিক্ষার দিকে মন আকৃষ্ট হইল না, নব-পরিচিত দেবনাগর-অক্ষরের নিকষকৃষ্ণ মূর্ত্তিধ্যানেই তন্ময় হইলাম। আর একটু অগ্রসর হইয়া যখন ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগে খুব ঘোরালো রকমের শ্লোকটি পাইলাম—

"রোগশোক-পরীতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥"

তখনও আহারে অসংযমের সহিত রোগের সম্পর্ক প্রণিধান করিবার কথা মাথায় আসে নাই—(আসিবেই বা কেন? সে তো বিজ্ঞানের এলাকা, আর সংস্কৃতভাষার চর্চ্চা তো সাহিত্য-হিসাবে)—ব্যাকরণ-অভিধানের গহনবনে নব নব জ্ঞানকুসুম অর্থাৎ কাঠমল্লিকা-আহরণে ব্যাপৃত হইলাম, উক্ত শ্লোকে সন্ধিসমাসের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিলাম, 'পরীতাপে' ই-বর্ণের দীর্ঘত্ব লইয়া মাথা ঘামাইলাম, ব্যসনের 'ইত্যমর-কোষঃ' তথা কামজ-কোপজ দোষের শ্লোকময়ী তালিকা করিয়া মুখস্থ করিলাম—পরীক্ষায় বেশী নম্বরও পাইলাম। আর কি চাই? সুতরাং

পঠদ্দশায় এই যে তিন তিন বার সংযমসাধনে সাবধানতার ইঙ্গিত—ইংরেজ কবির ভাষায় "Three Warnings"—পাইলাম, তাহা মাঠে মারা গেল। আর ঠাকুর-মার মুখে শ্রুত ডাকের বচন "রোগ নষ্ট লঘুভোজনে" তো মেয়েলি ছড়া বলিয়া "go-to-hell" বা "ন স্যাৎ" করিয়া দিলাম, ঋজুপাঠের শ্লোকটি মনে মনে লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞা ঠাকুর-মার উপর টেক্কা দিলাম—

"বৃদ্ধস্য (বৃদ্ধায়াঃ) বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈব বিচারে তু ভোজনেঽপ্যপ্রবর্ত্তনম্॥"

পঠদ্দশা পার হইয়া যখন পরকে পাঠ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম অর্থাৎ শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হইলাম, তখন যৌবনের গর্ব্বে ও ছাত্রজীবনের সফলতার গৌরবে তথা শিক্ষাদানের আনন্দে বিভোর হইলাম, ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হইলাম এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থে নানাবিধ সুখাদ্যভোজনে চরিতার্থ হইলাম। সুতরাং এ সময়েও পুস্তকের মারফত প্রেরিত শিক্ষা আমলে আনিলাম না। পূর্ব্বোক্ত ব্ল্যাকি সাহেবের 'Self-culture'-নামক ছাত্র-ভয়ঙ্কর পুস্তকখানির মর্ম্মার্থ ছাত্রমণ্ডলীকে বুঝাইতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত, পুস্তকস্থ শিক্ষার মর্ম্ম-গ্রহণ করিবার বা করাইবার অবকাশ কোথায়? তাহার পর শিক্ষকতা-কার্য্যে যখন পাকা হইয়াছি, ম্লেচ্ছভাষার সাহিত্যের পঠন-পাঠনে যখন অন্তরে বাহিরে—মস্তিষ্কে ও মুখে—কড়া পড়িয়া গিয়াছে, (the iron had entered into the soul), তখন এক সুপ্রভাতে সুসমাচার পাইলাম—বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধানে মাতৃভাষার সাহিত্য পাকাপাকি-রকমে পাঠ্য (?) হইয়াছে—স্তাবকের উচ্ছ্বাসময় ভাষায় বিমাতার গৃহে মাতার স্থান হইয়াছে। মনের স্ফূর্ত্তিতে, জননী বঙ্গভাষার সম্মান-লাভের (?) আনন্দে, কলেজে ম্লেচ্ছভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সাহিত্য-

পাঠনার ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লইলাম।—(এ যেন কটুতিক্তকষায় কবিরাজী ঔষধ অনুপান মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করার ব্যবস্থা !) সেই অবস্থায় ও ব্যবস্থায় শ্রদ্ধাস্পদ ৺চন্দ্রনাথ বসুর "সংযমশিক্ষা" ইণ্টার্মিডিয়েট্ শ্রেণীতে পড়াইতে সুরু করিলাম ; প্রবীণ বসু মহাশয়ের বর্ণিত 'আহারে সংযম'-সম্বন্ধীয় নিম্নোদ্ধৃত [৭] ব্যাপারটি লইয়া ছাত্র ও শিক্ষকে মিলিয়া খুব হাসাহাসি করিলাম। আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা" লাখ কথার এক কথা।

যাক্, পঠন-পাঠনের পুনঃ পুনঃ পরিচয় দিয়া, আর পাঠকবর্গের বিরক্তিভাজন হইব না। ধান ভানিতে শিবের গীত না গাহিয়া, এইবার ধানভানা আরম্ভ করিব, অর্থাৎ পীড়ার কথা পাড়িব। তবে ভয় হয়, পাছে তাহা ধানভানার মতই একঘেয়ে হইয়া পড়ে। বাস্তবিক, রোগের কাহিনী সাহিত্যভুক্ত করার চেষ্টা অসমসাহসিকতার কার্য্য, লেখক সেই অসমসাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ৺ব্যোমকেশ মুস্তফি "রোগশয্যার প্রলাপ" 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র মারফত পাঠকবর্গের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে রোগের কথা ছিল না বলিলেও চলে, সমাজ ও সাহিত্য-সম্পর্কীয় নানা কথার সারগর্ভ আলোচনা ছিল। যে ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত হইতেছে, সেই সাহিত্যে সুরসিক চার্লস্ ল্যাম্বের "The Convalescent"-নামধেয়

---

(৭) "পিতা পুত্রকে কহিলেন—(চিনি দেওয়া ঘন) দুধ খানিকটা খাও আর খানিকটা মুখে করিয়া বাহির-বাটীতে লইয়া গিয়া সেখানে ফেলিয়া দিয়া আচমন কর গিয়া। ভোজন-স্থান হইতে বহির্ব্বাটীর আচমনের স্থান কম দূর নহে। সুধামাধব সমস্ত পথটুকু সেই সুধাসম ক্ষীরটুকু মুখে করিয়া গেল, বড় ইচ্ছা-সত্ত্বেও একটি ফোঁটাও খাইল না বা খাইয়া ফেলিল না। পিতাকর্ত্তৃক কিছুদিন এইরূপে পরিচালিত হইয়া পুত্র আহারে জিতেন্দ্রিয় ও সংযত হইয়া উঠিল এবং সম্পূর্ণরূপে রসনাজয়ী হইল।" (২য় সংস্করণ, চতুর্থ অধ্যায়, আহারে সংযম-শিক্ষা, ৩৯।৪০ পৃষ্ঠা।)

একটি সুন্দর প্রবন্ধে রোগযন্ত্রণা ও সদ্যঃ সদ্যঃ আরোগ্যলাভের অবস্থার তুলনায় সমালোচনা আছে, কিন্তু সেই অনন্যসাধারণ সরসতার অনুকরণ করা যা'র তা'র শক্তিতে কুলায় না। উক্ত সাহিত্যে দুইখানি পুস্তক কতকটা এই শ্রেণীর—Samuel Warrenএর "Diary of a late Physician" এবং De Foeর "Journal of the Plague-year"; বই দুইখানি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য না হইলেও সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত বলিয়া সমালোচক-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, এ দুইখানি যদিও প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের সঙ্কলন বলিয়া চালান হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক লেখকদ্বয়ের কল্পনার ভিত্তির উপর ইহাদের প্রতিষ্ঠা। আর এগুলি রোগীর নিজের জবানীও নহে। বক্ষ্যমাণ বিবরণ বাস্তব, এবঞ্চ ভুক্তভোগী রোগীর নিজের কথা। তবে সেই জন্যই ইহাতে (morbid details) রোগের খুটিনাটি কথা বেশী রকম থাকার আশঙ্কা আছে, তাহার ফলে ইহা নীরস, একঘেয়ে ও নিরতিশয় বিরক্তিকর হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। পাঠকের সমবেদনাই ইহাকে সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করিতে পারে। ইহার সমস্ত অংশই রোগশয্যায় রচিত, সুতরাং বিশৃঙ্খল, অসংবদ্ধ, এলোমেলো (rambling discourse)—তবে তাই বলিয়া 'প্রলাপ' নহে, এ কথা বোধ হয় ভরশা করিয়া বলিতে পারি। আজ এই পর্য্যন্ত। পাঠকবর্গের কৌতূহল, সমবেদনা ও আগ্রহের পরিচয় পাইলে উল্লিখিত বিবরণ পত্রস্থ করিবার চেষ্টা করিব। [৮]

(৮) বিবরণটি কয়েকমাস খসড়া-আকারে পড়িয়া ছিল। সে দিন একখানি ইংরেজী দৈনিকে দৈবাৎ দেখিলাম, Mlle Jeanne Galzy-নাম্নী জনৈক ফরাসী মহিলা স্বীয় রোগভোগ ও সদ্যোরোগমুক্তির বিবরণ লিখিয়া প্রাইজ্ পাইয়াছেন। (The Indian Daily News, 10th January 1924) তাই আমিও ভাবিলাম, 'অহো নিধিপ্রাপ্তেরয়মুপায়ঃ।' আমার এই কাহিনী প্রকাশিত করিয়া দেখি না—কপালে 'জগত্তারিণী মেডাল্' যোটে কি না। [শেষ পর্যান্ত আর এই বিবরণ প্রকাশ করা ঘটে নাই। পাঠকবর্গ পরিত্রাণ পাইলেন।—পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।]

ভোজনসাধন

আদ্যলীলা

(মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩০)

মনে করিয়াছিলাম, আহারে অসংযমের কথা আর তুলিব না, এইবার রোগের বর্ণনাপত্র দাখিল করিব; পাঠকবর্গকে গত বারে সেই ভাবে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্ব-প্রবন্ধে সাধারণ-ভাবে ভোজনবিলাসের যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে রোগের মূল-কারণ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে না। সেই জন্য বাল্যাবধি এ বিষয়ে কোন্ পথে চলিয়াছি, কি ভাবে ভোজনসাধন করিয়াছি, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিতেছেন যে, ফলা'রে ব্রাহ্মণের মনটা যেমন লুচিমোণ্ডার পাতের চারিদিকে ঘূর ঘূর করে, বর্ত্তমানের ভোগ্যভোজ্য অবর্ত্তমানে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশায় মন-প্রাণ ভরপূর থাকে, এ পক্ষও তেমনি এখনকার এই বেকার অবস্থায় সারাজীবনের ভূরিভোজনের সুখময় স্মৃতিসহায়ে জীবনধারণ করিতেছেন। এ সকল কথার পুনঃ পুনঃ (ad nauseam) আলোচনায় পাঠকবর্গের বিরক্তির আশঙ্কা আছে (তবে চাই কি, তাঁহাদিগের মধ্যেও তুল্য-রাশির লোক সমজদার মিলিতে পারে)—কিন্তু লেখকের বর্ত্তমান দশায় ভোজনসুখের স্মৃতিই যে একমাত্র সম্বল ও অবলম্বন। শাস্ত্রে 'গোব্রাহ্মণ' এক পর্য্যায়ভুক্ত; ভগবান্ 'ব্রাহ্মণহিতায় চ' গোজাতির মত ব্রাহ্মণজাতির রোমন্থনের [১] ব্যবস্থা করেন নাই বটে, কিন্তু

---

(১) ইংরেজী 'ruminate' শব্দের literal ও metaphorical, শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ, দুই প্রকার অর্থই আছে। বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্য যে, 'রোমন্থন' শব্দের শুধু (literal) শক্যার্থটাই অভিধানিকেরা ধরেন। ইংরেজী ভাষায় দুইটি অর্থ কি জন্-বুলের—নরপুঙ্গবের—ভাষা বলিয়া ঘটিয়াছে ?—ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের টিপ্পনী।

স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া পূর্ব্বানুভূত সুখরূপ বিষামৃত উত্তোলন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহা তাঁহার অনন্ত করুণার, অহৈতুকী মানবপ্রীতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে কি ?

যাক্, আবার আহার-কাহিনী আরম্ভ ('কেঁচে গণ্ডূষ') করি। আমার এই ভোজন-বিলাস—জন্মলগ্নে যে সব গ্রহনক্ষত্র বিরাজ করিতে-ছিলেন অবশ্য তাঁহাদেরই প্রসাদে। কোষ্ঠীখানি খোয়া গিয়াছে (সে কাহিনী পত্রস্থ করিয়া আর পুঁথি বাড়াইব না) নতুবা নিশ্চিত তাহাতেই লিখিত দেখিতাম,—'উদরভরণতুষ্টঃ।' তবে সাধারণ লোকে স্থূল দেখে, সূক্ষ্ম দেখে না, সুতরাং তাহারা ওসব আধিদৈবিক কারণ বুঝিবে না, মানিবে না, (আমার মত ঠেকিয়া না শিখিলে) ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিবে না; অগত্যা লোক-প্রতীতির জন্য আধিভৌতিক কারণই নির্দ্দেশ করি। দর্শনশাস্ত্রের এই পারিভাষিক শব্দটিও হয় তো অনেকের বোধগম্য হইবে না (লেখকেরও শুনিয়া শেখা মাত্র); অতএব নব্যবিজ্ঞানসম্মত শব্দ ব্যবহার করাই ভাল—('environment' অর্থাৎ) 'পরিবেষ্টনী' বা 'পারিপার্শ্বিক অবস্থা'। ইহারই প্রভাবে এ অধম বাল্যাবধি খাদ্যবাগীশ; দশচক্রে যেমন 'ভগবান্ ভূত' হইয়াছিলেন তেমনি ঘটনাচক্রে আমারও এই অভূতপূর্ব্ব অবস্থা। যখন আত্মকাহিনী বলিতে বসিয়াছি, তখন সকল কথাই খুলিয়া বলিতেছি। পাঠক মহাশয় ধৈর্য্যধারণ করিয়া ('ফুল হাতে লইয়া') শ্রবণ করুন, এই-মাত্র প্রার্থনা।

ভাগ্যহীন লেখক ৯ মাস বয়সেই মাতৃহীন শিশু। শুনিয়াছি, মাতৃ-দেবীকে নিদ্রিতাবস্থায় সাপে কামড়াইয়াছিল; আমি সেই একই শয্যায় তাঁহার পার্শ্বে নিদ্রিত ছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সাপে আমাকে ছোবলায় নাই। ছোবলায় নাই বটে, শরীরে দংশনচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু (আমার মনে হয়) ভিতরে ভিতরে বিষ সঞ্চারিত করিয়াছিল,

হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে দাঁত বসাইয়াছিল, তাহাতেই আমার আশৈশব সমগ্র জীবন বিষময় বিষাদময় হইয়াছে। কেবল অনন্ত দুঃখভোগের জন্যই 'চিরজীবী করিল গোঁসাই।' ইংরেজ কবির ভাষায়, "Hope never comes That comes to all; but torture without end Still urges"—২

নাঃ, আর এ করুণ সুরে সহৃদয় পাঠককে বিব্রত করিব না। পিতামহী ঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়াছি, আমার জন্মবর্ষে গ্রামে 'ছেলের জাহাজ' আসিয়াছিল, অন্ততঃ ৫।৬ ঘরে ভাগ্যবতী জননীরা পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রামে দুগ্ধবতী নারীর অভাব ছিল না; কিন্তু মাতৃবিয়োগের পর মুহূর্ত্ত হইতেই আমি কোনও মাতৃস্থানীয়ার স্তনে মুখ দিই নাই—স্তন্যসুধাপান তো দূরের কথা; কৃষ্ণকায় শিশু সকল দুগ্ধবতী নারীকেই পূতনাবোধে বর্জ্জন করিয়াছিল কিনা, বলিতে পারি না।

এ অবস্থায় গোদুগ্ধই সম্বল। মাতামহদেব সে অনুষ্ঠানেরও ক্রটী রাখেন

---

(২) মাতৃভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াও রাজভাষায় রচিত পুস্তক ভুলিতে পারি না। সর্পাঘাতের প্রসঙ্গে ইংরেজী ভাষায় মার্কিন্ লেখকের রচিত একখানি নভেলের (Breakfast Table এর খ্যাতনামা লেখক Holmes এর "Elsie Venner" এর) নাম মনে পড়িল। নায়িকা যখন মাতৃগর্ভে, তখন বিষধর-সর্প-দংশনে মাতার মৃত্যু হয়। এই বিষ ভ্রূণের রক্তে সঞ্চারিত হইয়া ভবিষ্যতে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, উল্লিখিত পুস্তকে তাহার কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইংরেজীনবীশ পাঠককে বক্ষ্যমাণ নীরস বিবরণ-পাঠের পর উক্ত উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ রহিল। [পিতৃদেব এই মুদ্রিত প্রবন্ধপাঠান্তে বলিয়াছিলেন যে সর্পদংশনের বিবরণে আমার শোনার একটু ভুল আছে। আমি অন্য ঘরে পিতৃদেবের পার্শ্বে নিদ্রিত ছিলাম, মাতৃদেবী যে ঘরে নিদ্রিতা ছিলেন সে ঘরে নহে। পাঠক মহাশয় বিবরণটী সংশোধন করিয়া লইবেন।—পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।]

নাই। দুহিতা দেহরক্ষা করিলে দৌহিত্রের প্রাণরক্ষার জন্য সবৎসা গাভী দান করিয়াছিলেন। (মেলিন্‌স্ ফুড্ বা গোয়ালিনী-মার্কা গাঢ় দুগ্ধ তখনও এ দেশে 'ব্যবহারে' আসে নাই।) শুধু গোদুগ্ধের উপর নির্ভর না করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র শিশুকে ডাল-ভাত ধরান কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু, বংশের প্রথম সন্তান, তাহাতে আবার মা-হারা, এ জন্য 'ঠাকু-মা'র পরম আদরের ধন; সুতরাং শিশুকে ভুলাইবার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র ডালভাতের নহে, এমন কি, মুড়কী মোয়ারও নহে, একেবারে গোল্লামোণ্ডার ব্যবস্থা হইল। (তখনকার দিনে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে, লজেঞ্জুস্ বিস্কুট্ প্রভৃতি বিষময় খাদ্যের যোগান হয় নাই।) সন্দেশ হাতে পাইয়া শিশু বোধ হয় মাতৃ-বিয়োগদুঃখও ভুলিল। ফলতঃ অবস্থার গতিকে অথবা অভিভাবক-অভিভাবিকার বিবেচনার অভাবে (?) ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপদিষ্ট 'শৈশবে সংযমে'র নিয়ম অনুষ্ঠিত হইল না। ইহার ফল শিশুর ভবিষ্যৎ-জীবনে কিরূপ ফলিয়াছে, পাঠক তাহার পরিচয় 'রোগের নিদান'-প্রবন্ধেই পাইয়াছেন। শুনিয়াছি, শৈশবে রাত্রে শয়নকালে শিয়রে সংক্রান্তি—শ্রীবিষ্ণুঃ—সন্দেশ অর্থাৎ যোড়ামোণ্ডা রাখা দেখিয়া মন ঠাণ্ডা হইলে তবে নিদ্রা যাইতাম; এবং প্রভাতে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে সেই মোণ্ডা যোড়াটির দর্শন-স্পর্শন-ভক্ষণ-ভ্রক্ষণ-সুখ উপভোগ করিয়া তবে প্রাতঃকৃত্যে অবহিত হইতাম।

লালনের বয়স পার হইয়া যখন বিদ্যালাভে ব্রতী হইলাম, মাতৃভাষায় বর্ণপরিচয়াদি শেষ করিয়া ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিলাম, তখন স্বগ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অপর একটি গ্রামে পিতৃদেব (তথায় ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) পাঠের সুবিধার জন্য আমাকে লইয়া গেলেন; তথাকার জমিদার-গৃহে পরিবারস্থ বালকের ন্যায় আশ্রয় পাইলাম। কিন্তু সেই গ্রামে বিলাতী সভ্যতার প্রধান অঙ্গ ইংরেজী

স্কুল্ থাকিলেও সন্দেশের দোকান তেমন সুবিধামত ছিল না এবং দোকানে যে সন্দেশ প্রস্তুত হইত, তাহা ধর্ম্মদা-মুড়াগাছার কাঁচাগোল্লা-দেদোমোণ্ডা-খেগো মুখে রুচিত না। তাই যাহাতে প্রবাসে মন বসে, সেই জন্য পুত্রবৎসল পিতৃদেব মা-মরা ছেলের মুখ চাহিয়া উচিতমত ব্যবস্থাও করিলেন। যখন মাতৃস্থানীয়া 'ঠাকু-মা'কে ছাড়িয়া যাওয়ার সব ঠিকঠাক হইল, তখন সহর্ষে দেখিলাম, দুই জন বাহক নিযুক্ত হইয়াছে, একের স্কন্ধে বিদ্যার্থী প্রবাসগামী বালক, অপরের স্কন্ধে যোড়ামোণ্ডার 'তোলো' হাঁড়ী। গোবৎসকে যেমন ঘাসের বা বিচালীর আঁটি অথবা ঘোটককে যেমন দানাপূর্ণ বা দানাশূন্য বাল্‌তি দেখাইয়া সহজেই দূরে লইয়া যাওয়া যায়, এই ব্রাহ্মণবটুকে সেইরূপ সহজেই সন্দেশের হাঁড়ী দেখাইয়া প্রবাসে লইয়া যাওয়া গেল। সাধে কি শাস্ত্রকারেরা 'গোব্রাহ্মণ' একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন? দীর্ঘপথে বাহকদ্বয় মধ্যে মধ্যে ভার বদল করিয়া লইত (একটানা মিষ্টান্নের ভারবহনও যে তিক্ত হইয়া দাঁড়ায়); জীব-বিশেষ যেমন চিনির ভার বহন করিয়াই জীবন সার্থক করে, তাহারাও তেমনি মিষ্টান্নের ভার বহন করিতে পাইয়া নিজ নিজ অদৃষ্টের বহুমান করিয়াছিল সন্দেহ নাই, ভারের অদলবদল করাতে কেহ কাহাকে হিংসা-দ্বেষও করে নাই! (প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাহকদ্বয়ের কেহই জল-আচরণীয় জাতির ছিল না, আর অধিক ভাঙ্গিলাম না—তবে অনুপনীত বালকের পক্ষে এরূপ অনাচারে বোধ হয় দোষ নাই।)

প্রবাসেও সেইরূপ শিয়রে সন্দেশ সঞ্চিত থাকিত ও যথানিয়মে যথাসময়ে 'বাল্যভোগ' সমাধা হইত। (ঠাকুরমাতার স্থানীয়া এক বর্ষীয়সী মহিলার হস্তে ব্যবস্থার ভার ছিল।) মোণ্ডাও কি ছাই [৩] তখনকার দিনে অসম্ভব

(৩) ইংরেজীতে বার্দ্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব ('second childhood') বলে। আমার অকালবার্দ্ধক্যে দেখিতেছি, সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। গত বর্ষে আমাশয়-উদরা-

সস্তা ছিল, চারি আনা সের—অবশ্য 'রাশি' সন্দেশ তথা কাঁচি সের। এই সস্তার গুণেই গরিব স্কুল্-মাষ্টার্ অক্লেশে পুত্রটির জন্য যোড়ামোণ্ডার রোজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক ইংরেজীনবিশ একটি সুবিদিত সংস্কৃত শ্লোকের অন্তিমচরণ ধরিয়া মিষ্টান্নকে 'ইতর' লোকের [৪] খাদ্য বলিয়া ঘৃণা করেন। [৫] কিন্তু ইংরেজীনবিশ পিতার ইংরেজীনবিশ পুত্র

ময়-প্রভৃতির উপশমান্তে সদ্‌বিবেচক কবিরাজ মহাশয় সেই বাল্যের ন্যায় দিনান্তে এক যোড়া করিয়া সন্দেশ বরাদ্দ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। (প্রভেদের মধ্যে এই যে, জীবন-প্রভাতে প্রাতে সন্দেশ, জীবনসন্ধ্যায় অপরাহ্নে সন্দেশ।) বর্ত্তমান বর্ষেও সদাশয় ডাক্তার-বাবু তাহাই বাহাল রাখিয়াছিলেন,তবে নানা রোগের (bacillus) জীবাণুর ভয়ে বাজারের সন্দেশ নিষেধ করিয়া হোয়ে (whey) বা ছানার জলের অবশিষ্ট ছানা হইতে গৃহে প্রস্তুত সন্দেশ আদেশ করিয়াছিলেন। এখন আর ততটা সাবধানতার আবশ্যকতা নাই। তাই দোকান হইতেই সন্দেশ সরবরাহ হইতেছে। 'বামুনে কপাল'-সত্ত্বেও অদৃষ্ট-দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, দূরের গঙ্গা কাছে আনিয়াছেন, মুড়াগাছার দুইটি দোকান আমাদের গলির কাছেই মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে স্থাপিত হইয়াছে। মালও ভাল, দরেও সস্তা (কলিকাতার বাজারদরের তুলনায়)। তবে শৈশবের সে চারি আনা সের এখন কবিকল্পনায় দাঁড়াইয়াছে, এক শিকিতে দূরে থাকুক, এখন পাঁচশিকায়ও এক সের পাওয়া যায় না (দেড় টাকার কম সের মিলে না)।

(৪) বলা বাহুল্য, 'ইতর' শব্দের ওরূপ ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা। তথাপি পাছে পাঠক লেখকের বিদ্যার দৌড়-সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া বসেন, তাই এটুকু বলিয়া রাখিলাম। মাষ্টারের ভুল ধরিতে পারিলে যে অনেকে মহা খুসী।

(৫) এই জন্যই কলিকাতায় দেখিতে পাই, 'যজ্ঞিবাড়ী' সন্দেশ খুবই কম খরচ হয়—আমাদের পল্লীগ্রামের খরচের তুলনায়। যে সময়ে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'এর পালা, সে সময়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া-অজীর্ণ-অম্বলের অজুহতে, আমাদের মত সদ্‌ব্রাহ্মণ ২।৪ জন ছাড়া, সকলেই হাত তোলেন, নিতান্ত উপরোধে পড়িলে আম-সন্দেশ বা তালশাঁস নখে খুঁটিয়া একরত্তি মুখে দিয়াই ইতি করেন। একবার এমন দৃশ্যও দেখিয়াছিলাম যে, লুচী-ছকা, ডাল-ডালনা, পোলাও-কালিয়া, কোর্ম্মা-কোপ্তা, চপ্-কট্‌লেট্, কচুরী-পাঁপর, হালুয়া-চাটনী ও দধির পর যেই সন্দেশ পরিবেষণ সুরু হইল, অমনি সকলে এক-যোগে হাত না তুলিয়া একেবারে গা তুলিলেন ; অভাগা এ পক্ষ কেবল 'হংসমধ্যে বকো যথা' হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রহিলেন ! (এততেও কিন্তু ভীমনাগের এবং 'ভ্রাতা'র—অর্জ্জুনের ?—সন্দেশের দর সমানই চড়া, ১০০৲ টাকা মণও নাকি 'লগনসায়' হয় শুনি)।

হইয়াও এই অধম ঘোর কলিকালে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে ; বরং আশৈশব সন্দেশভোজনের অভ্যাসবশতঃ লেখকের সন্দেশ-প্রীতি সারাজীবন ধরিয়া ('হবিষা কৃষ্ণবর্ম্মেব') বাড়িয়াই গিয়াছে। তবে আর এখন সে অগ্নির তেজ, সে পরিপাকশক্তি নাই ; এইখানেই যত গোল ('There's the rub')। যাহারা মৎস্য-মাংসে আসক্ত, তাহারা নাকি মিষ্টান্নে রাজী নহে, এইরূপ একটা কথা শুনিতে পাই ; কিন্তু আমি যৌবনকাল হইতে মৎস্যমাংস বনাম পায়সপিষ্টক সন্দেশমিঠাই উভয় পক্ষের প্রতি (মিষ্টান্নের উপর বংশগত ঝোঁক থাকিলেও) অপক্ষপাতে সুবিচার করিয়াছি. [৬] এ কথা হলফ করিয়া বলিতে পারি—শ্রীবিষ্ণুঃ—'স্পৃষ্ট্বা সত্যং দিব্যমহং করোমি যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রম্।' স্বীকার করি, ইদানীং মাংসভক্ষণে ততটা আগ্রহ নাই ; তবে সেটা বয়সের দোষে রুচিপরিবর্ত্তনে বা প্রবৃত্তিনিবৃত্তির কারণে ('প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা') যতটা না হউক, স্খলিত ও শিথিল দন্তের দরুণই ঘটিয়াছে।

এই মিষ্টান্নপ্রিয়তা বোধ হয় ঠিক আমার নিজস্ব বৃত্তি বা প্রবৃত্তি নহে। শুনিয়াছি, জনৈক পূর্ব্বপুরুষ এতদূর সন্দেশখোর ছিলেন যে, ময়রার দেনাশোধ করিতে শেষটা সমস্ত 'ব্রহ্মোত্তর' সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি এই মায়াময় সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মোত্তর বিষয়ের মায়া কাটাইয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে ব্রহ্মলোক ('মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা' ব্রহ্মপদে প্রবেশ) লাভ করিয়াছেন কি ইহলোকে গোল্লাগ্রাস করিবার পর কালগ্রাসে পতিত হইয়া পরলোকে গোলোকধামে গমন

(৬) তবে ৺অন্নপূর্ণা যদি এক হস্তে পায়স-সন্দেশ ও অপর হস্তে মৎস্য-মাংস লইয়া শুধু এক হস্তে ধৃত আহার্য্য নির্ব্বাচন করিতে বলেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক প্রকৃতিই জয়লাভ করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের রাসভরত্নের মত দোনো পাল্লা ভারী বলিয়া অস্থিতপঙ্ককে পড়িয়া মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া উপবাসী থাকিব না, এ ভরসা আছে।

করিয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ রাখি না। (এ ক্ষেত্রে যদি কেহ বলেন যে, তিনি গোল্লা গিলিয়া গোল্লায় গিয়াছেন, তবে তাঁহাকে পাল্টা জবাবে বলি, গাঁজাগুলি, মদভাঙ্গ খাইয়া ও তদানুষঙ্গিক উপসর্গে জমিদারি বা মজুত টাকা উড়ানর চেয়ে ইহা লাখো গুণে ভাল নহে কি?) কয়েক পুরুষ পরে আমার প্রকৃতিতে এই দোষ (?) অর্শান বৈজ্ঞানিকের atavismএর সুন্দর দৃষ্টান্ত। পূজ্যপাদ পিতৃদেব যতটা পরমান্নভক্ত, ততটা মিষ্টান্নভক্ত নহেন। শুধু পিতৃদেব কেন, বংশের বোধ হয় সকলেই পরমান্নের পরম ভক্ত। আমার মনে হয়, অন্তিম অবস্থায় যে সময়ে নাড়ী পাওয়া যায় না, সে সময়ে মৃগনাভি-মকরধ্বজ-সূচিকাভরণ সেবন না করাইয়া যদি কেহ পায়সের পূর্ণপাত্র আমাদের হাতে দেয়, তাহা হইলে আবার নাড়ীর সঞ্চার হয়। ইদানীং ইংরেজী বিদ্যা পেটে পড়াতে বংশের কাহারও কাহারও পেটে পায়স সহে না। আমি ইংরেজী বিদ্যা উদরস্থ করিলেও বাপের কুপুত্র নহি। বরং উভয় ধারাই বজায় রাখিয়াছি অর্থাৎ গডাচর চণ্ডের 'ড়ুডও খাই টামাকও খাই'এর মত রেকাবীভরা সন্দেশও সানন্দে শেষ করি, বাটিভরা পরমান্নও পরমানন্দে পার করি। সৌভাগ্যক্রমে, মা-সরস্বতী ও মা-লক্ষ্মী উভয় সপত্নীতে 'আপোষ' করিয়া এই অধীনের প্রতি যেটুকু কৃপাদৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহার প্রভাবে দেউলিয়া হইতে হয় নাই, এ জন্য তাঁহাদিগের চরণে বার বার প্রণাম করি।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আবার বাল্যলীলার কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মথুরা হইতে বৃন্দাবনে নীত হইয়া ক্ষীর-সর-নবনীত দধি-ছানা-মাখন খাইয়া [৭] দিন দিন শশিকলার ন্যায় ('কালো

---

(৭) বৃন্দাবনে গয়লা ছিল, কিন্তু ময়রা বোধ হয় ছিল না। সুতরাং গোপালজী গোল্লামোণ্ডার মুখ বোধ হয় দেখিতে পান নাই, বড় জোর, ক্ষীরের লাড়ু ও কালাকাঁদ খাইয়া লাড়ুগোপাল ও কালাচাঁদ সাজিয়াছিলেন!

শশী') বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ স্বগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নীত হইয়া, প্রাতে যোড়ামোণ্ডার মুখপাত এবং দুই বেলা চাষের মোটা চাউলের ভাত, খোসাসমেত কাঁচা কলাইএর ডা'ল, খাঁটি বল্‌কা দুধ ও টাটকা-তৈয়ারি ঘী খাইয়া 'দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা'—মসী-লেখাই বটে—নবনীলনীরদমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলাম। 'ঋজুপাঠে'র নীলীভাণ্ডপতিত শৃগালের মহারণ্যে সিংহাসনে সমাসীন রাজরাজেশ্বর-মূর্ত্তিও তাহার কাছে হারি মানিল।

আমকাঁঠালের সময় এই শাদামাটা আহারের বিলক্ষণ বৈচিত্র্য সংসাধিত হইত, আর জমিদারবাড়ীতে 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে' আহারের প্রকৃষ্ট প্রকার পারিপাট্য ঘটিত। চৈত্রসংক্রান্তিতে দধিগুড় দিয়া ছাতু মাখিয়া খাইয়া নিয়ম-রক্ষা করার পর জমিদার মহাশয়ের দরাজ হাতের আঁজুল আঁজুল নালী ক্ষীর ও ধর্ম্মদার বাজার হইতে আমদানী তাল তাল কাঁচাগোল্লায় উদরপূর্ত্তির কথা এখনও আবছায়ার মত মনে পড়ে।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রবাস-জীবনের বিবরণ শেষ করিব। উপনয়নের পর এক বৎসর একাদশী করিতে হইয়াছিল; তথায় তাহার বিধিব্যবস্থা বড় সুন্দর ছিল। যাঁতায় ভাঙ্গা ঘরের ময়দার (অর্থাৎ আটার) গরম গরম রুটি (তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে শ্রাদ্ধাহে ও বিবাহের রাত্রিতে ছাড়া লুচির চল ছিল না), তরকারীর মধ্যে আলু-ভাজা বা পটোলভাজা বা বেগুনভাজা থাকিত; এখনকার মত শাকভাজা ছকা ডাল ডালনা আলুর দম প্রভৃতির বিধি ছিল না; কিন্তু এ সবের অভাব পূরণ করিত সদ্যঃপ্রস্তুত তরল ও ঈষদুষ্ণ ঘৃত—ডালের মত বাটিতে করিয়া দেওয়া হইত, তাহাতেই রুটি ডুবাইয়া ডুবাইয়া খাওয়ার নিয়ম ছিল। এখন মনে করিলেও বোধ হয় পেট গড়গড় করে, কিন্তু সে বয়সে অবলীলা-ক্রমে উহা হজম করিতাম। দুই বেলা ঘরের গরুর খাঁটি দুধের অবশ্য

ব্যবস্থা ছিল, মিষ্টান্ন ও ফলেরও ত্রুটি ছিল না—বিশেষতঃ গৃহপার্শ্বস্থ কদলীবনের সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভার।

এই ভাবে প্রবাস-জীবন যাপন করিয়া মাইনার্ পাশ করিয়া স্বগ্রামে আসিয়া বসিলাম এবং গ্রাম হইতে মাইল খানেক দূরবর্ত্তী গ্রামান্তরের এনট্র্যান্স্ স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। তখন আর বাল্যভোগের প্রয়োজন ছিল না, সকাল সকাল স্কুলের ভাত খাইয়া গ্রামের এক ডজন্ ছেলে দল বাঁধিয়া রওনা হইতাম। তখনকার দিনে ড্রিল্‌শিক্ষা দেওয়া হইত না, তাহা হইলে সৈন্যের ন্যায় মার্চ্চ্ করিতে পারা যাইত। ধানের ভূঁইএর আ'লে আ'লে সারি বাঁধিয়া ভুজগগতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতে হইত। বৈকালে ফিরিয়া (এবং ছুটির দিনে স্নানান্তে) মুড়ি ও কাঁচাগোল্লা ধ্বংস করা যাইত; সময় সময় মুড়ির সহিত অনুপান শশা বা মুলা (বা ক্কচিৎ ঝুনা নারিকেল) থাকিত; কখনও বা আখের বা খেজুরের ঝোলা গুড় অথবা চাকের টাটকা-ভাঙ্গা মধু মাখিয়াও মুড়ি খাওয়া হইত! ফুটী ফাটিলে গুড়-মুড়ির বদলে ফুটী-গুড় গিলিয়া মুখ বদলান যাইত। আম-কাঁঠাল পাকিলে আহারের ঘৃৎটা খুবই হইত। দেবভাষায় অমৃতফল নামে অভিহিত হইলেও আম আমার সে সময়ে তত প্রিয় ছিল না, কিন্তু স্নেহময়ী ঠাকুরমাতার প্রদত্ত ক্ষীর ও খাজা কাঁঠাল বৈকালে প্রচুর-পরিমাণে উদরসাৎ করিতাম; রাত্রে আবার ভাতের পাতে ঘন দুধের সহিত কাঁঠালের রসের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিত। (পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতামহদেবের কৃপায়—'মাতা মনু'র মত মাতা মহাদেব পড়িবেন না—ঘরে মা ভগবতী বাঁধা ছিলেন।) বয়সের ও পল্লীগ্রামের জল-হাওয়ার গুণে এই দুষ্পাচ্য দ্রব্যদ্বয় পেটের কোন গোলযোগ ঘটাইত না। ইহা ছাড়া বাগানে বাগানে কালো জাম গোলাপজাম জামরুল লিচু খাওয়ার অভ্যাসও ছিল; সময়ের ফল ডাঁশা পেয়ারা ও টোপা

কুল, এমন কি, বিলাতী আমড়ারও সদ্গতি করা যাইত; একবার ডাঁশা বিলাতী আমড়া এক কুড়ি সাবাড় করিয়াছিলাম বেশ মনে আছে; তবু গাছে উঠিতে জানিতাম না. শুধু তলার কুড়াইয়াই কায সারিতে হইয়াছিল। এখন আধখানি চিবাইলে দাঁত টকিয়া যায়, গিলিলে পেট কামড়ায় ও উদরভঙ্গ হয়। হায় রে সে দিন!

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে স্বগৃহে ও পরগৃহে চিড়ার ফলারটা বেশ জমিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লুচির ব্যাপার শ্রাদ্ধাহে বা বিবাহ-রাত্রিতে ভিন্ন ছিল না। সে ক্ষেত্রেও তখনকার দিনে লুচির পাতে এক (অলবণ) বিলাতী কুমড়া-মটর-আলুর 'ঘাট' ছাড়া অন্য তরকারীর রেওয়াজ ছিল না, ক্ষীর বঁদে বা ক্ষীর-গোল্লার সহিত মাখিয়া দিস্তা দিস্তা লুচি (যেন যাদুমন্ত্রবলে) উড়িত। এখন-কার পাঠকের—বিশেষতঃ সহুরে অম্লরোগীর—বোধ হয় শুনিয়াই বুকজ্বালা আরম্ভ হইবে। ঘীয়ে চর্ব্বির ভেজালের কথা প্রথম যখন রাষ্ট্র হয়, তখন পল্লীগ্রামের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সমাজে ধর্ম্মরক্ষার জন্য লুচির 'পাকা' ফলার বা 'উত্তম' ফলার বরতরফ হইয়া সাবেক চিড়ের 'কাঁচা' ফলার বা 'মধ্যম' ফলার বাহাল হইয়াছিল, সরু চিড়ে জলে ধুইয়া ফেলিয়া দুধে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে 'শুকো' দৈ অথবা 'নালী' ক্ষীর মাখিয়া কাঁচাগোল্লা দিয়া ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে যে কি উপাদেয়, তাহা সহরবাসী চপ্-কট্‌লেট্-অম্‌লেট্-ডেভিল্-ভোজী ইয়ং বেঙ্গল্‌কে বুঝান অসম্ভব।

পূজার সময় গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণে আহারের চর্চ্চাটা সুচারুরূপেই হইত। তবে সে সময়ে ছানা দুর্ম্মূল্য বলিয়া মিষ্টান্নের ব্যবস্থা—(নারিকেলের) রসকরা ও (বেসমের) 'পকান্ন' অর্থাৎ কলিকাতায় উড়িয়া-দোকানের কট্‌কটে! ইহাই সকলে পাল্লা দিয়া গণ্ডায় গণ্ডায় গলাধঃকরণ করা যাইত! প্রবীণেরা স্নানান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উপবাসী (?) থাকিতেন; নিমন্ত্রণ যদিও মধ্যাহ্ন-ভোজনের—কিন্তু ভোজ আরম্ভ হইত অপরাহ্ণে, দুই

ঘণ্টাব্যাপী আহারান্তে আচমনের সময়ে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হইত! এ অবস্থায় প্রবীণেরা প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় ভাতের রাশি—ডাল তরকারী মাছ মাংস দিয়া চাঁচিয়া পুঁছিয়া খাইয়া ৮ দধি পায়স হাঁড়ী হাঁড়ী ও রসকরা-পক্কান্ন থালা থালা উদরস্থ করিতেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। একেবারে রেক্তার গাঁথনি, তাহার উপর পঙ্খের কায! আমরা বালকের দল দুপুরে রওনা হইবার আগে চুপি চুপি চারিটি ভাত (আধপেটা করিয়া) খাইয়া লইতাম, নিমন্ত্রণ গৃহে গিয়া ভাত-তরকারী 'নমো নমঃ' করিয়া সারিয়া শেষরক্ষাটা দস্তুরমত ভাল করিয়াই করিতাম।

জন্মাষ্টমী বা শিবরাত্রির পারণ-উপলক্ষে 'জল' খাইতে নিমন্ত্রিত হইয়া সন্দেশ-রসগোল্লা সেরকে-সের উজাড় করা গিয়াছে, পৌষপার্ব্বণ-উপলক্ষে রাশীকৃত ভাজাপুলি সরুচাকুলি (আস্কে-পিঠে ভাপা-পুলির দিকে বড় ঝোঁক ছিল না) নূতন গুড়ের বাটিতে ডুবাইয়া পাচাড় করা গিয়াছে। পল্লীসুলভ সুখাদ্যের মধ্যে কেবল তালের বড়াটা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারি নাই। (ফাঁকতালে একটা কথা বলিয়া রাখি, রসিক পিতার রসিক পুত্র ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী আমার এই অপ্রবৃত্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন 'বেতালা লোক যে, তাই তালে ফাঁক যায়!') পালে-পার্ব্বণে, 'বচ্ছরকার দিনে', মনসাপূজার আটভাজা (বিশেষ করিয়া তিলভাজা কাঁঠালবীচি ভাজা) ও চা'ল-ভাজার ফলার (সোঁদা গন্ধটুকুতে প্রাণ কাড়িয়া লইত), অরন্ধনের দিন 'বাসিপান্তা' 'টক টক্ ব্যঞ্জন', সরস্বতী-পূজার দিন খিচুড়ীভোগ ও তিলে বড়ি তিল-পিটিলির ভাজা, শীতলা ষষ্ঠীতে 'গোটা'-সিদ্ধ শিম-বেগুন-সিদ্ধ (খাঁটি সর্ষপ-তৈল ও লবণ-লঙ্কা যোগে), দোলের সময় ফুটকড়াই-মুড়কী মঠ ও

(৮) মাংস নাম-মাত্র, তবে মহাপ্রসাদের 'কণিকা'ই ভক্তের পক্ষে যথেষ্ট। মাছের বেলায় তেমনি পোষাইয়া লওয়া হইত। শুধু মুখে (ভাতের গ্রাসের সঙ্গে নহে) দশ-বিশ খানা রুইমাছ অনেককে পার করিতে দেখিয়াছি।

তেলেভাজা ছোট ছোট জেলাপী (পয়সা যোড়া), চৈত্রসংক্রান্তিতে দধিছাতু প্রভৃতি 'যখনকার যা তখনকার তা' সুবোধ বালক গোপালের মত নির্ব্বিচারে নির্ব্বিকারে উদরস্থ করা গিয়াছে। ফলতঃ পাঠক যেন বুঝিয়া না বসেন যে, কবিরা যেমন শুধু চাঁদের আলো ও 'মলয়া হাওয়া', কোকিলের কুহুস্বর ও ফুলের মধু খাইয়াই বাঁচিয়া থাকেন, তেমনি লেখক শুধু গোল্লামোণ্ডা খাইয়াই প্রাণধারণ করিতেন। বস্তুতঃ উদারচিত্তে উদরগর্ত্তে ভালমন্দ সকল খাদ্যই সাদরে গৃহীত হইত এবং বিনা-আয়াসে জীর্ণও হইত। আর আজ !—

দৈনন্দিন আহারে আবার এ সব বাহুল্যও ছিল না—মাংস-ভোজন [৯] দুর্গাপূজার তিন দিন ও কালীপূজার রাত্রে ঘটিত, গৃহস্থ-ঘরে মৎস্যেরও ঢালাও বন্দোবস্ত থাকে না। আর সে সময়ে কাঁটার ভয়ে ওদিকে বড় ঘেঁসিতাম না (অবশ্য গলদা চিংড়ি বাদে)। ভরশা ছিল ডা'ল ভাত ভাতেপোড়া ভাজা ও হাবজা-গোবজা তরকারী—আর অবশ্য দুধ দই ও ভাতের পাতে ঘী। তরকারী তখনকার কালে পছন্দ করিতাম না, ভাজা ও ডা'ল দিয়াই ঠাসা এক থালা ভাত উঠিত। ভাজার মধ্যে প্রিয় ছিল বিলাতী কুমড়া-ভাজা—[১০] ২০।২৫ খানা। অর্দ্ধাঙ্গিনীর মুখে শুনি, এক দিন নাকি গোটা একটা বিলাতী কুমড়া শেষ করিয়াছিলাম। বোধ হয়, কুমড়টাও ছোট ছিল এবং কথাটাও একটু বাড়ান। ডা'লটা খাইতাম

---

(৯) সেই 'স্থূলং স্বল্পং ছাগমাংসং' পরিমাণে বাড়াইবার জন্য তাহার সহিত ছোলা-ভিজা দেওয়া হইত। আমার অনেক দিন পর্যান্ত ধারণা ছিল, ছাগশিশু বলিদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ছোলা-ভিজা খাইয়াছিল, তাহাই তাহার পাকস্থলীতে অবিকৃত ছিল, মাংসের সঙ্গে রান্না হইয়াছে !

(১০) বিলাতী কুমড়ার প্রতি এতটা প্রীতি বোধ হয় ইহার মিষ্টতার জন্য। (বরিশালে এই জন্য ইহাকে 'মিঠা কুমার' বলে।) যেমন মধুর অনুকল্প গুড়, তেমনি নিত্য আহারে সন্দেশের অনুকল্প, এই কুমড়া-ভাজা ছিল।

অতিরিক্ত, বড় বাটির ভরা এক বাটি। (প্রোটিডের পক্ষপাতিগণ কথাটা লক্ষ্য করিবেন।) এখনও ডা'লে অনুরাগ অটুট আছে, তবে বয়সের (inverse ratio) বিপরীত-অনুপাতে একসেরা বাটির বদলে পোয়াভর পেয়ালার চল হইয়াছে। রোগমুক্তির প্রথম অবস্থায় ডাক্তার বাবু সামান্ত পরিমাণে ডালের যূষ ব্যবস্থা করায় মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। যাক্, এখন আর সে নিক্তির ওজন ও 'জলবৎ তরলম্' নাই। ডালের মধ্যে বিউলি, ভাজা-কলাই ও ভাজা অরহর অতি প্রিয় ছিল। প্রথমটির 'সহযোগেন অন্নঃ চলতি পঙ্কবৎ'; দ্বিতীয়টিতে মূলা ও তৃতীয়টিতে কাঁঠালবীচি পড়িলে আরও মজিত। সোণামুগের অঞ্চলের লোক হইলেও বহুকাল মুগের ডালে অরুচি ছিল। পাঠক হয় তো বলিয়া বসিবেন—সোণামুগ ফেলিয়া কালো কলাইএর প্রতি টান সবর্ণপ্রীতির প্রমাণ। কিন্তু প্রকৃত কারণটি তাহা অপেক্ষাও হাস্তকর। যখন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতাম, তখন ঔষধের ব্যবস্থা হইত—ক্যাষ্টর্অয়েল্ ও কুইনিন্, আর পথ্যের ব্যবস্থা হইত—সাগু মিছরি ও ফুল্কো রুটি, পল্তাসুক্ত, মুগের ডালের যূষ। ঔষধপথ্য সব কয়টিকেই এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছিলাম, তাই অভ্যাসদোষে মুগের ডাল রুটি মিছরিতেও পল্তা কুইনিন্ ক্যাষ্টর্অয়েলের স্বাদ-গন্ধ পাইতাম—ফলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ তিনটি খাদ্য দেখিলেই বিতৃষ্ণা জন্মিত; এখন অবশ্য সোণামুগের সুস্বাদের তারিফ করি এবং বৎসর বৎসর দেশ হইতে আমদানী করি; কিন্তু এখনও রুটির উপর সমান নারাজ আছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত, ম্যালেরিয়ার মর্ম্ম না বুঝিলেও, রুটির উপর হাড়ে চটা। ইহা কি (heredity) বংশানুক্রমের দরুণ?

ছাত্রজীবন তখনও শেষ হয় নাই, যৌবনেরও আরম্ভ হয় নাই, এমন সময়ে বিদ্যালাভের জন্য আবার প্রবাসযাত্রা করিতে হইল; এই প্রবাস-কাহিনী বারান্তরে বলিব—পাঠক একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচুন।

ভোজন-সাধন

মধ্যলীলা

(মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩০)

১

নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্কুলে দুই বৎসর পাঠের পর এন্‌ট্র্যান্স্‌ পরীক্ষার বৎসর পিতৃদেব আমাকে গৃহবাস-সুখে বঞ্চিত করিয়া, পাঠের সুব্যবস্থার জন্য জেলার সদরে, গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরে চালান দিলেন। শান্তিময় পল্লীজীবন হইতে, খাদ্যসুখময় গৃহস্থ-ঘরে বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহরে ছাত্রাবাসে বাস করিতে সুরু করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তথায় এক জন আত্মীয় বাস করিতেন, সুতরাং একেবারে নির্ব্বান্ধব পুরীতে নির্ব্বাসিত হই নাই। আত্মীয়টি (এক্ষণে পরলোকগত) অভিভাবকস্থানীয় হইলেন। তিনিও ছাত্র ছিলেন, তবে সম্পর্কে না হইলেও বয়সে বড় ছিলেন এবং দুই ক্ল্যাস্‌ উপরেও পড়িতেন—অর্থাৎ আমি সেবার এন্‌ট্র্যান্স্‌ দিব, আর তিনি এফ্‌ এ দিবেন। শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার ও তাঁহার ২।১ জন সহপাঠীর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

কিন্তু গৃহবাস ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে লাভবান্‌ হইলেও ভোজনের ক্ষেত্রে খুবই লোকসান হইল। আদ্যলীলায় (৮০ পৃঃ) বলিয়াছি, আমার অভ্যস্ত খাদ্য ছিল ডাল আর ভাজা ; মেসে ভাজার রেওয়াজ বড় একটা ছিল না, যাহা ছিল, তাহাও তৈলের কেফায়ত (বা আত্মসাৎ) করিবার দরুণ 'ঠাকুর' 'কথু কথু' রাখিত, কাঁচাটে গন্ধ ছাড়িত ; আর ডালে না কুলাইবার আশঙ্কায় অজস্র জল বা কেন ঢালিত ('যতই ঢালিবে জল

তত যা’বে বেড়ে’ !), সুতরাং নিতান্ত বিস্বাদ লাগিত। তরকারী খাওয়া অভ্যাস ছিল না (আত্মলীলায় বলিয়াছি), এখন তো ‘ঠাকুরে’র রান্না ঘাঁট একেবারে মুখে করা যাইত না। (তবু বাঁকুড়ার ব্রাহ্মণ, উৎকল বা হিন্দুস্থানী ‘মহারাজ’ তখনও বিরাজ করেন নাই।) দায়ে পড়িয়া তাহাই কাযচলা-গোছ অভ্যস্ত হইল। গৃহে থাকিতে ঠাকুরমার সিদ্ধ হস্তের পাক নিরামিষ ব্যঞ্জনের অপমান করিতাম, এক দিকে ঠেলিয়া রাখিতাম, সে অপরাধের শাস্তি খুবই হইল।

যাহা হউক, এই পরিবর্ত্তনে একটা সুফল ফলিল। (ভগবান্ যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন।) ছুটীতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলে মুখ বদলানর আশায় আগ্রহ করিয়া শাক সুক্ত ঘণ্ট ছেঁচকি চর্চ্চড়ী খাইতে আরম্ভ করিলাম; ক্রমে মধ্যবিত্ত সংসারের, সস্তায় অথচ নৈপুণ্যের সহিত প্রস্তুত, কচুর শাক, পালংশাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, লাউএর ঘণ্ট প্রভৃতি ‘বাজে তরকারী’র স্বাদ গ্রহণ করিতে শিখিলাম। সে অপূর্ব্ব আস্বাদন আর কখনও ভুলিতে পারি নাই। মৎস্যপ্রিয় হইলেও, সেই অবধি বিধবার খাদ্যেরও অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছি। এখন তো পরিণত বয়সে উচ্ছে-চর্চ্চড়ী, উচ্ছের ঝোল, পল্‌তার ঝোল, পল্‌তা-বেগুন (পল্‌তার বড়ার তো কথাই নাই), এমন কি, নিম-বেগুন, নিম-ছেঁচকি, নিমঝোল প্রভৃতি তিক্তস্বাদ তরকারী অমৃতবোধে আহার করি। যে দিন ডাঁটা না চিবাই (তা’ সজ্‌না নাজ্‌না পুঁই লাউ কুমড়া পালংগোড়া নটেশাকের গোড়া এবং সবার সেরা কাটোয়ার ডেঙ্গো ডাঁটা, যে কোনটাই হউক না কেন?) সে দিন তো মনে হয়, খাওয়াই হইল না; রোমের পরহিতব্রত সম্রাটের মত বলিতে ইচ্ছা হয়, (‘I have lost a day’) ‘একটা দিনই মাটী হইল’! ‘তদ্দিনং দুর্দ্দিনং ব্রূহি (ব্রূমো) মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্।’ এমন এক সময় ছিল, যখন মাছের

ঝোলে বা ঝালের ঝোলে লাউডগা বা সজ্না-খাড়া দিলে চটিয়া যাইতাম, গৃহিণীকে টিট্‌কারী দিতাম, আর এখন বাজার হইতে চাকরে আনিতে ভুলিলে স্বহস্তে এই দুই মহাদ্রব্য বহিয়া আনি, এ দৃশ্য হয় তো পাঠক-দিগের কাহারও না কাহারও নজরে পড়িয়াছে। (যে দিন সন্দেশের ঠোঙ্গা আনি, সে দিন কিন্তু কাহারও নজরে পড়ে না!)

সেই নিরামিষ ব্যঞ্জনে নব অনুরাগের দিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠকবর্গ হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। একবার এইরূপ ছুটীতে গ্রামে গিয়া নিমন্ত্রণের আসরে কচুর শাক রুচিকর হওয়াতে এত খাইয়া ফেলিয়াছিলাম যে, শেষে মাছ-মাংস পায়েস সন্দেশ ছুঁইতে পারিলাম না, বর্দ্ধমান হইতে আমদানী মিহিদানার একটি দানাও দাঁতে কাটিলাম না। 'What a paradise lost was here!' (ছাঁদা বাঁধার কাযটাও ইংরেজী শিখিয়া চক্ষুলজ্জায় করিতে পারি নাই।)

যাক্, কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি, আবার সেই মেসের জীবনের কথাই বলি। বিস্বাদ ডাল-তরকারীতে ও সহর যায়গার গয়লার রোজের আধসের দুধে (?) উদরপূর্ত্তি হইত না, সুতরাং খালিপেট ভর্ত্তি করিবার জন্য জলখাবারের উপর দিয়া ক্ষতিপূরণের ইচ্ছা হইত। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হওয়া কঠিন; পিতৃদেব সামান্য বেতন হইতে সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ দিতেন, তাহাতে বাহুল্য-খরচ চলিত না। ভাগ্যে তখনকার দিনে ৫৲।৮৲ টাকাতেই মেস্-খরচা কুলাইয়া যাইত, সেই রক্ষা। এ অবস্থায় জলখাবারের 'খাতে' বেশী পয়সা ফেলা সম্ভব ছিল না; অভিভাবক মহাশয় এক আনা রেট্ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। চারি পয়সায় মুড়িমুড়কি এক কোঁচোড় হয়, তাহাতে পেটও ভরে, কিন্তু নূতন নূতন সহরবাসী হইয়া মুড়ি চিবান অসভ্যতা মনে করিতাম; অথচ সন্দেশেও পড়তা পড়ে অনেক; অগত্যা বাধ্য হইয়া রফা

করিলাম—জিলাপী ও জিবেগজা জলখাবারে। ('জ'কারের জয়-জয়কার!) শুভাদৃষ্টবশতঃ মেসের সাম্‌নেই রাখাল ময়রার দোকান; অপরাহ্ণ চারিটা ছিল মৌতাতের সময়; সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যেই রসের খোলায় গরম গরম জিবেগজা বা জিলাপী ফেলা দেখিতাম, অমনি তামার চারিটি চাক্‌তী লইয়া (আনির তখনও জন্ম হয় নাই) একছুটে ও এক 'ছিটে' দোকানে হাজির হইতাম ও সেখানে বসিয়াই তখনকার মত জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া বাসায় আসিয়া জল খাইতাম।

বৎসর না ঘুরিতেই ভাগ্যদেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মা-সরস্বতীর কৃপায় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ্‌ হইলাম। (এখনকার মত তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বিভাগে পাশের সদাব্রত খোলেন নাই, সুতরাং) মা-লক্ষ্মীরও দয়া হইল, পরীক্ষায় বৃত্তি পাইলাম। অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘুচিল, পিতৃদেবের কষ্টার্জ্জিত অল্প আয়ের উপর আর শিক্ষাকর (Education cess) বসাইবার প্রয়োজন হইল না। উক্ত সহরেই এফ্‌.এ পড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম। স্কুল্‌ হইতে কলেজে উন্নীত হইলাম, মেস্‌ হইতেও কলেজ্‌ হোষ্টেলে উন্নীত হইলাম। সেখানেও চার্জ্জ্‌ (থাকা ও খাওয়ার খরচা) বেশী নহে, নীচে-তালায় ৫৲, উপর-তালায় ৬৲; মেসে ছিলাম একতালায়, এখানে দোতালা বাড়ী পাইয়া দোতালায় প্রোমোশান্‌ লইলাম; কলেজের পড়া—একতালায় চলিবে কেন? জলখাবারের হারও সমানুপাতে বাড়িয়া গেল—'কোম্পানী'র পয়সায় আবার দরদ কি? বিশেষ, কলেজের পড়া কি চারি পয়সার খোরাকে চলে? চারি পয়সার যায়গায় অনেক দিনই লোভে পড়িয়া, অথবা পাল্লা দেওয়ার ঝোঁকে, চারি আনা পড়িয়া যাইত। একেবারে চতুর্গুণ বা ডবল প্রোমোশান্‌! তা', বৃত্তির ডাক-নাম যখন জলপানি, তখন টাকাটা জলখাবারে খরচ

করাই ইহার ন্যায্য ব্যবহার (legitimate use) এবং চরম সার্থকতা নহে কি ? [১]

দুই জন খাবারওয়ালা (caterer) হোষ্টেলে খাবার সরবরাহ করিত। এক জন হালুইকর ব্রাহ্মণ—চেহারায় চাণক্যের দোয়ার, কিন্তু তাহার প্রস্তুত বড় বড় কচুরি, আলুর দম, মোহনভোগ 'অমৃত সমান' ছিল,--কাশীদাসী মহাভারতও তাহার কাছে লাগে না। সেগুলির বর্ণ—বিক্রেতার (তথা ক্রেতার) বর্ণেরই এ পিঠ ও পিঠ, কিন্তু স্বাদ অতি সুন্দর ছিল। কালো যে ভালো হইতে পারে, তাহার প্রমাণ এই প্রথম পাইলাম। তাহার পর, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ অনেকের প্রস্তুত, অন্যে পরে কা কথা, ব্রাহ্মণীর শ্রীহস্তে প্রস্তুত উক্ত খাদ্যত্রয় খাইয়াছি—কিন্তু তেমন সু-তার পাই নাই। জানি না, সেই বয়ঃসন্ধিকালের ক্ষুধার চোটে সুধাসম লাগিত, কি প্রকৃতই যত্ন ঠাকুরের হাতের বা হাতার গুণ ছিল।

দ্বিতীয় খাবারওয়ালাটি ছিল জাতে ময়রা, নামে রসময়, শুধু নামে কেন, কাযেও তাই। লাহা-কবির কবিতার বিমল সৌন্দর্য্যও এই মোদক-নন্দনের ধবধবে রসগোল্লা ও 'বাদামে' গোল্লার নিকট নিষ্প্রভ, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব ; তাহাতে বন্ধুবর রাগই করুন আর দুঃখই করুন। আর সেই নিটোল রসগোল্লার তীব্র মাধুর্য্য 'গীতগোবিন্দে'র কবিরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিত! ('সাধ্বী মাধ্বীকচিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি' ইত্যাদি শ্লোক স্মর্ত্তব্য।) [২] অতি আগ্রহে, অতি

---

(১) 'খাবারে' খরচ না করিয়া (scholarship অর্থাৎ) বিত্তার বহর বাড়াইবার জন্য কলারশিপের টাকা কতকগুলো বাজে বই কিনিয়া অপব্যয় করা টাকাটা জলে ফেলা নহে কি ? 'কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল !'

(২) 'গীতগোবিন্দে'র বাঙ্গালা পয়ারছন্দে অনুবাদক বলিয়া ৺রসময় দাসের নাম

আরামে, টপাটপ একটির পর একটি মুখবিবরে নিক্ষেপ করিতাম; পাল্লার পাল্লায় পড়িয়া প্রায় প্রতিদিনই বেচারার (?) বড় বারকোষখানি খালি হইত। শেষে এমন হইল, রসদদার আর রোজ রোজ এই হাতীর খোরাক যোগান দিয়া উঠিতে পারিল না, ফৌত হইল। (ফৌত হওয়ার অবান্তর কোনও কারণ ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে গবেষণা করি নাই।)

আম-কাঁঠালের সময় ছুটী থাকিত, তবে তখনকার গ্রীষ্মের ছুটী (Summer Vacation) শুধু মাসব্যাপী ছিল, এখনকার মত অফুরন্ত (আষাঢ়ান্ত [৩] দিনের ন্যায়) ছিল না, আবার শীতকালেও বড়দিন-উপলক্ষে মাসব্যাপী ছুটী (Winter Vacation) হইত। শীতের ছুটীটা বেশ কাযে লাগিত; পল্লীগৃহে গিয়া খেজুর-রস, নলেন-গুড়, 'তাত-রসা' দিয়া চালতার অম্বল ও পায়স, এবং খেজুর-গুড় অনুপান-সহ পৌষ-পার্ব্বণের পিঠেপুলিতে পেট ভরাইবার সুযোগ-সুবিধা ঘটিত। একাসনে বসিয়া আঠারোখানি সরুচাকুলি উদরসাৎ করিয়াছি, বেশ মনে পড়ে; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 'জায়'ও ছিল। এখন 'স্বপনের মত বোধ হয়' 'অত্যাচার যত।' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে হরদম আম-কাঁঠাল চলিত; তবে কাঁঠালের মরসুম না ফুরাইতেই ছুটী ফুরাইত (তখনকার গ্রীষ্মের ছুটী-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-ছত্রটি প্রযুজ্য—'কোনও সুখ

শুনা যায়। ইনিই কি জন্মান্তরে হালের কবি রসময় লাহার কায়গ্রহণ করিয়াছেন এবং ক্রমবিকাশবশতঃ অনুবাদের উপর এক ধাপ উঠিয়া সুমিষ্ট মৌলিক কবিতা লিখিবার শক্তিলাভ করিয়াছেন?

(৩) আষাঢ়ান্তই বা বলি কেন? ক্রমোন্নতিতে গ্রীষ্মাবকাশ শ্রাবণান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বাহির হইতে বৎসর বৎসর যেরূপ অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে, তাহাতে শীঘ্রই বাধ্য হইয়া 'ভাদ্রান্ত' করিতে হইবে, এরূপ ভরসাও হয়।

ফুরাই নি যা'র তা'র কেন জীবন ফুরায় ?') এই যা' একটু খুঁতে মনটা খুঁত খুঁত করিত। যাহা হউক, জনার্দ্দন সে খুঁতটুকুও ঘুচাইয়া জীবনটা নিখুঁত করিয়াছিলেন। কলেজে পাঠের সময় নবাগত সতীর্থ ও সুহৃদ্ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী (কর্ম্মজীবনে রীপন্‌কলেজ্-স্কুলের হেড্ মাষ্টার্ হইয়াছিলেন—এক্ষণে পরলোকগত,) যে বাসায় থাকিতেন, সেখানে একটি কাঁঠাল-গাছ ছিল, তাহাতে বিস্তর রসাল কাঁঠাল ফলিত; (আহা, পাকা কাঁঠালের কথা মনে পড়িলেই তাঁহার জন্য শোক নবীভূত হয়।) আমার পনস-প্রিয়তার [৪] কথা জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে ফ্রী সীজ্‌ন্-টিকিট্ দিলেন অর্থাৎ সমস্ত মরসুমের সময়টা পাকা কাঁঠাল-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিলেন। যে দিনই কাঁঠাল পাকিত, সেই দিনই কলেজে আসিয়া তিনি সুসমাচার দিতেন, আমিও কলেজের পরে হোষ্টেলে না ফিরিয়া বরাবর তথায় গিয়া বন্ধুর মান তথা নিমন্ত্রণের মর্য্যাদা সুচারুরূপে রক্ষা করিতাম। 'সুচারুরূপে' বলিলাম, জানি না, ইহাতে অত্যুক্তি হইল কি না—কেন না, কোনও দিনই আধখানার বেশী গোটা একটা কাঁঠাল খাইয়া উঠিতে পারি নাই।

দুঃখের বিষয়, চাকরী-জীবনে কলিকাতা-বাসের আরম্ভকালে (তখনও অগ্নির তেজ যথেষ্ট ছিল) কাঁঠালে হঠাৎ বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল—বোধ হয়, সহরের বাতাস লাগিয়া; অথচ তখন গ্রীষ্মের লম্বা ছুটী দেশের বাটীতেই কাটাইতাম। এখন সে বৈরাগ্যের ভাব কাটিয়াছে, কিন্তু দেশে যাওয়ার 'পাট' উঠিয়াছে। কলিকাতায় মূল্যও বেজায়, আবার দেশ হইতে আনাইলে রেল্‌ভাড়া, মুটেভাড়া দিয়া খরচা পোষায় না, 'ঢাকের কড়িতে মনসা বিকাইয়া' যায়; সুতরাং এখন যে আর পেটে সহে না, সেটা

---

(৪) লেখকের কাঁঠাল-প্রীতির ফলেই কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকা-সমালোচনায় ঝোঁক, একজন সুরসিক বন্ধুর এইরূপ অনুমান!

'শাপে বর,' 'blessing in disguise,' 'অনুকূলঃ খলু গলহস্তঃ' বলিতে হইবে। ('God tempers the wind to the shorn lamb !')

৩

তাহার পর এফ্ এ পরীক্ষায় (আমার মত দরিদ্রসন্তানের পক্ষে) মবলগ টাকা স্কলার্‌শিপ্ পাইয়া কলিকাতায় বি এ পড়িতে আসিলাম ; ব্যয় বাড়িল বটে, কিন্তু আয়ও তেমনি বাড়িল, সুতরাং 'হরে দরে হাঁটু জল' দাঁড়াইল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি না হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে ভর্ত্তি হইলাম—তাহাতে খরচার বেশ একটু সাশ্রয় হইল। ওদিকে খরচা কমাতে জলখাবারের 'খাতে' বজেট্ বাড়াইতেও সমর্থ হইলাম।

কৃষ্ণনগরে দুইজন বাঁধা খাবারওয়ালা (caterer) খাবার যোগাইত, এখানে অবস্থার উন্নতির সহিত আরও এক জন বাড়িল। প্রথম ব্যক্তি রাঢ়ের লোক, জাতে আগুরী, জোয়ান পুরুষ, মসীকৃষ্ণবর্ণ, লোকটি সংবৎসর 'খাবার' বেচিয়া 'দেশে' দুর্গোৎসব করিত, শুনিয়াছি। দ্বিতীয়টি বৃদ্ধ, যশোর জেলায় বাড়ী, মাথায় টাক (ক্ষীর-মোহনের থালা বহিয়া বহিয়া ?), যোড়াসাঁকোর ক্ষীরমোহন বেচিত। ইহাই এখানে রসময়ের রসগোল্লার স্থান অধিকার করিয়াছিল। এক গণ্ডা তো রোজই উঠিত, যে দিন পাল্লা চলিত, সে দিন 'গণ্ডা চ গণ্ডা' উড়িত। কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যেও এই অতিরিক্ত মিষ্ট-ভক্ষণে অম্ল-উদ্‌গার যে কি বস্তু, তাহা কোনও দিন জানিতে পারি নাই। এখনকার কালে দুই আনার এমন কি, চারি আনার 'রাজভোগ' চলিয়াছে, কিন্তু এ সব সেই এক আনা দামের ক্ষীরমোহনের কাছে লাগে না, ইহা জোর গলায় বলিতে পারি।

তৃতীয় জন হিন্দুস্থানী, পৈতাধারী (সেই ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুস্থানী বাঙ্গালায় ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়াছে)। লোকটি আজও বাঁচিয়া আছে, সম্প্রতি

পাশের বাড়ীতে খাবার যোগায় এবং এই পুরাতন মুরুব্বির আর সে উদারতা ও উদরপরায়ণতার পরিচয় পায় না বলিয়া মদীয় গৃহিণী ও পুত্রকন্যাদিগের নিকট আক্ষেপ করে।

প্রকৃত বিষয়ী লোক যেমন বাঁধা মাহিয়ানায় সন্তুষ্ট থাকে না, কিঞ্চিৎ 'উপরি'র চেষ্টা করে, তেমনি আমরাও বাঁধা খাবারওয়ালার রোজকার খরিদদার হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি নাই, মধ্যে মধ্যে দোকান হইতেও 'খাবার' আনাইতাম। হাড়কাটা গলির [৫] (এখন এই অংশের নাম হইয়াছে প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্) ক্ষীরের ছোট ছোট বরফী বড়ই উপাদেয় লাগিত। তখন তো আর আজিমগঞ্জের বরফীর বা কাশীর কালাকাঁদের স্বাদ পাই নাই। সুতরাং ইহাকেই বরফীর সেরা ভাবিতাম। 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।'

বরফীর কথায় কুলপী-বরফের কথা মনে পড়িল। এই প্রাণঠাণ্ডা-করা জিনিশটি যোগাইত মহেন্দ্র দত্ত, জাতিতে কায়স্থ, নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। তাহার হাতের তৈয়ারী মালাই, কমলালেবু ও আনারসের কুলপী খাইয়া সাহেব-লোক পর্য্যন্ত তারিফ করিত। মিষ্টান্নপ্রিয় আমরা রকমারির জন্য রসগোল্লা ও পানতোয়ার কুলপী পর্য্যন্ত করাইয়া খাইয়াছি। মহেন্দ্র এখন বৃদ্ধ হইয়াছে; জানি না, আজও মেসে হোষ্টেলে যোগান দেয় কি না।

---

(৫) আমাদের বাসা ছিল এই গলির পার্শ্বস্থিত গলিতে; তখন সেই গলির নাম ছিল পঞ্চাননতলা লেন্। পরে তাহার নাম (বা ভোল) বদলাইয়া হইয়াছিল ক্যাথিড্র্যাল্ মিশান্ লেন্। ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে ইহাই সম্ভব; শুধু মানুষ কেন, মানুষের আবাসপল্লীও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়! অধুনা ইহার নাম হইয়াছে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্। জানি না, ইহা এই পরাধীন জাতির স্বরাজলাভের সূচনা কি না? এখনও মামুলি অভ্যাসবশে এই গলিতে পূর্ব্বাবাসগৃহের আশে পাশে প্রেতাত্মার মত ঘুরিয়া বেড়াইবার ঝোঁক আছে।

কলিকাতায় চাকরীর জীবনেও কিছুদিন তাহার সহিত পূর্ব্ব খাতির ঝালাইয়াছিলাম, কিন্তু শেষটা দেখিলাম, ব্যাপার কিছু ঘন, পুত্রকন্যা-সকলের তৃপ্তিসাধন করিতে হইলে বিস্তর ব্যয় পড়ে। সুতরাং বেশী দিন খাতির রাখা চলিল না। শাস্ত্রেও আছে, 'ত্যাগাৎ পরতরং নহি।'

আমরা যে মেসে থাকিতাম, তথায় সকলেই নদীয়া জেলার লোক, এবং দু'এক জন ছাড়া সকলেই ব্রাহ্মণ। প্রিয়দর্শন উদারচরিত সহপাঠী বন্ধুবর লালগোপাল চক্রবর্ত্তী, ডাকনাম ছিল 'লালগোলাপ' বা শুধু 'গোলাপ', (কর্ম্মজীবনে খ্যাতনামা প্রোফেসার,—এক্ষণে পরলোক-গত।) বলিতেন, 'উহাদিগকে আমরা ব্রাহ্মণ করিয়া লইয়াছি।' মেসের নাম রাখা হইয়াছিল—'নদীয়া ব্রাহ্মণিক্যাল্ ক্লাব্'। মেসের রান্না মন্দ ছিল না; মন্দ না হইবারই কথা, কারণ, বামুন ঠাকুর না রাখিয়া বামুন ঠাকরুণ রাখা হইয়াছিল। প্রবীণবয়স্কা পতিগৃহবঞ্চিতা কুলীনপত্নী সধবা 'সুরেনের মা' আমাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে খাওয়াইত। তথাপি 'বামনী' যে দিন শরীরগতিকে আসিতে অশক্ত হইত, সে দিন রান্না বন্ধ থাকিত না, বরং আহারের বেশ একটু ঘটা হইত, কেন না, বন্ধুবর লালগোপাল ও অপর এক জন ৬ (তিনিও এক্ষণে পরলোকগত) রন্ধনপটু ছিলেন, পরম উৎসাহে মৎস্য-মাংসাদি পাক করিতেন, অন্য সকলে 'যোগাড়' দিত। আমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ও অপটু ছিলাম, তাই আমার উপর কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যের ভার পড়িত না। আমি ছিলাম

---

(৬) এই ভদ্রলোকটি যৌবনেই বিলক্ষণ স্থূলকায় ছিলেন; মধ্যে মধ্যে ধনিগৃহিণী শাশুড়ীর বাড়ী হইতে জামাই-আদরে আহারাদি সমাধা করিয়া সপ্তাহান্তে মেসে ফিরিলে ধোপাবাড়ীর ফেরত জামা গায়ে আঁটিত না, বলিতেন, 'ধোপা জামা বদলাইয়া দিয়াছে।' কি ভাগ্যে (Dumas এর "Chicot the Jester" নভেলে Father Gorenflot এর ন্যায়) বাসাবাড়ীর সিঁড়ি সরু হইয়াছে বলেন নাই।

চাখনদার (Taster), নুন-ঝাল সমান হইয়াছে কি না, চাখিয়া দেখিয়া রিপোর্ট্ দিতাম। অবশ্য মূলা-ষষ্ঠীর 'কথা'র দাসীর মত চাখিতে চাখিতেই হাঁড়ী-কড়া সাবাড় করিতাম না। তবে এক রাত্রে (বন্ধুবরের অনুপস্থিতিতে) অপর ভদ্রলোকটি (তিনি রন্ধন ও ভোজন উভয় কার্য্যেই বৃকোদর-সদৃশ ছিলেন) ও তাঁহার এই সহকারী উভয়ের সমবেত চেষ্টায় ইলিশমাছ-ভাজা চাখিতে চাখিতে থালাকে থালা পার হইয়াছিল—শেষে বিড়ালের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাফাই দেওয়া গেল।

এই তো গেল রন্ধনশালার লীলা! আবার শয়ন-মন্দিরেও একটি অদ্ভুত কাণ্ড করা গিয়াছিল। পরীক্ষার সম-সম-কালে সমপাঠী সুহৃদ্ লালগোপালের সহিত রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস চালাইয়া উভয়েরই উৎকট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল—মস্তিষ্ক-চালনার ফলে বালাম চা'লের ভাত বেমালুম হজম হইয়া গিয়াছিল। অথচ ভাণ্ডারে খাদ্যদ্রব্য এক কণাও সঞ্চিত ছিল না। উপায় কি? উপস্থিতবুদ্ধি বন্ধুবর উপস্থিত অন্য কিছু না পাইয়া বিশ্রব্ধভাবে নিদ্রিত অপর একটি সমপাঠী সুহৃদের (শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, কর্ম্মজীবনে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি পেন্‌শান্ লইয়াছেন) মল্ট্ এক্‌স্ট্র্যাক্টের পূরা শিশিটি উত্তরসাধকের সাহায্যে (একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব সহায়!) খালি করিলেন—ভাগ্যে তাহার সহিত কড্‌লিভার্ অয়েল্ মিশ্রিত ছিল না! শাস্ত্রে বলে 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ'—আমরা তাহার অনুবৃত্তি করিলাম, 'গুড়াভাবে মল্টম্ অদ্যাৎ'! তাড়াতাড়ি বা কাড়াকাড়ি বা আগ্রহের বাড়াবাড়িতে শেষটা শিশি ভাঙ্গিয়া গেল; ভালই হইল, এবারও বিড়ালের উপর দোষ চাপান গেল [১] এবং 'বিড়ালের ভাগ্যে ('শিকা

---

(১) বারে বারে বিড়ালের উপর পাপ চাপাইয়া (scape-goat নহে, scape-cat!) অপরাধী হইয়াছি। এজন্ত অপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র-পাঠের প্রয়োজন। তিন

ছিঁড়িয়াছে’ নহে) শিশি ভাঙ্গিয়াছে’ বলিয়া পরদিন প্রাতে শিশির মালিকের কোপবহ্নি তরল হাসির তরঙ্গে নির্ব্বাপিত করা গেল। পাঠকবর্গ অবশ্যই এই যুগলরত্নের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের তারিফ করিবেন।

এইবার, বন্ধুবরের সঙ্গে একটি সতীর্থের গৃহে নিমন্ত্রণ খাওয়ার কথা বলিয়া বি এ পড়ার ইতিহাস শেষ করি। (ইনিও এক্ষণে পরলোকগত।) সতীর্থটি খাস কল্‌কাত্তাই, সন্ধ্যার পর আম খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকে গণ্ডা দুই তিন আম খাইয়া ব্যালাষ্ট্‌ বোঝাই দেওয়া গেল (বোম্বাই, লেঙ্গ্‌ড়া প্রভৃতি মহার্ঘ্য আম অবশ্য আর অধিক আশা করা যায় না)। তাহার পর খানকতক ফুলকা লুচি ও পটোলভাজার এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নের আয়োজন ছিল। (ফল খাইয়া জল খাইতে নাই—অনুপ্রাসের খাতিরেও নহে।) কিন্তু কলিকাতাবাসী সতীর্থের এষ্টিমেটের চতুর্গুণ চক্ষের নিমেষে নিঃশেষ করাতে পরিবারস্থ সকলের রাত্রের খোরাক যে ময়দা মাখা ছিল, তাহা সবই ফুরাইল। আবার নূতন করিয়া ময়দা মাখিতে (বাজার হইতে আনিতে ?) হইল। মুখ কামাই দিলে নিমন্ত্রয়িতা অপ্রস্তুত হইবেন বলিয়া দ্বিরের

বৎসরের দৌহিত্রী তিন মাসের একটি বিড়ালছানা আঁস্তাকুড় হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল। সেইটিকে এই ছয় বৎসর সযত্নে মাছ-দুধ খাওয়াইয়া পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। মাছের বদলে মাছ, আর মণ্টের বদলে দুধ—তা' মণ্ট্‌ তো দুধ দিয়াই খায়। (Cowper) কুপারের মত কবিত্বশক্তি নাই, তাই কবিতা লিখিয়া ইহার গুণগান করিতে পারিলাম না। বিড়ালটির নাম ভূতো, (ভূতী ব্যাকরণসম্মত, যেহেতু এটি মেনি-বিড়াল,) কিন্তু ঠিক কৃষ্ণবর্ণ নহে, বাঘের মত চিত্রবিচিত্র, দেখিলেই ‘বাঘের মাসী’ বলিয়া চেনা যায়! [আজ সেই দৌহিত্রীটি পরলোকগত। সেই দুঃখে বিড়ালটিকেও এত বৎসরের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছি। দারুণ হৃদয়হীনতা, সন্দেহ নাই। কিন্তু হৃদয়ের এই কঠোরতা ভগবান্ পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়াই ঘটাইয়াছেন। পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।]

marking timeএর মত শেষের সংস্থান সন্দেশ-রসগোল্লা কয়টা ধীরে-সুস্থে মুখে গুঁজিতে লাগিলাম। তিনি কিন্তু সে জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া আর কখনও আমাদিগকে খাইতে বলেন নাই।

৪

যথাসময়ে উভয় বন্ধুতে সম্মানের সহিত বি এ পাশ হইলাম। এবারও মোটা টাকা জলপানি পাওয়াতে সাবেক চা'ল বজায় রহিল। 'সব ভাল যার শেষ ভাল' এই প্রবাদবাক্যের উপর ভর করিয়া শেষ পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে, (premier) সেরা কলেজে, ভর্ত্তি হইলাম। এম্ এ পড়ার শেষ বৎসর সুহৃদ্‌ভেদ (অবশ্য মর্ম্মান্তিক বা চিরস্থায়ী নহে) এবং মিত্রলাভ উভয়ই ঘটিল। পুরাতন বন্ধু (লাল) গোপালকে ছাড়িয়া নূতন বন্ধু (কালো) রাখালের সহিত মিলিলাম। বর্ণে বর্ণে সমতা হইল! (পূরা নাম রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়। ইনি আমার পর বৎসরে কৃষ্ণনগর কলেজের তথা প্রেসিডেন্সী কলেজের যশস্বী ছাত্র ছিলেন, পরে কর্ম্মজীবনে ক্রমোন্নতিতে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পরলোকগত।) ইঁহাদের মেস্ ছিল বহুবাজারে ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীটে —আড্ডির পুস্তকের দোকানের ঠিক সামনাসামনি। এখানেও সকলে না হইলেও, বোধ হয়, অধিকাংশই নদীয়া জেলার লোক ছিলেন। এই সময়কার ভোজন-বিলাসের বিবরণ দিয়া আর ভিজা কম্বল ভারী করিব না, কেবল দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

প্রথম ঘটনা। উক্ত বন্ধুর বিবাহে (হায়! আজ সে বন্ধু কোথায়?) মুঙ্গেরে বরযাত্রী গিয়া কয়েকজন বন্ধুতে মিলিয়া খুব একটা কীর্ত্তি রাখিয়া আসা গিয়াছিল। স্নানান্তে জলযোগের জন্য মজুত 'খাবার', স্নানের পূর্ব্বেই, চেঙ্গারীকে চেঙ্গারী উজাড় হইয়া গেল। [৮] ইহাকেই বলে

(৮) তখন অবশ্য অস্নাত আহার-রূপ অনাচারে ইতস্ততঃ ছিল না। কিন্তু এখন দুপুর

রন্ধনের চাউল চর্ব্বণে ফুরান! তাহার পর 'কষ্টহারিণী'র ঘাটে আরামে স্নান করিয়া ফিরিয়া জলযোগে গোলযোগ ঘটিল, কেন না, শূন্য ভাণ্ডার; আবার বাদশাহী মেজাজে খাবারের চেঙ্গারীর জন্য জোর তলব করা গেল। আমাদের এই ব্যবহারে কন্যাপক্ষীয়েরা বিষম বিব্রত। একে বরযাত্রীর দল, তাহাতে উদর-সমুদ্রে যৌবনের বাড়বানল, তাহার উপর মুঙ্গেরের আবহাওয়া, আবার সীতাকুণ্ডের জল ও তাহা হইতে প্রস্তুত সোডা-লেমনেড্ খাওয়া—'একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্!' এখন মনে করিতে লজ্জা ও কষ্ট হয়, ভদ্রলোকদিগের সহিত কতই বেয়াদবি করা গিয়াছে। যদি বর্ত্তমান অকিঞ্চিৎকর বিবরণ তাঁহাদিগের কাহারও চোখে পড়ে, এই আশায় তাঁহাদিগের নিকট যৌবনের অপরাধের জন্য সবিনয়ে মার্জ্জনা চাহিতেছি। ভরসা করি, দেনার দায়ের ন্যায়, ক্ষমাভিক্ষা কখনও মিয়াদী সময় ফুরাইলে তামাদি হয় না।

দ্বিতীয় ঘটনা। একবার পাড়ার এক জন বড় লোকের বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তা কি একটা বিভ্রাটে পড়িয়া ব্রাহ্মণ না পাইয়া, 'যজ্ঞি' পণ্ড যাহাতে না হয়, সেই জন্য আমাদের দ্বারস্থ হয়েন; আমরা যৌবনোচিত উদারতা দেখাইয়া সাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং ভোজনকালে নিজেদের মুখের জোরে তাঁহার মুখ রাখিয়াছিলাম। আমাদের পল্টনের রসগোল্লা খাওয়া দেখিয়া (এখনকার অখাদ্য স্পঞ্জ্ রসগোল্লা নহে, আদি ও অকৃত্রিম।) খাস কলিকাতার বাসিন্দা অম্লরোগী ভদ্রলোকগণ তটস্থ হইয়াছিলেন। তবু এ পক্ষ উচিত-মত হাত দেখাইতে পারেন নাই, তাহার

গড়াইয়া গেলেও স্নান না করিলে আহারে রুচি হয় না, খাদ্য গলা দিয়া নামে না! (অসুস্থ অবস্থার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।) তবে প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইবার জন্য চারিখানি চিনির বাতাসা ও একঢোক জল খাইয়া পিত্ত রক্ষা করি। বাতাসা চারিখানি, বোধ হয়, বাল্যের অভ্যস্ত (আত্মলীলা, ৭১ পৃঃ) ষোড়া যোতার সস্তা সংস্করণ।

কারণটা একটু অদ্ভুত রকমের। নিমন্ত্রণক্ষেত্রে আমাদের পংক্তির অদূরে এক ব্যক্তি আহারে বসিয়াছিলেন—দেখিতে অবিকল আমার কৃষ্ণনগরে পড়ার সময়কার হেড্ মাষ্টার্ মহাশয়ের মত। এই হেড্ মাষ্টার্ মহাশয়কে আমি যমের মত—অথবা গুরুমশায়ের মত—ভয় করিতাম, যদিও তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। (এক্ষণে তিনি পরলোকগত [১] — ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।) তাঁহাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া (সম্ভবতঃ ইহা রজ্জুতে সর্পভ্রম) আমার হরিষে বিষাদ ঘটিয়াছিল, সমস্ত স্ফূর্ত্তি একদম মাটী হইয়াছিল। সেই রাত্রের স্ফূর্ত্তিহীনতার সুরের সহিত বর্ত্তমান রোগজীর্ণ অবস্থার সুর মিলাইয়া এবারকার মত পালা সাঙ্গ করিলাম। পাঠকও বোধ হয় এতক্ষণে 'পালাই পালাই' করিতেছেন। বারান্তরে চাকরী-জীবনের ভোজন-লীলার কাহিনী বিবৃত করিব।

---

(১) 'Nothing but songs of death!' এই বিবরণ লিখিতে বসিয়া কতগুলি মৃত্যু-সংবাদ দিলাম, ইহা একটা ভাবিবার বিষয়। হেড্ মাষ্টার্ মহাশয় বার্দ্ধক্যে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু অপর সকলেরই অকালমৃত্যু। লেখক একলা শ্মশান-জাগরণ করিতেছেন। 'আমিই শুধু রইনু বাকি।'

৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (মাতুল মহাশয়)
(৩৫ পৃঃ, ৯৯ পৃঃ, ১৭২ পৃঃ)

ভোজনসাধন

অন্ত্যলীলা

('মাসিক বসুমতী,' বৈশাখ ১৩৩১)

'Fought all his battles o'er again,
And thrice he slew the slain.'

DRYDEN : *Alexander's Feast.*

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বে ছাত্রজীবনের প্রথম কুড়ি বৎসরের ভোজনসাধন-প্রণালীর পরিচয় দিয়াছি। এইবার পঞ্চত্রিংশদ্‌বর্ষব্যাপী দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের ভোজনসাধন-প্রণালীর পরিচয় দিব।

১

বাল্যেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবাসে গিয়াছিলাম; কিন্তু সে বাসগ্রামের নিকটেই এবং সেখানে পরগৃহে নিজগৃহের মত আশ্রয় পাইয়াছিলাম। পঠদ্দশার শেষ কয় বৎসর কলিকাতাবাসী হইয়াছিলাম, কিন্তু বিদেশ হইলেও কিছুদিন বাসের পর কলিকাতা আর প্রবাসভূমি বলিয়া বোধ হইত না, সুহৃৎসতীর্থ-সমাজের সহবাসে সুখে কাল কাটাইতাম।

কিন্তু এইবার প্রকৃতই প্রবাসী হইতে হইল—একেবারে তিনটা জেলা পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল সহরে প্রথম চাকরি যুটিল। তবে ভগবানের কৃপায় সেই 'সূর্য্যি-মামার দেশে'ও আমাদের অঞ্চলের দুই জন ভদ্রলোককে পাইয়াছিলাম; এক জন তথাকার বড় উকীল, অপর জন স্কুলে সহপাঠী ছিলেন। (উভয়েই এক্ষণে পরলোকে।) গ্রহের ফেরে এক বৎসর তথায় স্থিতিকাল—এই এক বৎসরকে 'অজ্ঞাতবাস' বলা যাইতে পারে। কেন না, বালাম চা'ল, মসুর ডা'ল, 'মিঠা কুমার' (বিলাতী কুমড়া)

ও 'পানিকচু' (জলজাত কচু) এই চারি 'পদ,' এবং 'কাঠুয়া'র মাংস (এক প্রকার কচ্ছপ-জাতীয় জীব—আমাদের অঞ্চলের 'কেঠো'?) ছাড়া খাদ্য-বৈচিত্র্য তথায় ছিল না। এই চতুষ্পদ সুদ্ধ ধরিলে অষ্ট'পদ'—বরিশালের উচ্চারণে 'আষ্ট' 'পদ'—(অষ্টাপদ-মৃগবিশেষঃ!)। তাহার উপর ব্যঞ্জন রন্ধনের সুব্যবস্থাও ছিল না। 'খাবার'ও সুবিধামত মিলিত না, নিমন্ত্রণও প্রায় পাওয়া যাইত না (সংবৎসরে দুইটি মাত্র যুটিয়াছিল), পূর্ব্ববঙ্গের রকম-রকম মুখরোচক পিঠে-পুলির স্বাদ লইতে পাই নাই, 'বড় দুখ রহল পরাণে।' ফলতঃ একরকম 'ম'রে আছি' অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। কেবল বিলাতী কুমড়াই চিরপ্রিয় ও চিরপরিচিত স্বজনের মত প্রবাসক্লেশের প্রশমন (কিঞ্চিৎ পরিমাণে) করিয়াছিল।

আদালীলার বিবরণে (৮১ পৃঃ) বলিয়াছি, প্রথমজীবনে ভাজা কলাই ও ভাজা অরহর ডা'লের ভক্ত ছিলাম; পরে অবশ্য সোণামুগের পক্ষপাতী হইয়াছিলাম; বহুদিন পরে ৺কাশী গিয়া ছোলা, মটর, তথা কাঁচা অরহরের স্বাদ বুঝিয়াছি (ডা'ল তিনটি—বিশেষতঃ শেষেরটি সেখানে বেশ সুস্বাদ, ঘৃতসংযুক্ত হইলে তো সোণায় সোহাগা); আর বরিশালে গিয়া, মসূর ডা'লের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি, নতুবা 'মধুসূদন'-নামে পূর্ব্বে বিপত্তিভঞ্জন না হইয়া বিপত্তিবোধ হইত, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'শরীরপালনে' ইহার ভূয়সী প্রশংসা থাকিলেও কোন ক্রমে ইহার অনুরাগী হইতে পারি নাই; কিন্তু বরিশালের মসূর ডা'ল মুগের ডা'লের সহিত প্রায় সমান খুঁটের, বলিয়া না দিলে মুগ বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে, মুগের অভাবে তাহার স্থান পূরণ বেশ করিতে পারে। (আশ্চর্য্যের বিষয়, বরিশালের মসূর ডা'ল 'দেশে' ও কলিকাতায় রাঁধাইয়া দেখিয়াছি, তেমন তারটুকু পাই নাই। ইহাকেই বলে স্থানমাহাত্ম্য!)

আমিষ আহার্য্যটিতে কিন্তু একেবারেই নারাজ ছিলাম। 'দেশে'

থাকিতে ২।১ বার 'উবি'র মাংস পাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু আঁষ্‌টে গন্ধে গলাধঃকরণ করিতে পারি নাই। (উবির মাংসের গোঁড়ারা বলেন, সেটা রন্ধনের দোষ।) বরিশালবাসী শীতকালে উক্ত উভচরের মাংস উপাদেয় বোধে নিত্য উপভোগ করেন, প্রত্যেক বাড়ীর পিছনে কাঠুয়ার খোলার স্তূপাকার পাহাড় দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর হয়, এবং 'যাঁহারা ঋজুপাঠ দু'টি লয়েছেন লুঠি,' তাঁহাদিগকে বককুলীরক-কথার 'অস্থি-পর্ব্বতম্‌' স্মরণ করাইয়া দেয়। যাক্‌, 'ও রস-বঞ্চিত' আমি আহারের কষ্টে এই 'লক্ষ্মীমন্ত' (বালামের) দেশে 'লক্ষ্মীছাড়া' অবস্থায় এক বৎসরের অধিককাল টিকিতে পারি নাই, গ্রীষ্মের ছুটিতে 'দেশে' ফিরিয়া আর 'সেমুখো' হই নাই।

২

গ্রীষ্মের ছুটির পর মাসখানেক বেকার বসিয়া থাকিয়া ('সো বি আচ্ছা') আবার প্রবাসযাত্রা করিলাম—এবার পূর্ব্বে না গিয়া 'পশ্চিমে'—ভাগলপুরে। তবে বেহারে গিয়াও বেঘোরে পড়ি নাই; মাতুল মহাশয় তথাকার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। (১০।১১ বৎসর হইল তাঁহার ৺কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে)। তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য ঘটিল; আবার কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নের প্রথম বৎসরে যিনি অভিভাবকস্থানীয় ছিলেন (মধ্যলীলা ৮২ পৃঃ), তাঁহাকে এখানে কর্ম্মসহচর-রূপে পাইলাম। (মাতুল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা, ৺দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তত্রত্য কলেজ্‌-সংলগ্ন স্কুলের অন্যতম শিক্ষক। এক্ষণে পরলোকগত।)

এমন সুখের মিলনেও সেখানে কিন্তু কার্য্যগতিকে দুই মাসের বেশী তিষ্ঠিতে পারিলাম না। বোধ হয়, সব দিক্‌ দেখিলে সেটা শুভাদৃষ্টই বলিতে হইবে। কেন না, একে যৌবনের জঠরাগ্নি, তাহাতে 'পশ্চিমে'র স্বাস্থ্যকর জলবায়ু—অর্থাৎ অগ্নির সহায় বায়ু; প্রত্যহ কলেজের ফেরতা

বৈকালে দুইটা করিয়া ভুট্টা পোড়াইয়া খাওয়ার পর রাত্রে হিন্দুস্থানী 'মহারাজে'র হাতে গড়া যাঁতার আটার রুটি কুড়িখানা, ঢেঁড়স চর্চ্চরী [১] ও অরহর ডাল দিয়া, সাবাড় করিয়া তাহার উপর দুধে দুই হাতা ভাত লইতে হইত। ফলতঃ, দুই মাসেই আহারের বহর যে রকম বাড়িয়া গেল, তাহাতে অনুমান হয়, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করিলে তো 'মুণ্কে রঘু' হইয়া দাঁড়াইতাম। যাহা হউক, এক বৎসর পূর্ব্বে চাকরিতে প্রবৃত্ত হইবার সময় যে দুই সুট্ পোষাক তৈয়ার করাইয়াছিলাম, সেগুলি না ছিঁড়িতেই ভাগলপুরের বাফ্তার দুই সুট্ পোষাক বড় মাপে তৈয়ার করাইয়া পূর্ব্বপশ্চিম দিগ্বিজয় করিয়া আবার বাঙ্গালা মুল্লুকে ফিরিলাম।

৩

শুধু বাঙ্গালা মুল্লুকে কেন, (বহরমপুরে) একরকম নিজের 'দেশে'ই ফিরিলাম—কেন না, নদীয়া মুর্শিদাবাদ পাশাপাশি জেলা এবং কৃষ্ণনগর হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত একটি বাঁধাসড়ক আছে। [২] তাহা ছাড়া আমাদের অঞ্চলের কয়েক ঘর ভদ্রলোক চাকরি বা ব্যবসায়-সূত্রে এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পাড়ায় বাসা বাঁধাতে যেন নিজের 'দেশে' আছি, এইরূপ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতাম।

---

(১) বর্ষাকালে মৎস্য দুর্লভ ও মহার্ঘ্য, সুতরাং দুইবেলা কুলাইত না। রাত্রে ঢেঁড়স আমিষের স্থলাভিষিক্ত হইত; ইহার ইংরেজী নাম যখন Lady's finger, তখন আমিষ বলিব বৈ কি? (এমন বদখত আনাজের কি মোলায়েম নাম! ইহাই তো প্রকৃত কবিত্ব।)

(২) ছুটিতে ছুটিতে এই বাঁধা সড়ক দিয়া বহুবার গোযানে যাতায়াত করিয়াছি। তাহার স্মৃতি ('ফোয়ারা'র) 'গরুর গাড়ী'তে রক্ষিত হইয়াছে। (সে সময়ে রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ রেল্ওয়ে খোলে নাই।) একবার পূজার সময় গঙ্গায়-গঙ্গায় নৌকাযোগে সপরিবারে দেশে গিয়াছিলাম। সে বড় আনন্দের জলযাত্রা।

তাঁহারাও আমাকে চির-পরিচিতের ন্যায়, পরমাত্মীয়ের ন্যায়, গ্রহণ করিয়াছিলেন (অথচ পূর্ব্বে কখনও আলাপ-পরিচয় ছিল না,) এবং আপদে-বিপদে বুক দিয়া পড়িতেন। ৩ (আজ তাঁহারা প্রায় সকলেই পরলোক-গত।) আবার এখানে একটি পুরাতন সতীর্থ ও সুহৃদ্‌কে ৪ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহার মারফত আরও কয়েকটি বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম।

এখানে তিন বৎসর টিকিয়া ছিলাম। এক কলিকাতায় ভিন্ন আর কোথাও এত দিন থাকা ঘটে নাই। এই তিনটি বৎসর আমার চাকরির জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের দিন ছিল। এইখানে চাকরি-জীবনে প্রথম মাতৃসমা ঠাকুরমাতা ও সংসার-সঙ্গিনীকে আনিয়া ('নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুঃ') প্রবাসকে সুখাবাসে পরিণত করিয়াছিলাম। তখনও সন্তানাদি না হওয়াতে নির্ঝঞ্ঝাট ও সন্তানহানি না হওয়াতে শোকরহিত ছিলাম। এখানে সকল প্রকার খাদ্যই পাওয়া যাইত, অসম্ভব-রকম

---

(৩) বিশেষভাবে বিচক্ষণ ডাক্তার ৺আনন্দলাল গাঙ্গুলীর নিকট বহু উপকার পাইয়াছি। পিতার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান্ প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী এক্ষণে কলিকাতাবাসী, পিতার ব্যবসায় ও সুনাম বজায় রাখিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হইয়া সমাজের সেবা করুন।

(৪) কপালে থাকিলে দূরের গঙ্গাও কাছে আসে। এই প্রবন্ধ যন্ত্রস্থ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেই উল্লিখিত পুরাতন সতীর্থ সুদূর 'পশ্চিম' মুলুক বাঁশবেরিলি হইতে কয়েকদিনের জন্য দেশে আসিয়াছিলেন এবং এই অভাগাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন 'Like angel-visits few and far between' কালে-ভদ্রে ঘটে। [এবার তিন বৎসর পরে সুস্থ-শরীরে খোস-মেজাজে বাহাল-তবিয়তে কাশী-বিশ্বেশ্বর-দর্শনেই ক্ষান্ত হই নাই, হরিদ্বার হৃষীকেশ লছমণঝোলা পর্য্যন্ত 'ধাওয়া' করিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে, ডাকবিভাগের গাফিলিতে একখানি চিঠির গোলযোগে, বেরিলিতে বন্ধুবরের দর্শন-সুখলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। দেখা যাউক, আগামী সনে যদি এই ত্রুটি শোধন করিতে পারি।—পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।]

সস্তাও ছিল (এখন রেলের কল্যাণে সে দিন আর নাই শুনি)। নিজে তো সাগ্রহে ও সানন্দে এই সব আহার্য্যের প্রচুর সদ্ব্যবহার করিতামই, অধিকন্তু নূতন গৃহস্থালী-স্থাপনের উল্লাসে বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পিতামহী দেবীর হাতের পাক নিরামিষ ব্যঞ্জন ও পরমান্ন এবং তাঁহার উপযুক্ত নাতবৌএর হাতের পাক মৎস্য মাংস পোলাও কালিয়া পরিতোষ-পূর্ব্বক থাওয়াইতাম। মাসে একবার করিয়া এই আনন্দের হাট বসিত। আজ সে সব বন্ধুর অনেকেই এ জগতে নাই; বাকী যে ২।১ জন আছেন, তাঁহারাও নানাস্থানী হইয়া পড়িয়াছেন, নিত্যসাক্ষাতের পরিবর্ত্তে বারো মাসে একবার, এমন কি, বারো বৎসরের এক যুগেও একবার দেখা হয় না। পত্রব্যবহার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। থাক্, এ সব বিষাদ-কাহিনী। প্রকৃত অনুসরণ করি।

এই প্রসঙ্গে বহরমপুরের ডাকসাইটে ছানাবড়া ও থাগড়াই মুড়কীর, তথা অদূরবর্ত্তী আজিমগঞ্জের ক্ষীরের বরফীর উল্লেখ না করিলে, নিতান্ত অরসিকের ও অকৃতজ্ঞের কায হইবে। ক্রিয়াকর্ম্মে নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিতে কসুর করি নাই। রাধাবল্লভী লুচি ও হিং দেওয়া তরকারী এখানকার 'বিশেষত্ব'।

৪

'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্'—ইহা হইল সংসারবিরাগী আজীবন-সন্ন্যাসীর উপদেশবাক্য; সংসারী বাল্যবিবাহিত লেখক কি সেই উপদেশ-বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন? একবার কিঞ্চিৎ আর্থিক উন্নতির লোভে, দেবোপম মাতুল মহাশয়ের সামীপ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম, আবার আরও কিঞ্চিৎ লাভের লোভে 'কনকমৃগতৃষ্ণাঙ্কিতধী' হইয়া, বহরম-পুরের পাতান সংসার উঠাইয়া, সাজান বাগান ভাঙ্গিয়া, নিজের অঞ্চল হইতে বহুদূরে 'উত্তরস্যাং দিশি' কুচবিহারে একাকী ট্রেনমারুহ্য উধাও

হইলাম—'পূর্ব্বাপরৌ' অর্থাৎ পূর্ব্বপশ্চিম দিগ্বিজয় হইয়াছিল, এইবার উত্তরদিকে উত্তরণ। অথবা মল্লিনাথের ভাষায় 'ভঙ্গ্যন্তরেণাহ', অঙ্গ-বঙ্গ জয় করিয়া, এবার কলিঙ্গজয়ে না গিয়া, কামরূপ-অভিযান করিলাম। প্রথম নম্বর্, রেল্পথে ২।৩ বার উঠানামা (কামিনী-প্রেমের নহে, কাঞ্চন-প্রেমের তুফানে); তখন রঙ্গপুরের এলাকা পর্য্যন্ত রেল্ওয়ের সীমামুড়া ছিল; তাহার পর নৌকায় দুই দুইটা নদী পার হইয়া (একা নদী বিশ ক্রোশ) ডাঙ্গাপথ কতক টঙ্গায় খাড়া বসিয়া, কতক গরুর গাড়ীতে শয্যাশায়ী হইয়া, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ঠিকানায় পৌছিলাম। বরিশালে যাইতে এক রাত্রি ট্রেনে ও দিনমান ষ্টীমারে কাটাইয়াও এমন 'কাহিল' হই নাই। রেলে যাইতে পথে 'অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্' এই ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া যথাস্থানে যাত্রাভঙ্গ করিয়াছিলাম, সুতরাং বাকী পথটা আরও নীরস, দীর্ঘ ও দুঃখময় লাগিয়াছিল।

যাহা হউক, এ কোণঠেসা অবস্থায় বেশী দিন থাকিতে পারিলাম না। প্রাণটা যেন হাঁফাইয়া উঠিল,—যদিও সেখানকার কলেজে, কলিকাতায় অধ্যয়ন-কালের এক জন সতীর্থ ও বহরমপুর-বাসের সময়কার তথাকার কলেজে এক জন নবলব্ধ বন্ধু (এক্ষণে পরলোকগত) এবং এই দুইজনের সহিত যোগসূত্রে আরও ২।১ জন বন্ধু মিলিয়াছিল। কলেজের বাহিরেও কৃষ্ণনগরের আমলের ২।৩ জন পুরাতন সহপাঠীর পুনর্দর্শন পাইয়াছিলাম। আবার সেখানে অল্পদিন থাকার পর আমাদের অঞ্চলের দুই মূর্ত্তি তথায় চাকরিসূত্রে গিয়া হাজির হইলেন। বেশ গুলজার হইয়া উঠিল। (সুখের বিষয়, ইঁহারা সকলেই বাঁচিয়া আছেন, যদিও কেহ কেহ কুচবিহার ছাড়িয়াছেন।) এততেও কিন্তু মন বসিল না। কেন না, গৃহিনী সে সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিলেও আমার সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এ অবস্থায় শুধু অর্থোন্নতিতে, তথা শেষ বয়সে রাজসরকার

হইতে পেন্‌শানের আশায়ও মন বাঁধিতে পারিলাম না, প্রাণটা কেবলই উড়ু উড়ু করিত।

আসল কথা, খাদ্যসুখ সেখানে সুবিধামত ছিল না—বরিশালেরই গোত্র—তরকারীর মধ্যে গোল আলু ও কাঁকরোল! তোড়সা নদীর টাট্‌কা ইলিশ মাছ একমাত্র উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল, কিন্তু তাহাও কলিকাতার গঙ্গার, এমন কি, আমাদের নদীয়া-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গঙ্গার ইলিশের কাছে লাগে না। অথচ দরে কলিকাতারও উপর এক কাঠী। মিথ্যা বলিব না, দুধ, ঘী ও আতপ চাউল সেখানে উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়? অমন যে সুস্বাদ ও সুগন্ধ আতপান্ন সে সময় গলা দিয়া গলিত না। তাই পত্নীর পিতৃভবনে—রঙ্গপুরে গেলে, অল্পই আহার করিতে পারিতাম, লোকে বুঝিত, জামাইএর লজ্জা বেশী! তখন শ্বশুরালয়ে বেখরচায় পাইয়া আতপান্নের অবজ্ঞা করিয়াছি, আর এখন মূল্য ও রেল্‌-খরচা দিয়া তথা হইতে বৎসর বৎসর আনাইয়া লইতে হয়। বাজারে কৃষ্ণ নগরের এক ঘর ময়রা ছিল বটে, কিন্তু খাবার আনাইয়া লইবার সুবিধা হইত না। পশ্চিমা বামুনের রান্নাতেও আহারের বিড়ম্বনা ঘটিত। (৫) অগত্যা বৎসর ঘুরিতেই কলিকাতায় চাকরি স্বীকার করিয়া ইংরেজী কেতায় চরণযুগল হইতে কুচবিহারের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিলাম। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর তিন দিক্ জয় করিয়া, বাকী দিক্‌টাও জয় করিতে দক্ষিণে যাত্রা করিলাম। (যমদ্বারে নহে!) (৬)

---

(৫) এখানে থাকিতে ২।১টা নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে কলেজের একজন সহযোগীর বাটীতে (ইনিও এক্ষণে পরলোকগত) পৌষ-সংক্রান্তিতে তাঁহার পত্নীর তত্ত্বাবধানে পাচকের প্রস্তুত রকম রকম মুখরোচক পিঠেপুলি খাইয়া বরিশাল-বাসকালে যে আপশোষ ছিল (৯৮ পৃঃ), তাহার কতকটা দূর হইয়াছিল।

(৬) আমাদের অঞ্চলের ঘরামীরা বেশী রোজগারের জন্ত 'দখিনে' অর্থাৎ রাণাঘাট চাকদহ প্রভৃতি স্থানে ঘরামিগিরি করিতে আসে। আমারও সেই ভাবে আরও দক্ষিণে আগমন।
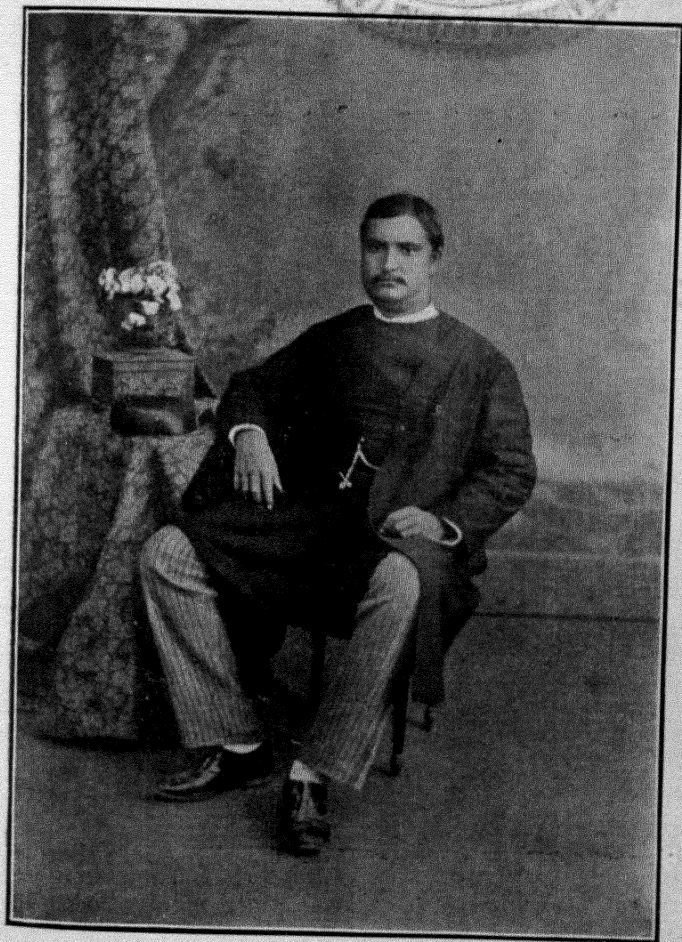
৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (যৌবনে)

(১০৫ পৃঃ. ১০৯ পৃঃ)

৫

এতদিনে ঘূরণচক্রের শেষ হইল; পাঁচ বৎসরে পাঁচ জায়গায় না হইলেও চারি ঘাটের জল খাইয়া কলিকাতার কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র কলিকাতার কলেজেই ফিরিয়া আসিল। (ইহাকে কি 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল' বলিব?) সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতিও হইল; পুরাতন সতীর্থ ও সুহৃৎ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী ও লালগোপাল চক্রবর্ত্তীর সহিত ছাত্রজীবনের পর আবার কর্ম্মজীবনে একই কর্ম্মক্ষেত্রে পুনর্ম্মিলিত হইলাম (তাঁহাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ৮৮ পৃঃ, ৯১ পৃঃ) এবং তাঁহাদিগের সঙ্গগুণে সুপণ্ডিত সুচরিত ত্রিবেদী মহাশয়কে বন্ধুশ্রেণীতে পরিগণিত করিবার সৌভাগ্য-গৌরব লাভ করিলাম। ইহাই যে এই মরজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। প্রতীচীর সুলেখক ষ্টিভ্‌ন্‌সন্ বড় কথাটাই বলিয়াছেন—"We are all travellers in the wilderness of this world; and the best that we find in our travels is an honest friend. He is a fortunate voyager who finds many. We travel, indeed, to find them. They are the end and the reward of life. They keep us worthy of ourselves; and when we are alone, we are only nearer to the absent……Of what shall a man be proud, if he is not proud of his friends?" ("Travels with a Donkey," Dedication to Sidney Colvin.) এক্ষণে ইঁহারা তিন জনেই পরলোকে, আর আমি এই সংসার-দগ্ধারণ্যে বন্ধুহীন হইয়া মৃতবৎ বাস করিতেছি। 'যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ।' যাক্, বারে বারে শোকতাপের প্রসঙ্গ তুলিয়া আর রসভঙ্গ করিব না।

কলিকাতায় আসিয়া শুধু যে সুহৃৎ-সমাগমে সুখী হইলাম, তাহা নহে, অবিলম্বে পিতামহী দেবী ও গৃহিণীকে আনিয়া গৃহী হইলাম ('ন

গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে') ; আবার বহরমপুরের ন্যায় কলিকাতায় ঘরকন্না পাতিলাম। এবার আর তিন বৎসর নহে, ত্রিশ বৎসরের ধাক্কা। এইখানেই আমরণ স্থিতি। আর যদি ৺বিশ্বেশ্বর কৃপা করেন, তবে আর একবার ৺কাশীধামে শেষ খেলাঘর বাঁধিয়া ভবের খেলা সাঙ্গ করিব। হায় রে আশা!

কলিকাতায় ফিরিয়া, গৃহস্থালী পাতাইয়া, পূর্ণ উৎসাহে আহার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলাম। এবার আর রন্ধনের জন্য বামুন বা বামনীর উপর নির্ভর করিতে হইল না, স্বয়ং ব্রাহ্মণী আসিয়া হাঁড়ীবেড়ী ধরিলেন; 'যা'র কর্ম্ম তা'রে সাজে।' কিছুদিন পরে, 'কলিকাতার রেওয়াজমত' একজন পাচকও নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ভালমন্দ সবই রান্না গৃহিণীর জিম্মা, 'ঠাকুর' কেবল ডা'লভাত সিদ্ধ করিয়া দিয়া খালাস, অবশিষ্ট সময় ছেলে লইয়া বেড়াইত। আহারটি তৃপ্তিপূর্ব্বকই হইতে লাগিল। সহরের বাতাসে শুধু পূর্ব্বাভ্যস্ত পাঁচ ব্যঞ্জনে সন্তুষ্ট হই নাই, আমিষের ক্ষেত্রে বর্ষায় তপ্‌সী ও গঙ্গার ইলিশ বৌবাজার হইতে (কখনও কখনও আহীরিটোলা হইতে), হেমন্তে গল্‌দা চিংড়ি, শীতকালে ভেট্‌কি (ভেট্‌কির শিরদাঁড়া, বাঁধাকপির সহিত), স্বহস্তে সবহুমানে বহিয়া আনিয়াছি। রুই কাতলা মিরগেল খরশুলা শৌলের তো কথাই নাই। আবার তখনকার পূর্ণযৌবনে সহুরে আহার চপ্‌ কাট্‌লেট্‌ কালিয়া কাবাবেও বিলক্ষণ টান হইয়াছিল; অবশ্য সবই গৃহজাত, 'আশ্রম' হইতে আনীত নহে; দৌড় অবশ্য ছাগমাংস পর্য্যন্ত; 'মৃগমাংস পক্ষিমাংস যেবা ইচ্ছা হয়' তো নহেই, মটন্ পর্য্যন্তও প্রোমোশান্ পাই নাই; তবে মাংসটা 'কসাইকালী'র প্রসাদ; কচিৎ কালীঘাটের মহাপ্রসাদ মিলিত। আত্মলীলায় (৭৪ পৃঃ) বলিয়াছি, ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে দাঁতের জ্বালায় ও সব দিকে আর ঘেঁসি না, ঘি-গরম-মশলা দিয়া রান্না চতুষ্পদের দেহ

পরিপাক করিবার মত অগ্নিও এক্ষণে এই নির্জ্জীব দেহে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে।) মাংসের অনুপান ছিল লুচি বা টোষ্ট্-করা পাঁউরুটি, অথবা রকমারি-হিসাবে ঢাকার পরোটা। শেষ জিনিশটা ঘরে ওস্তাদ হিন্দুস্থানী রাঁধুনী ব্রাহ্মণের বানান; পাঁউরুটিটাও ঐরূপ সদ্ব্রাহ্মণের বানান কি না, সে কথা আর নাই লিখিলাম। কথায় বলে, 'শতং বদ মা লিখ'—আর 'লিখ তো লিখ, মা ছাপ!' [১]

ইহা ছাড়া বাজারের খাবার—বৌবাজারের ভীম নাগের আমসন্দেশ তালশাঁস, বাগবাজারের নবীন ময়রার রসগোল্লা, বড়বাজারের ক্ষীরের লাড্ডু বরফী ইত্যাদি ও আফিঙ্গের চৌরাস্তার রাবড়ী, (রসগর্ভনির্ভর রসগোল্লা রাবড়ী একত্র মাখিয়া—অনুপ্রাসের অনুরোধে নহে, মধুররসের উপরোধে), বৌবাজারের খাস্তা গজা তথা হালের এম্প্রেস্ ও খিলি গজা, লবঙ্গলতিকা, নোন্তার রাজ্যে কচুরি নিমকি শিঙ্গাড়া পাপরভাজা ঝুরিভাজা (বড়বাজারের), এবং ভোজে কাযে ঘরে তৈয়ারি জেলাপি বদে খাস্তাগজা পানতোয়া ও হালফ্যাশান্ দরবেশ রাজবেশ, কিছুই বাকী নাই। কেবল কলিকাতার ক্ষীরটা কখনও প্রবৃত্তির সহিত পান করিতে পারি নাই, নিমন্ত্রয়িতার মন বা মান-রক্ষার জন্য কষ্টে-সৃষ্টে খুরীতে চুমুক দিয়াছি—'রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।' তবে বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী যখন 'দেশ' হইতে ভাঁড় ভাঁড় ক্ষীরের ভার আনাইতেন, তখন সেই ক্ষীর দিয়া লুচি মাখিয়া মহা-আনন্দে 'দেশের' নিয়মে 'কিঞ্চিৎ জল-

---

(১) "আর টোষ্টগুলো কাল কাঁচা ছিল, আমার জাতটে কি মারবি? আজ খুব ভাল লাল ক'রে নিস্—একটু পোড়া পোড়া হ'লেও ক্ষতি নেই।"—উত্তমরূপে অগ্নিশোধিত না হইলে, মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটি-ভক্ষণ বঙ্কুবাবু অতি অনাচার বলিয়া গণ্য করেন। যজ্ঞ-ভঙ্গ গল্প, প্রভাত-গ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ ৩৭০ পৃঃ। (পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।)

যোগ' করিতাম। ইদানীং 'ঢাকার ক্ষীর'ওয়ালার ডাক খুবই শুনি, নামডাকও খুব আছে, কিন্তু ভেজালের ভয়ে ও বয়সের গতিকে পরখ করিবার সাহস হয় নাই। (বহুকাল পূর্ব্বে ঢাকার লোক, পঠদ্দশার প্রিয়বন্ধু, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের আনীত 'পাতক্ষীর' খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। ইঁহার কথা মধ্যলীলায়, ৯২পৃঃ, উল্লেখ করিয়াছি।)

ক্ষীর-লুচির প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের অঞ্চলের পুরাতন প্রথা, ক্ষীর-গোল্লা দিয়া লুচি (লুচি-চিনি আরও পুরাতন) মাখিয়া খাওয়া—লোকলজ্জার খাতিরে রাজধানীর প্রকাশ্য ভোজনগোষ্ঠীতে ছাড়িতে হইয়াছে, ডাল ডালনা ছকা কালিয়া দিয়া লুচি চালাইতে শিখিতে হইয়াছে। ঘরে 'আপ্‌রুচি খানা' চলে বটে, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম্মে ভিন্ন 'অচাল' সন্দেশ পাইব কোথায়? তবে ঘরে পায়স প্রস্তুত হইলে লুচি-পরমান্ন-রূপ মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটে।

ঘরে ও বাজারে যে সব লোভনীয় খাদ্য মিলিত, তাহাতেও মন উঠিত না। সুযোগমত কৃষ্ণনগরের সরপূরিয়া-সরভাজা, শান্তিপুরের খাসমোয়া ও নিখুঁতি, খাগড়ার মুড়কি ও ছানাবড়া, জনাইএর মনোহরা, নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও রাঘবসাই, দক্ষিণের 'পয়রাগুড়', মোল্লার চকের দৈ ও ক্ষীর, এ সবও আনাইতাম। এখনও এ অভ্যাস একেবারে যায় নাই—বিশেষতঃ মাতুলালয় শান্তিপুর হইতে ওটা তো বার্ষিক হইয়া পড়িয়াছে।

এতক্ষণ ধরিয়া যে সকল সুখাদ্যের কথা লিখিলাম, সেগুলির সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে, ছাত্রজীবনের মত অবশ্য নিত্য উৎসব চলে নাই; তখন পরের পয়সা—গৌরী সেনের টাকা—খরচ করিতে বাধিত না; আর এখন চাকরির জীবনে কষ্টার্জ্জিত পয়সা, তাহাতে আবার ছা-পোষা মানুষ; ইহা ছাড়া তখনকার মেসের রান্নায় অনেক সময়ে কান্না পাইত, অগত্যা বাজারের জলখাবারের উপর ঝোঁক দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

কলিকাতা রাজধানী জায়গা—কাযে-কাযেই নিমন্ত্রণবাহুল্যও ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে প্রীতিভোজন এখন বেদনার স্মৃতিমাত্রেই পর্য্যবসিত। ("A Sorrow's crown of sorrow is remembering happier things" এই কবিবাক্য রহিয়া রহিয়া মনে পড়ে।) নিমন্ত্রণে যাইবার পরদিন উপবাস—ইহা তো আমার প্রবীণ বয়সের নিয়ম; আমি ল্যাম্বের ভক্ত (দোহাই পাঠক মহাশয়, মটন্ বুঝিয়া বসিবেন না)—সুতরাং "If nothing else could be said for a feast, this is sufficient—that from the superflux there is usually something left for the next day" অর্থাৎ ভোজের পরদিন তাহার গন্ধ থাকে—ল্যাম্বের এই মহাবাক্যটি শিরোধার্য্য—উহুঁ—উদরধার্য্য করিয়াছি। কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে ভূরিভোজনের পরে এক দিনেও জের মিটিত না। শুনিয়াছি, হিন্দুস্থানীরা নিমন্ত্রণ পাইলে পূর্ব্বদিন জোলাপ লয়—যাহাতে উদর পরিষ্কার হইয়া থাকে, নিমন্ত্রণ খাইবার সময় যত ইচ্ছা বোঝাই লওয়া যায়। ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দুস্থানী ছিলেন—বোধ হয়, সেই জন্য তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণে উক্ত নিয়ম প্রতিপালিত হওয়া উচিত ছিল। (কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের বংশধরগণও বাদ যান না।)

৬

চাকরি-জীবনে মফস্বল সহরে প্রবাসকালে ও কলিকাতায় বাসের প্রথম আমলে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে ও পূজার ছুটিতেও 'দেশে' যাওয়ার অভ্যাস ছিল। ক্রমে কলিকাতায় 'কায়েম মোকাম' করিলে (যদিও ভাড়ার বাড়ীতে) অভ্যাসটি লোপ পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন তিন জায়গায় নামিয়া তিন রকম যানে চড়িয়া গরুর গাড়ীতে শেষরক্ষা করিতে হইত, তখন ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া ঘটিত। আর যেই রেল্ খুলিল

(রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ লাইন্), পথ সুগম হইল, আর বাড়ী যাওয়ার পাটও উঠিল। ইহাকেই বলে 'উল্টা বুঝ্‌লি রাম!' প্রথম লোপ পাইল পূজার ছুটিতে যাওয়া—ম্যালেরিয়া-মাহাত্ম্যে। বেশ মনে আছে, উপরি উপরি ২।৩ বৎসর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন স্বহস্তে ধর্ম্মদার বাজার হইতে আমাদের অঞ্চলের সুবৃহৎ গল্‌দা চিংড়ি আনিয়া রাত্রির আহারে লুচির সহিত বিলাতী কুমড়ার ঘাঁটের উপর কালিয়ার ব্যবস্থা করিলাম, আর দুপুরে আহারান্তে বা আহারে বসিয়া কম্প দিয়া জ্বর আসিল, আশার জিনিশ গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া মাঠে মারা গেল। শৈশবে পুত্রকন্যাগণও তথায় গেলেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইত। (যাক্, এ প্রসঙ্গ এইখানেই চাপা থাকুক, নতুবা শোকের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইবে।) গ্রীষ্মের ছুটিতে আম-কাঁঠাল তো ছিলই, তাহার উপর তখনকার দিনে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ বৃক্ষের সুপক্ক শ্রীফলের পক্ষপাতী ছিলাম—কারণ অবশ্য অনুমেয়। অনুমেয় কারণের কার্য্য তো হইতই, তাহা ছাড়া জঠরাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িত, ফলে দারুণ অগ্নিবৃদ্ধি হইত। আর এখন—পাকা বেল, বেলের সরবৎ, বেলপোড়া, বেলের মোরব্বা, যাহাই কেন খাই না, বেজায় পেট ভার হয়, চোঁয়া ঢেকুর উঠে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শিবের প্রিয় ফলে এরূপ অশিবের উৎপত্তি, কলির প্রকোপে ভিন্ন আর কিসে হইতে পারে ?

৭

তাহার পর, প্রায় ২০ বৎসর হইতে ছুটিতে ৺কাশীযাত্রার নিয়ম হইয়াছে। (অবশ্য সকল ছুটিতে ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার কৃপা হয় না, মা-লক্ষ্মীরও অনুগ্রহ হয় না।) যখন প্রথম কাশীদর্শন-সৌভাগ্য ঘটিল, তখন একটা অভিনব খাদ্যজগৎ চক্ষুর সমক্ষে, বায়োস্কোপের ছবির মত, খুলিয়া গেল; ইংরেজ কবির ভাষায়—"Then felt I like some watcher of the skies When a new planet swims into

his ken" বলিতে ইচ্ছা করে। বাস্তবিক, কাশীর দধিমাখন, মালাই-রাবড়ী, কালাকাঁদ-চম্‌চম্‌, তিখুরের জেলাপী, ছানার পোলাও, কচুরীগলির খাস্তা কচুরী, বঁদে, অমৃতী, খাজুরা, ঘিওর, তথা বাঙ্গালীটোলার শশী ও তস্য জামাতার দোকানের 'খাবার', (বেগুনী আলুর চপ্‌ তেলেভাজাও ফাঁক যায় নাই), এবং নেংড়া আম কালোজাম তরমুজ খরমুজা পেঁপে পেয়ারা কুল রামনগরের বেগুন মূলা কপি খাইলে বিশ্বেশ্বরের পুরী যে এই পৃথিবীর নহে, প্রকৃতই 'স্বর্গভূমি,' তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। অন্নপূর্ণার প্রসাদ পাইলে জন্ম জন্ম দারিদ্র্য হয় না, এই প্রবাদ শ্রুতিগোচর হওয়াতে এক রজতমুদ্রা প্রণামী দিয়া মায়ের প্রসাদ পরমান্ন পরম ভক্তির সহিত আকণ্ঠ ভোজন করিয়াছি, তাহার তীব্র মাধুর্য্য যাহাতে 'সহ্যাতীত' না হয়, সে জন্য তৎসঙ্গে রুটির ব্যবস্থা করাইয়াছিলাম ; ভাত-তরকারীর লেঠায় যাই নাই। হরিদ্বার প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থেও যে খাদ্যসুখ উপভোগ করিয়াছি, তাহার পরিচয় ('পাগলা ঝোরা'য়) 'ধর্ম্মে মতি'তে পাঠক পাইবেন, আর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিব না।

৮

এই তো গেল সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহালতবিয়তে ভোজন-সাধনের বিচিত্র বিবরণ। তাহার পর যখন তবিয়ত খারাপ হইল, বৎসরাধিক কাল (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) অজীর্ণ, giddiness (ঘুরুনি), nausea (গা-বমি), উদরাময়, রক্তআমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, বায়ূক্রূরতা, জ্বর, ফোড়া প্রভৃতি রকমারি রোগ আমার উপর উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, তখন ডাক্তার্‌-বৈদ্যের ভ্রুকুটিতে আহারের স্বাধীনতা লোপ পাইল, বাঁধা-ধরা তরী-তরকারীতে তুষ্ট থাকিতে হইল। এই দীর্ঘকাল অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসকের ব্যবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বিশেষজ্ঞের আদেশ-উপদেশ অবনতমস্তকে পালন করিয়াছি, কবিরাজের কথামত, কৈ-শিঙ্গি-মাগুর প্রভৃতি 'জীবিত মৎস্য'

(ছোট একখানি ঝাড়নে বাঁধিয়া) এবং কাঁচা ও পাকা পেঁপে, সাঁতরাগাছির ওল ও বারাসতের জয়নগরের বা যশোরের মানকচু, দেশী কুমড়া বা লাউ, ইঁচড় ও মোচা, করোলা ও উচ্ছে, পল্‌তা ও পটোল, কাটোয়ার ডাঁটা ও সজিনাখাড়া, স্বহস্তে বাজার হইতে বহন করিয়া আনিয়া চিকিৎসকের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছি। কোনও নিষিদ্ধ বস্তু ভোজন করিয়া স্বৈরাচার করি নাই; যখন বর্ষাকালে গঙ্গার ইলিশমাছ-ভাজার গন্ধে গৃহ আমোদিত হইয়াছে, তখন ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনেই তৃপ্ত হইয়াছি, আর শীতকালে পাকশালায় ভেট্‌কি-বাঁধাকপি, গল্‌দাচিংড়ি-ফুলকপি প্রভৃতির সংযোগ-দর্শন-সুখেই সুখী হইয়াছি, স্পর্শন-সুখ বা আস্বাদনসুখভোগের জন্য চঞ্চল হই নাই—বুকে হাত দিয়া এই সাফাই দিতে পারি। তবে বিধিবদ্ধ ব্যঞ্জনের বেলায় যদি 'জিহ্বালৌল্যাৎ' মাত্রা অতিক্রম করিয়া থাকি, সে অবশ্য আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রেও এইটুকু বলিতে পারি যে, একটি চলিত গল্পের নায়ক বেগুনপোড়া দিয়া পথ্য করিতে অনুমতি পাইয়া যেমন এক কুড়ি বেগুন পোড়াইয়া দগ্ধোদরে দিয়াছিল, আমি কোন দিন সেরূপ বাড়াবাড়ি করি নাই।

হাতে বহিতে অনেক সময় ভার বোধ করাতে ভদ্র মুটে সাজিবার জন্য ফরমায়েশ দিয়া জামার পকেট্ তৈয়ার করাইয়া লইয়াছি। অর্জ্জুন যেমন অনেকবাহূদরবক্ত্র বিশ্বরূপের বহুমুখে জীবকুলকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন, তেমনই ব্যাপারীরাও সেই সারি সারি পকেটে শুধু পলতা পটোল উচ্ছে করোলা কেন, পেঁপে ওল মানকচু কাঁচকলা ইঁচড় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইত। (লাউ কুমড়া ডাঁটা মোচার বেলায় অবশ্য থলির ভিতর হাতী পোরার চেষ্টা করি নাই।) ৮

(৮) পাঁচ আনার পকেটে পোরার প্রসঙ্গে পাদটীকায় বিদেশী বিদ্যার একটু পরিচয় দেওয়ার ঝোঁক সামলাইতে পারিলাম না। একখানি ইংরেজী নভেলে (THOMAS

৺পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী

(৮৮ পৃঃ, ১০৫ পৃঃ)

একবার বৌবাজারে বৈকালে মেছোপটিতে ভিড়ের মধ্যে পাশ-পকেট্ হইতে চশমাযোড়াটি চুরি গিয়াছে, (ভাগ্যে রোল্‌ড্ গোল্‌ড্, নতুবা সোণা হারানর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত), নূতন চশমা কিনিয়া হৃদয়ের নিধির মত (তা' চাল্‌শেধরা প্রৌঢ়ের উহাই যে চক্ষূরত্ন), মহাবীরজির বক্ষোবিহারী রামনামের মত, বুক-পকেটে রাখিয়া নব-উদ্যমে আবার বাজার করিতে গিয়াছি, 'বিঘ্নভয়ে' বাজার যাওয়া বন্ধ করি নাই। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

'বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ।
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি ॥"

কাশীতে আড়াই মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া প্রথমে দেওয়াল ধরিয়া 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করিয়া নূতন করিয়া হাঁটিতে শেথার পর যখন লাঠি ধরিয়া পথে বাহির হইতে পারিলাম ('শনৈঃ পন্থাঃ'), তখনই

HARDY : Under the Greenwood Tree, Chapter II.) পড়িয়াছি, এক জন পাদুকানির্ম্মাতা পকেট্ হইতে নিজের হাতের কাযের নমুনাস্বরূপ মেয়ের পায়ের এক পাটি বুট্ বাহির করিল, আর এক জন রাজমিস্ত্রী ইমারতের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার সময় ২।৩ বেলার খোরাক পকেটে সঞ্চিত রাখিত এবং সেইজন্য পকেট্‌কে 'ভাণ্ডার' (larder) বলিত। এ সব গোরামিস্ত্রীর তুলনায় বর্ত্তমান লেখকের কার্য্যটি 'তাজ্জব ব্যাপার' নহে। তবে সে নিছক কল্পনা, আর এ বাস্তব সত্য। [এবার 'পশ্চিমে' আসিয়া লক্ষ্য করিলাম যে এ অঞ্চলের অনেকে রেলপথে ভ্রমণের সময় ডাক-পিয়নের ব্যাগের ন্যায় একটি বা দুইটি ব্যাগ্ কাঁধ হইতে ঝুলাইয়া লেন ; একটি নাভি-পর্য্যন্ত, অপরটি বুক পর্য্যন্ত। ব্যাগ্ অবশ্য চামড়ার তৈয়ারি নহে, পুরু কাপড়ের তৈয়ারি। ইহাতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জিনিশ লইবার বেশ সুবিধা। আগে যদি জানিতাম, তাহা হইলে এই কৌশলটি কাযে লাগাইতে পারিতাম। যাহা হউক, ভবিষ্যতের জন্য এ জ্ঞানটুকু সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম।—পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের মন্তব্য।]

পুত্রের প্রাত্যহিক বাঁধা বরাদ্দর বাজার করায় সন্তুষ্ট না হইয়া নিকটস্থ পাতালেশ্বরের বাজার হইতে শাক-ডাঁটা, কচু-কাঁকরোল, নিনুয়া ঢেঁড়স আনিতে আরম্ভ করিলাম; ক্রমে দশাশ্বমেধের বাজার পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইলে শিঙ্গি-মাগুর (কৈ কৈ পাইতাম ?) খদ্দরের রুমালে বাঁধিয়া বাসায় ফিরিতে লাগিলাম।

গত বর্ষে (১৩২৯) যখন নিষেধের বেড়া ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতে লাগিল, তখন সারা শীতকাল ফুলকপি না খাইয়া, উপবাসান্তে পারণের জন্য ব্যস্ত ব্রাহ্মণের ন্যায়, শীতের অন্তে বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া বৌবাজারে উক্ত সবজী লুপ্ত হওয়াতে লুপ্তরত্নোদ্ধারের জন্য হগ্ সাহেবের বাজার হইতে চড়া দরে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। (এই বাজারে নাকি সব সময়েই সব জিনিশ মিলে, এমন কি, গরু হারাইলেও পাওয়া যায়।) পাছে কাব্যরস নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া এক পয়সাও ট্র্যাম্‌ভাড়া দিই নাই, দুর্ব্বল-দেহ-সত্ত্বেও যাতায়াতের সারা পথটা চরণতরীর সাহায্যেই পাড়ী দিয়াছি। আক্ষেপের বিষয়, এত আগ্রহে সংগ্রহ করিয়াও সদ্যঃ সদ্যঃ সেই সাধের সওদার স্বাদ লইতে সমর্থ হইলাম না। সেই রাত্রেই জ্বরে পড়াতে তিন দিন পরে পথ্য করিলাম। পথ্যের পাতে মাছের ঝোলে ফুলকপির ২।৪টা পাঁপড়ি সাধ মিটানর জন্য গৃহিণী দেওয়াইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু একে অসময়ের কপি, তাহাতে আবার ঘরে পড়িয়া পড়িয়া তিন দিন তিন রাত্রি শুকাইয়াছে, সুতরাং সে স্বাদ লওয়ায় শুধু 'নিয়মভঙ্গ'ই হইল, আর পথ হাঁটাই (ভাগ্যে কাদা ঘাঁটা নহে) সার হইল। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।' যাক্, এ বৎসর (১৩৩০) শীত কাল পড়িতেই তাহার শোধ ভাল করিয়াই তুলিতেছি। ফুলকপি ভাতে, ভাজা, বেসমের বড়া, ডালনা (রুই কাতলা বা গল্‌দা চিংড়ি ও নূতন আলুর সহিত) এবং শেষ বেশ শিঙ্গাড়া, কিছুই বাদ যাইতেছে না।

কথায় বলে, 'এক মাঘে শীত পালায় না।' আর গৃহিণীও গত বৎসর বলিয়াছিলেন, 'সবুরে মেওয়া ফলে'। [১]

মেওয়া ফলের কথাও এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলিয়া ফেলি। রোগের অবস্থায় বেদানা আঙ্গুর বিধিমত আহার করা গিয়াছে। (তারিফ এই যে, এত বেদানা-আঙ্গুরেও ভোক্তার পাকা রং একটুও চটে নাই। "'Tis in grain, sir! 'twill endure wind and water!") সৌভাগ্যক্রমে গতবর্ষে বেদানা ও এই বর্ষে আঙ্গুর অসম্ভব সস্তা ছিল। কমলা লেবু (যদিও মেওয়ার মধ্যে নহে) চারি পয়সা হইতে চারি আনা যোড়াতেও কিনিতে হইয়াছে। বানারসে বসিয়া আনারসও চড়া দরে লইতে হইয়াছে। পাকা পেঁপের তো কথাই নাই। ডাক্তারের আদেশে কিছুদিন কিসমিস মনাক্কা চালাইয়াছিলাম, সম্প্রতি বাদাম ও আখরোট অল্প-পরিমাণে চলিতেছে। 'অধিকন্তু ন দোষায়' বলিয়া পেস্তাটাও ঐ সঙ্গে চালাইতেছি। তবে 'তেরোস্পর্শ' ঘটিয়া বিভ্রাট্ না বাধায়।

রোগভোগের ও সদ্যোরোগমুক্তির সময়ে সন্দেশ-মিষ্টান্ন-ভোজনে সংযমের কথা বলিয়াই এই সুদীর্ঘ বিবরণ শেষ করি। কবিরাজ মহাশয়ের ও পরে সদাশয় ডাক্তার্ বাবুর নির্দ্দিষ্ট দুইটি গোল্লার গণ্ডী (যত দিন মিয়াদ ছিল তত দিন) লঙ্ঘন করি নাই; মিষ্টান্নভক্ত হইয়াও কলিকাতায় দরবেশ ছানার জেলাপী পানতোয়া লেডিকেনি রসগোল্লা

---

(১) শীতকালে যেমন খাস্তসুখ, তেমনই রোগমুক্ত অবস্থায় প্রবল অগ্নিতে বহু ভোজ্যই আহুতি দিয়াছি। কিন্তু এখন (চৈত্র ১৩৩০) দারুণ গ্রীষ্ম পড়াতে আহারে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। বন্ধুরা বলেন, 'ব্রহ্মার মন্দাগ্নি' হইয়াছে। এ সময়ে ব্যঞ্জনের দ্রব্যের প্রাচুর্য্যও নাই, বৈচিত্র্যেরও অভাব। এখন সম্বল কেবল বিউলির ডাল, কাঁচা আমের কটিকবোল, ঘোল ও তরমুজের সরবত।

রাজভোগ-উপভোগে বিরত থাকিয়া, এবং চারিমাস কাশীবাস ঘটিলেও তথাকার মালাই রাব্‌ড়ী কালাকাঁদ [১০] প্রভৃতি লোভনীয় পদার্থ-বিষয়ে আত্মাকে (?) বঞ্চিত করিয়া, এই কলিকালে কঠোর সংযমের পরিচয় দিয়াছি (বিষ্ণুর অষ্টোত্তর-শত নামের ন্যায় মুখপ্রিয় খাদ্যের নামকীর্ত্তনেও ভোজন-সাধকের আনন্দ।) যদিও জনৈক দূরদেশস্থিত পুরাতন বন্ধু হাত গণিয়া (?) বলিয়াছিলেন যে, এ পক্ষ বাড়ীর লোকের অজ্ঞাতসারে দোকানে বসিয়া বা রাস্তায় দাঁড়াইয়া নিষিদ্ধ সুখাদ্য ভোজন করিয়াছেন, তাহাতেই পুনঃ পুনঃ রোগে পড়িয়াছেন। [১১] (বন্ধুবর লেখকের ধাতটি ঠিক চিনিয়া লইয়াছেন !)

যাক্, আর মিত্রদ্রোহিতা করিব না। একেই তো বন্ধুবর্গ একে একে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন—'একে একে নিভিছে দেউটি।' যে দুই-চারি জন আজও জীবিত আছেন, তাঁহারা নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করুন, এবং দুর্লভ নরত্ব ও সুদুর্লভা বিদ্যার অনুশীলন করিয়া নিজে নির্বৃতি লাভ করুন ও অপর সাধারণকে নির্বৃতি প্রদান করুন—এই হতভাগ্যের মত 'জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ' হইয়া জীবন্মৃতবৎ বসুমতীর ভারভূত হইয়া না থাকেন—৺বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করি।

---

(১০) 'কি মহিমা অন্নপূর্ণার !' যে দিন প্রবন্ধের এই অংশটির খসড়া হইতে পরিষ্কার প্রতিলিপি (Fair Copy) প্রস্তুত করিলাম, সেই দিনই কাশী হইতে প্রত্যাগত প্রতিবেশী অন্যান্য খাদ্যের সহিত কয়েকখানি কালাকাঁদও 'প্রসাদ' বলিয়া পাঠাইয়াছেন। 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

(১১) কৃষ্ণনগরে ছাত্রজীবনে একটি বন্ধু সত্য সত্যই এইরূপ অত্যাচার করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তবে সে অবস্থা যৌবনের অসংযম।

ভোজন-সঙ্কট

('সারদা',* বৈশাখ ১৩৩১)

"সারদা শারদাম্ভোজবদনা বদনাম্বুজে।
সর্ব্বদা সর্ব্বদাস্মাকং সন্নিধিং সন্নিধিং ক্রিয়াৎ ॥"

নবপ্রতিষ্ঠিতা 'সারদা'র সেবায়েত ঠাকুর মহাশয় সারদাদেবীর এই সেবকানুসেবকের হস্তে দেবীর ভোগরাগের জন্য একটী ব্যঞ্জন-রন্ধনের ভার দিয়াছেন। কিন্তু বড়ই অসময়ে তিনি এই অভাজনকে অনুগ্রহ-ভাজন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর চিকিৎসকের কঠোর শাসন হইতে নির্ম্মুক্ত লেখক এখন 'পুস্তক-রঞ্জিতহস্তা ভগবতী ভারতী দেবী'র চিরাভ্যস্ত আরাধনা স্থগিত রাখিয়া দর্ব্বীস্থালী-শোভিত-হস্তা অন্নপূর্ণাদেবীর আরাধনায় ব্রতী আছেন, কাব্যাদির নবরসচর্চ্চায় নিবিষ্ট-চিত্ত নহেন, চর্ব্ব্যাদির ষড়্‌রস-চর্চ্চায় আবিষ্টচিত্ত। সুতরাং 'অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ'—এই কবিবাক্যেরই একটু স্বতন্ত্র অর্থে প্রয়োগ করিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে ইচ্ছা হয়। আর যদি নিতান্তই আদেশ পালন করিতে হয়, তাহা হইলে কাব্যজগৎ ছাড়িয়া খাদ্য-জগতের আলোচনা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখি না। অতএব "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ দেবীং সরস্বতীং ব্যাসম্"—শ্রীবিষ্ণুঃ—'ভোজনে চ জনার্দ্দনম্' স্মরণ করিয়া 'ততোজয়মুদীরয়েৎ' অর্থাৎ—ভূরিভোজনের জয়গান করিতে প্রবৃত্ত হই।

---

* ষোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রকাশিত সাহিত্য ও সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় পত্রিকা। পত্রিকাখানি কয়েক মাস প্রকাশের পরই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

'পরান্নং দুর্লভং লোকে শরীরং জন্ম-জন্মনি।
পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে মা শরীরে দয়াং কুরু॥'

এই উদ্ভট শ্লোকটি হয় তো কোনও ঔদরিকের উক্তি বলিয়া অনেকে উড়াইয়া দিবেন, আর না হয় ইহাতে কাকূক্তি ও শ্লেষ-বিদ্রূপ (Irony) প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বাচ্যার্থের বিপরীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন; কিন্তু 'ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্', চাণক্য-পণ্ডিতের এই বাক্যটীর গুরুত্ব, সারবত্তা ও প্রামাণিকতা অস্বীকার করিতে কেহই সাহসী হইবেন না—'যস্য বিজ্ঞান-মাত্রেণ নৃণাং প্রজ্ঞা প্রজায়তে।'

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

এই বচনে অতিভোজন পরিবর্জ্জন করার উপদেশ শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু 'জীর্ণকূর্চ্চ' ঋষিগণের এই সব 'বৃদ্ধস্য বচনম্' মানিতে হইলে 'সর্ব্বত্রৈব বিচারে তু ভোজনেঽপ্যপ্রবর্ত্তনম্' হইয়া পড়ে, 'ইতি বিদুষাম্ পরামর্শঃ।' আমাদের শাস্ত্র তো কামধেনু, যে যাহা চাহিবে তাহাই মিলিবে, 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' শাস্ত্রেই আবার আছে 'আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ।' অতএব 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য' 'ত্রিভুবনবিজয়ে' অর্থাৎ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য ত্রিবিধ ভোজ্যের অর্চ্চাচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। আর লজ্জাই বা কি? এ তো দশের সমক্ষে দশন-রসনা সঞ্চালন করিয়া নানা সুখাদ্যের পরখ করিতেছি না, শুধু লেখনী সঞ্চালন করিয়া ভোজন-বিদ্যার তারিফ করিতেছি। ভোজনবিদ্যায় ভোজবিদ্যার ন্যায় গুহ্য-তত্ত্ব বা লোমহর্ষণ ব্যাপার কিছুই নাই, Gastronomyতে Astronomyর (জ্যোতিষের) মত মস্তিষ্ক-সঞ্চালনের প্রয়োজন বা কূট-সমস্যা-সমাধানের আয়োজনও নাই; সুতরাং এই প্রকার প্রসঙ্গ পাঠক-সম্প্রদায়ের অপ্রীতিকর

হইবার কথা নহে। চাই কি পাঠকবর্গের মধ্যে এই ষড়্‌রসের রসিক ষট্‌পদও মিলিতে পারে, যাঁহারা কবি-সূক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া রসনা-রুচিকর পদার্থকে কালিদাসের কবিতার সহিত এক পংক্তিতে স্থান দিতে প্রস্তুত। অত্র প্রমাণং যথা "কালিদাস কবিতা নবং বয়ঃ, মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ। এনমাংসং গোল্লা চ কোমলা সম্ভবন্তু মম জন্ম জন্মনি॥" (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।)

'পুরাণে মহিমা শুনি' ঋষিগণ গলিত পত্র-ভক্ষণ বা 'বায়ু-আহার' করিয়া সহস্র সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিতেন। কিন্তু আবার পুরাণাদিতেই তাঁহাদের পারণের ব্যাপার যাহা পাঠ করা যায়, তাহাতে বর্ত্তমান প্রসঙ্গেরই তো সমর্থন করে। সত্যত্রেতাদ্বাপরেই যখন এই, তখন কলিতে তো কথাই নাই। কেন না, কলিতে মানবের 'অন্নগতাঃ প্রাণাঃ।' সুতরাং এই স্বল্প পরিমাণ প্রাণ—'বিংশত্যধিক-শতবর্ষ পরমায়ুঃ' রক্ষা করিবার জন্য ভূরিভোজনের প্রয়োজন। তাহাতেও যে প্রাণরক্ষা হয় না, ইহাই আপশোষের বিষয়। সাধে কি দ্বিজেন্দ্রলাল গায়িয়াছেন, "প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত।"

জানি, লঘু-আহার, আধপেটা খাওয়া, অন্ততঃ পেটের এককোণ খালি রাখিয়া খাওয়া (বন্দুকগাদা নহে), ইহাই হইল বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। স্কটলণ্ডের নামজাদা ডাক্তার এবারনেথি (Abernethy) সকলকে বলিতেন—'Live on sixpence a day and earn it,' অর্থাৎ দিন-খোরাকী চারি আনায় পেট চালাইবে আর সে খোরাকীটা মজুরী করিয়া রোজগার করিবে। আমাদের বাঙ্গালাদেশের (বহরমপুরের) বিখ্যাত ৺গঙ্গাধর কবিরাজও নাকি দরিদ্রকন্যা ধনিগৃহিণী হিষ্টিরিয়া-রোগিণীকে বলিয়াছিলেন, 'নিজে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া ধান ভানিয়া সেই ধানের চাউল রাঁধিয়া খাইবে, সব ব্যারাম আরাম হইবে।'

কিন্তু ডাক্তার-বৈদ্যের ব্যবস্থা-মত চলিতে পারা রক্তমাংসের শরীরধারী মানবের পক্ষে সহজ নহে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—'To give impossible prescriptions is a foible of doctors' অর্থাৎ অসম্ভব ব্যবস্থা দেওয়া ডাক্তারদিগের একটা দুর্ব্বলতা! কর্ত্তারা অথচ নিজেরা পদে পদে অনিয়ম করেন, ইহাও দেখা যায়। এ সেই পুরাতন কথা—'Do as I say, do not do as I do', 'আমি যা' বলি, তাই কর, আমি যা করি তা' করো না,' অর্থাৎ কিনা 'আপনার বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাত।'

কথায় বলে 'নানা মুনির নানা মত', অথবা ঘোরালো করিয়া বলে, 'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ। নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' সে দিন একখানি দৈনিক কাগজে দেখিলাম, একজন সাহেব ডাক্তার লিখিয়াছেন (গোরা-গুরুবাক্য তো আমাদের আপ্তবচন)—

'Nature does not deal in minimums, and it would seem therefore that our instincts are right in ensuring a safe margin of excess in our diet'.—

[*Indian Daily News, Town Ed* : *23. 1. 24*]

আবার উক্ত পত্রেই দেখিয়াছি—

'Personally, I believe in the curative qualities of a good dinner. A good dinner will cure most illness, I have known it, even, to cure indigestion.'

(*Indian Daily News*, Town Edition :—*7*. 4. 24.)

তবে অনেকে যেমন এক পয়সার নেশা বলিয়া নেশার রাজাকে ঘৃণা করেন, তেমনি অনেকে হয় তো দুই পয়সার দৈনিক বলিয়া এই রায়কে আমল দিবেন না। এ পক্ষও সামান্য একটু টুকিটাকি কোথায়

কি বাহির হইল, স্বপক্ষে সেই নজির খাড়া করিয়া ওকালতী করিতে, মামলা জিতিতে চাহেন না।

'নানা মুনির নানা মত' ছাড়িয়া মহাজন-বাণী স্মরণ করি। বিশেষজ্ঞের কথা ছাড়িয়া সামান্যজ্ঞের সাধারণী বাণী শ্রবণ করি। যাঁহারা এ রসের রসিক, তাঁহাদিগের অভিমত প্রকাশ করি। যে দুইজন বিলাতী ওস্তাদের শাকরেদী করিবার প্রয়াসে অনেকদিন হইতেই দাগা বুলাইতেছি, তাঁহাদের রসাল রচনা হইতে দুই চারিটি টুকরা নমুনা না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

ইংলণ্ডের সুরসিক লেখক ল্যাম্ব্ বলিয়াছেন, 'প্রিয়খাদ্য পাইয়া যে ব্যক্তি তাহা পরকে বিলাইয়া দিতে পারে, এমন কি প্রাণ ধরিয়া আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া আত্মীয়-বন্ধুকে ভাগ দিতে পারে, তাহার কাণ্ডজ্ঞান নাই।' 'It argues an insensibility.' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি মুখরোচক মৃগমাংস তারাইয়া তারাইয়া উপভোগ করিয়া স্বাদটুকু সম্পূর্ণভাবে আদায় করিতে জানে না, তাহার উচ্চতর বিষয়েও রুচি আছে কিনা এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়।' 'I suspect his taste in higher matters'. তিনি বন্ধুবর্গের নিকট হইতে প্রীতি-নিদর্শন-স্বরূপ অঙ্গুরীয়-প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্নকে নিতান্ত বাজে জিনিশ মনে করিতেন, কেন না সেগুলি রসনাগ্রাহ্য নহে ('impalpable to the palate'); পক্ষান্তরে মৃগমাংস পক্ষিমাংস সুরস ফলমূল ইত্যাদি উপাদেয় খাদ্যকে প্রীতি-উপহারের সেরা বিবেচনা করিতেন—এমন মন্তব্যও তাঁহার একটি চুট্‌কীতে পাওয়া যায়।

আবার স্কট্‌লণ্ডের সুলেখক ষ্টিভ্‌নসন্ বলিয়াছেন—

'Our meals serve not only for support, but as a hearty and natural diversion from the labour of life'.

[TRAVELS WITH A DONKEY : Ch 7.]

'I suppose none of us recognise the great part that is played in life by eating and drinking ········ There is a romance about the matter after all. Probably the table has more devotees than love; and I am sure that food is much more entertaining than scenery. To detect the flavour of an olive is no less a piece of human perfection, than to find beauty in the colours of the sunset.' [AN INLAND VOYAGE : *Changed Times*, Ch 20.]

'A man should be ashamed to take his food if he has not alchemy enough in his stomach to turn some of it into intense and enjoyable occupation.'

[MEN AND BOOKS :—*Essay on Walt Whitman.*]

এই পরলোকগত সুলেখকদ্বয়ের পার্শ্বে জীবিত লেখক জেরোম্. কে. জেরোমের নিম্নলিখিত মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য—

'Ah! We may talk sentiment as much as we like, but the stomach is the real seat of happiness in this world. The kitchen is the chief temple wherein we worship, its roaring fire our vestal flame, and the cook is our great high-priest. He is a mighty magician and a kindly one. He soothes away all sorrow and care. He drives forth all enmity, gladdens all love. Our God is great, and the cook is his prophet. Let us eat, drink, and be merry.' [১]

(১) IDLE THOUGHT OF AN IDLE FELLOW :—*On Eating and Drinking*. উক্ত লেখকের *Three Men In A Boat*-নামক উপাদেয় পুস্তকের ১০ম পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য আছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠক-বর্গের উপর বরাত চালাইলাম।

(এই সকল বিলাতী বয়েদের রচনাভঙ্গীর অনবদ্য সৌন্দর্য্য অনুবাদে রক্ষিত হয় না, সেইজন্য অস্থার্থঃ প্রদত্ত হইল না। ইংরেজীনবিশ পাঠক মূল বাক্যগুলির মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া প্রীতিলাভ করুন, এই অক্ষম লেখক তাহাতেই কৃতার্থ হইবেন।)

এই তিনজন ওস্তাদ লেখক যেরূপ প্রাণ খুলিয়া ভোজনের আনন্দ প্রকটন করিয়াছেন, তাহাতে গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকগণ হয় তো ইঁহাদিগকে চার্ব্বাকের [২] সহিত একগোত্র বলিবেন। তা' বলিলেই বা ক্ষতি কি? ইঁহারা চার্ব্বাক না হইলেও, চারুবাক তদ্‌বিষয়ে দ্বিমত নাই। (বৈয়াকরণ বলিতে পারেন, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু এরূপ কোনও সূত্রে চারুবাক চার্ব্বাক হয় কিনা—ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের টিপ্পনী।)

অবশ্য এসব শুধু লিখিত অভিমত। হাতে কলমে—না, না,— হাতে-পাতে ইঁহারা কি করিয়াছিলেন না করিয়াছিলেন তাহা এইসব উক্তি হইতে জানা যায় না। সুতরাং এগুলিকে হয়তো অনেকে ফাঁকা আওয়াজ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। অগত্যা ওসব theoryর খবর না দিয়া practiceএর নিদর্শন দেখাইবার, কথা ছাড়িয়া কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করি। 'ফলেন পরিচীয়তে'। প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর তো আর কথা চলে না। প্রকৃত জীবনে কি দেখি? বৃকোদর ভীমসেনের অপরিমিত আহার ও অযুত হস্তীর বলের কথা, ঠিক মান্ধাতার আমলের কাহিনী না হইলেও, 'মহাভারত' বলিয়া এই বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসের যুগে উচ্চ-শিক্ষাভিমানী পাঠক অগ্রাহ্য করিবেন। এই

---

(২) চার্ব্বাকের উক্তিটি সকলেরই সুপরিচিত। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

সেদিনও 'মুণ্ডকে' রঘু ও 'আধমুণে' কৈলাস যে হাতীর খোরাক হজম করিয়াছেন, তাহাও অনেকে হাসির কথা বিবেচনা করিবেন, এবং টিপ্পনী কাটিবেন যে 'এই স্বকর্ম্মজ্ঞ' মাণিকযোড় অনন্যকর্ম্মা হইয়া শুধু ভোজনবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, জগতে আসিয়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য কার্য্য করেন নাই। ইংরেজী বুলি আওড়াইয়া তাঁহারা অবজ্ঞাভরে বলিবেন, 'They lived to eat, and did not eat to live' অর্থাৎ ইঁহারা জীবন ধারণের জন্য ভোজন করেন নাই, ভোজনের জন্যই জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন! এ দেশে ইংরেজ-অধিকারের প্রথম আমলে আশানন্দ ঢেঁকি শারীরিক বল ও ভূরিভোজনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু শুধু শারীরিক বল এখন বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোকে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ইংরেজী দৈনিকে পাশ্চাত্য দেশের অনেক উচ্চ-নীচ শ্রেণীর লোকের আহারের বহরের বর্ণনা বাহির হইয়াছে, ৩ সে সব উদাহরণ জড় করিলেও বিশেষ জোর ধরিবে না, কেন না সাহেবদের ধাতে আমাদের ধাতে অনেক তফাত। রাজনীতি-ক্ষেত্রে উদার-মতাবলম্বী (উদরমতাবলম্বী নহেন) জন্ মর্লী (fur-coat) গরম জামার দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রভেদটা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু বিপুল কর্ম্মশক্তির জন্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির জন্য, প্রগাঢ় বিদ্যা-বত্তার জন্য আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে, আমাদের সময়ে,

---

(৩) "A well known French critic maintains that great writers are usually great eaters, and instances Fielding, Dickens, Thackeray, Macaulay, Victor Hugo, Flaubert, Goethe and Balzac. He places the last first." (*Indian Daily News* :—Town edition. 16. 4. 24.)

অর্থাৎ একালে, যে তিন জন পুরুষ-সিংহ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, স্যর ৺রাসবিহারী ঘোষ, স্যর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, [৪] ইঁহারা তিন জনই ভোজন-শক্তির জন্য সসম্মানে স্মরণীয়। [৫] প্রথমোক্ত প্রধান স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ৭৫ পার হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অদ্বিতীয় বাগ্মী ও দেশ-হিতৈষী প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হইয়া অক্লান্ত-ভাবে কর্ম্ম করিতেছেন; এই উভয়ের তুলনায় স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তো বয়সে নবীন, উদ্যমে ও উৎসাহে যুবা এবং 'জাহ্নবীর মত শত মুখে' তাঁহার কর্ম্মের ধারা প্রবাহিত। সত্য বটে স্যর ৺গুরু-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অল্পাহারী ছিলেন, অথচ কর্ম্মশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্যা-বত্তা ও দীর্ঘজীবিতায় তিনি কম ছিলেন না; কিন্তু Majority অর্থাৎ অধিকাংশ সংখ্যাই আমার পূর্ব্বপক্ষের দিকে; আর এই গণতন্ত্রের যুগে (Majority) অধিকাংশ সংখ্যারই জয়। ইহার উপর আরও বলা যাইতে পারে যে, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভোজনশক্তিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং ইংরেজ আমলে বাঙ্গালাদেশের নূতন যুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা-রামমোহন রায় এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি। [৬] অতএব 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই মহাবাক্য অনুসরণ করিয়া ভোজনপরায়ণ হওয়াই বিধি।

---

(৪) পুস্তকাকারে প্রকাশকালে উভয়েই পরলোকগত।

(৫) অবশ্য এই তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া বা তাঁহাদিগের সহিত পরগৃহে পংক্তিভোজন করিয়া এই কথার যাথার্থ্য যাচাই করি নাই, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছি। আশা করি 'ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ', 'যা রটে, তা' বটে।'

(৬) একটী সমগ্র ছাগমাংস একাকী ভোজন করিতে পারিতেন। সমস্ত দিনের

তবে প্রতিপক্ষ হয় তো বলিয়া বসিবেন যে উল্লিখিত পাঁচজন অতিমানবের অসাধারণ কর্ম্মশক্তির সমানুপাতেই ভোজন-শক্তি ; কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের মত ক্ষুদ্র জীব শুধু ভোজনের শ্রীক্ষেত্রে স্পর্দ্ধা করিয়া ইঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে চলিতে চাহিলে উপহাসাস্পদ হইবেন, চাই কি, দাম্ভিক বলিয়া নিন্দাস্পদও হইবেন। যাহার গোবর্দ্ধন-ধারণের যোগ্যতা নাই, তাহার রাসলীলার সখ নিতান্তই অশোভন। বীরত্বে হনুমান্‌জীর অনুরূপ হইবার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু রাশি রাশি অন্ন-ব্যঞ্জন ধ্বংস করিয়া অন্নপূর্ণাকে হারি মানাইতে উন্মুখ হইলে ('উদর পূরাতে পারে কাহার শকতি ?') অত্যন্ত বিসদৃশ দেখায়। মহামহীরুহ-উৎপাটনকারী করীর কৃতিত্ব দেখিয়া, 'আমাদের চারপেয়ের ধর্ম্মই এই' বলিয়া ভেকের আস্ফালন করা ঘোর বিড়ম্বনা নহে কি ? ফল কথা, বিরাট্‌দেহ বৃষভের দেহপরিধির সমকক্ষতা-লাভের প্রচণ্ড চেষ্টায় স্ফীতোদর ভেকের দশা স্মরণ করিয়া এই সব পুরুষর্ষভের সহিত ভোজনের ভজনের প্রতিযোগিতার প্রয়াস না পাইয়া, মাদৃশ দর্দ্দুরের মকমক না করিয়া 'মৌনং হি শোভনম্।' অতএব, এইখানেই থামিলাম।

মধ্যে দ্বাদশ সের দুগ্ধপান করিতেন। "অন্ত গোটা পঞ্চাশ আম্র জলযোগ করা গেল।" তিনি প্রায় এক কাঁধি নারিকেল ভক্ষণ করিলেন। (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত জীবন-চরিত, চতুর্থ সংস্করণ। ৪৯৫—৯৬ পৃঃ।)

গোলদীঘি[১]

('ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩৩১)

ইদানীং একাধিক মাসিক পত্রে মানস-সরোবরের মনোরম বিবরণ পাঠ করিয়াছি। ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত সাধু-সন্ন্যাসীরা আবহমান কাল এতাদৃশ দুর্গম তীর্থ দর্শন করিয়া পুণ্যসঞ্চয়, ও প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য নয়নগোচর করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন। আধুনিক কালে ভূপর্য্যটনকারী প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটনপ্রয়াসী অধ্যবসায়শীল পাশ্চাত্যগণও এই পথের পথিক হইয়াছেন। বিদেশী স্বেন্ হেডিন্ (Sven Hedin) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মানস-সরোবরে অভিযান করিয়া তাহার কৌতূহল-জনক বৃত্তান্তে ইংরেজীনবিশ সম্প্রদায়ের বিস্ময় ও আনন্দ উদ্রেক করিয়াছেন। আজকালকার কৃতবিদ্য উৎসাহী বাঙ্গালী ২।৪ জন তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া মানস-সরোবর দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কিন্তু সাধারণ সংসারী জীবের পক্ষে এই সুদূরবর্ত্তী ও দুর্গম স্থানে পৌছান দুঃসাধ্য। সুতরাং আমাদের নিকট 'জলধরসময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ', সাহিত্যদর্পণের এই কবি-সময়ই অবলম্বন। কবিবাক্যের শব্দ ও অর্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় বটে, 'যাইতে মানসসরে, কা'র না মানস সরে ?' কিন্তু ভাবুকের মানস যত শীঘ্র ও সহজে 'সরে,' চরণ তত শীঘ্র ও সহজে নড়ে না ; এরূপ অর্থ-সামর্থ্য ও সুযোগ-সুবিধা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে ; আর পদব্রজে উচ্চাবচ ও পদে পদে বিপদ্‌বহুল পার্ব্বত্যপথে শত শত ক্রোশ পরিভ্রমণের উপযুক্ত উৎসাহ-

---

(১) দীর্ঘকাল রোগভোগের পর আরোগ্যলাভের প্রথম অবস্থায় লিখিত।

উদ্যম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা সৌখীন ভ্রমণকারীদিগের বড় একটা থাকে না। সুতরাং এই শ্রেণীর কেহ কেহ দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইবার জন্য রেল্‌ওয়ে কোম্পানীর প্রসাদে উড়িষ্যাপ্রদেশে চিল্কাহ্রদ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। এই অক্ষম লেখকের ভাগ্যে অত দূর যাওয়াও ঘটে নাই। মোল্লার দৌড় যেমন মস্‌জিদ পর্য্যন্ত, অথবা 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করিয়া শিশুর চলন যেমন মাতৃসন্নিধান পর্য্যন্ত, তেমনি আমারও সীমানড়া গোলদীঘি পর্য্যন্ত। তথাপি যখন উত্তরপাড়াভ্রমণ, বরাহনগর-ভ্রমণ, ভ্রমণ-কাহিনীর স্থান অধিকার করিতেছে, তখন গোলদীঘি-ভ্রমণই বা কেন সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত হইবার দাবী না করিবে? অসহিষ্ণু পাঠক হয় তো বলিয়া বসিবেন, একেবারে মানস-সরোবর হইতে গোলদীঘি? [২] কিন্তু তিনি কি জানেন না, "It is one step from the sublime to the ridiculous?"

যে সকল কলিকাতাবাসী স্বাস্থ্যের জন্য নিত্য-ভ্রমণের পক্ষপাতী, বা নিতান্ত পক্ষে দু'দণ্ড বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের পক্ষপাতী, তাঁহারা গোলদীঘি, লাল-দীঘি, হেদুয়া, ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার্, বীডন্ স্কোয়ার্—ইহারই একটা না একটা জায়গায় প্রাতে বা সন্ধ্যায় বা দুই বেলাই চক্রাকারে ভ্রমণ করেন, অর্থাৎ

(২) গোলদীঘি মানস-সরোবরের মত মহৎ বস্তু না হইলেও ইহার সম্বন্ধে গবেষণা করিবার অনেক জিনিশ আছে। শুনা যায়, সংস্কৃত কলেজের ইষ্টকালয় অধ্যাপকগণের বাসের জন্য ও তৎসংলগ্ন এই জলাশয় তাঁহাদের স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ম্লেচ্ছের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকায় স্নান করিতে সম্মত হন নাই। যাক্ সে প্রত্নতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক কাহিনী। ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে এই নামটা কতকটা সোণার পাথরবাটীর মত; কেন না দীঘি বলিতে আমরা খুব লম্বা (দীর্ঘ) চারিকোণা জলাশয়ই বুঝি; তাহা আবার গোলাকৃতি হয় কিরূপে? যাহা হউক, নামে মালুম হয়, (এবং আমাদেরও যেন স্মরণ হয়) ইহা এককালে গোলাকার ছিল, ক্রমে চতুষ্কোণ হইয়া

৺লালগোপাল চক্রবর্ত্তী

(৯১—৯৪ পৃঃ, ১০৫ পৃঃ)

কয়েকটা পাক দেন, অথবা পাঁচজনে মিলিয়া বেঞ্চে বসিয়া সদালাপ করেন। (হালে আরও অনেকগুলি ছোট বড় পার্ক্ ও স্কোয়ার্ হইয়াছে, সেগুলির কথা আর ধরিলাম না।) ইড্‌ন্‌গার্ডন্ বা গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত যাইতে খুব উৎসাহী বা সৌখীন লোক ভিন্ন কাহারও ঝোঁক হয় না। ইড্‌ন্ গার্ড্‌নের নিকটে আউট্‌রাম্ ঘাটের জেটিও নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ বায়ু-সেবনের পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু এখানে অতি অল্প লোককেই যাইতে দেখি। এমন কি অনেকে ইহার খবরও রাখেন না। যাঁহারা শেষোক্ত তিনটি স্থানে যান তাঁহারা প্রায়ই ট্রামে গিয়া পথ হাঁটার শ্রমটা বাঁচান। যাঁহাদের পয়সা ততটা সস্তা নহে অথবা এরূপ ব্যাপারে পয়সা খরচ করিতে ইচ্ছা নাই, তাঁহারা হাঁটিয়াই অতদূর পাড়ী দিতে পারেন বটে, কিন্তু অতদূর হাঁটিতেই ষ্টীম্ ফুরাইয়া যায়, তাহার পরে স্ফূর্ত্তির সহিত মাঠের বা বাগানের ভিতর বেড়ান অনেকেরই অসাধ্য হয়। তবে অবশ্য বসিয়া বসিয়া হাওয়া খাওয়া চলে। ফল কথা, পথ হাঁটার বা খরচের ভয়েই অনেকে অতদূর যাইতে চাহেন না। অবশ্য, যাঁহাদিগের ঘরের গাড়ী বা মোটর্‌কার্ আছে, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র।

যাহার যেখানে যাইবার সুবিধা বা সখ, সে সেখানেই যায়। লাল-

পড়িয়াছে। তবে তাহা প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনে নহে, কৃত্রিম উপায়ে। জ্যামিতির Quadrature of curvilinear area অর্থাৎ Squaring a circle এর সুন্দর দৃষ্টান্ত। ভূমণ্ডলের জলভাগ ক্রমে কমিয়া স্থলভাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, বিশেষজ্ঞগণ নাকি এইরূপ বলেন। ইহা অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটিতেছে। গোলদীঘিতে ভ্রমণের ও ক্রীড়ার স্থানের পরিসর-বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম উপায়ে জলভাগ কমাইয়া স্থলভাগ বাড়ান হইতেছে, ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি। যাক্, সময় ও সামর্থ্যের অভাবে এই সকল গবেষণা শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে পারিলাম না। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন মৌলিক-গবেষকদিগের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইবে। এই সেকেলে অক্ষম লেখক শুধু দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিলেন।

দীঘিতে অন্যান্য স্থানের তুলনায় বাঙ্গালী কম,—সাহেবপাড়া বলিয়াও বটে, বাঙ্গালীপাড়া হইতে দূর বলিয়াও বটে। গোলদীঘি ও হেদুয়া বিশেষ করিয়া ছাত্রসম্প্রদায়ের বিহারভূমি। ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার্ ও বীড্ন্ স্কোয়ারের আয়তন অধিকতর প্রশস্ত বটে, কিন্তু জলাশয় থাকার জন্য বায়ু স্নিগ্ধ বলিয়া গোলদীঘি ও হেদুয়া অধিকতর লোকপ্রিয়। গঙ্গার ঘাট, গড়ের মাঠ ও ইড্‌ন্‌গার্ড্‌ন্ ছাড়া এমন স্নিগ্ধ বায়ু কলিকাতার অন্য কোনও সাধারণ বিচরণ-স্থানে নাই।

গোলদীঘির প্রসঙ্গে একটু গোলমালের কথা আছে। অনেকের মুখে শব্দটি ব্যস্তবৃত্তি হইতে দেখি। যেমন শাস্ত্রে তিন রামের কথা শুনি—পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও বলরাম, তেমনি মির্জ্জাপুর পার্ক্, কলেজ্ স্কোয়ার্, এমন কি ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার্‌কেও গোলদীঘি বলিতে শুনিয়াছি। (শেষেরটিকে গোলপুকুর বলিতেও শুনিয়াছি;) ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের দীঘি বা পুকুর (অর্থাৎ জলাধার) ফল্গুর ন্যায় 'অন্তঃশিলা' ছিল; এক্ষণে উহা শূন্যগর্ভ; মির্জ্জাপুর পার্কে এক সময় একটা দীঘি ছিল বটে (আমরা দেখিয়াছি), কিন্তু তাহা পল্লীগ্রামের 'ডোবা'রও অধম হইয়া পড়িয়াছিল; বহুদিন যাবৎ তাহা ভরাট হইয়াছে; তথাপি তালগাছ-শূন্য তালপুকুরের মত ইহা আজও গোলদীঘি নামে বিড়ম্বিত এবং ইহার দক্ষিণ দিকের গলি মির্জ্জাপুর ট্যাঙ্ক্ লেন্ নামে অভিহিত। অনেকে প্রভেদের জন্য বড় গোলদীঘি ও ছোট গোলদীঘি, অথবা পটোলডাঙ্গার গোলদীঘি ও চাঁপাতলার গোলদীঘি বলে। মির্জ্জাপুর পার্ক্-সম্বন্ধে একটা রহস্য বড় মন্দ নহে। মিউনিসিপ্যালিটির প্রদত্ত ইংরেজী নাম মির্জ্জাপুর পার্ক্ বা স্কোয়ার্ হইলেও বাঙ্গালায় কেহ ইহাকে মির্জ্জাপুরের গোলদীঘি বলে না। কর্ত্তৃপক্ষও লোকমত মান্য করিয়া (তাঁহাদের সেরেস্তায় পার্ক্‌টি মির্জ্জাপুরের নামে অভিহিত হইলেও) মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের

দিকে তাহার গেট্ রাখেন নাই, আম্‌হার্ষ্ট্ ষ্ট্রীটের দিকে রাখিয়াছেন, আর তাহাও খিড়কি বা 'নাচ্‌দরজা'। আর সদর গেট্ রহিয়াছে অখিল মিস্ত্রীর গলিতে। এ জন্য আমরা অখিল মিস্ত্রীর গলির অধিবাসীরা দুই হাত তুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আর একটু নেক-নজর করিয়া যদি এখনকার কর্পোরেশানের কর্ত্তারা 'অখিল পার্ক্' (৩) নামকরণ করিয়া দেন, তবে তো সোণায় সোহাগা হয়; আমরা তারস্বরে স্বরাজ পার্টির জয় ঘোষণা করি।

যাক্, নামকরণ লইয়া আর বেশী বকাবকি করিব না। কেন না যে বিদেশী মহাকবির রচনার পাঠনা করাইয়া দিন-গুজরান হয়, তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"What's in a name"? 'নামে কিবা আসে যায়?' এই 'ছোট গোলদীঘি' লেখকের বাসগৃহের অতি নিকটে বটে, কিন্তু এখানে বৈকালিক বায়ুসেবন, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল থাকিলে অগত্যার পক্ষে ভিন্ন পোষায় না। দুর্ব্বল দেহে আবার ইহা আরও বিপজ্জনক। কেন না এখানে ফুট্‌বল্ খেলার দাপটে মাথা বাঁচাইয়া চলা কঠিন; বেঞ্চে স্থাণুবৎ অচল হইয়া বসিয়া থাকিলেও নিস্তার নাই। অথচ কোন্ সাহসে যে মা-বাপ ছোট ছোট শিশুদিগকে ঝী-চাকরের জিম্মা করিয়া এই রণ-ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেন, তাহা বুঝি না। বোধ হয় ভবিষ্যতে যাহাতে শিশুগণ রণে আগুয়ান হইয়া বাঙ্গালীর 'ভীরু' অপবাদ অপনোদন করিতে পারে, ইহারই জন্য তাঁহারা প্রথম হইতেই শিশুদিগকে ভয়ভাঙ্গা ও ঘাসহা করিতে চাহেন। 'উদারঃ কল্পঃ।' বাঁশকে এইরূপ কাঁচায়

(৩) এই পার্ক্ মহাত্মা গান্ধির চরণরজঃপূত। সুতরাং ইহা শুধু স্বদেশভক্তের পুণ্যভূমি কেন, সর্ব্বজাতির তীর্থ। সে ভাবে ধরিলে অখিল পার্ক্ নামের চরম সার্থকতা হইবে। [সম্প্রতি ইহার 'শ্রদ্ধানন্দ পার্ক্' নামকরণ হইয়াছে।—পুস্তকাকারে প্রকাশকালের টিপ্পনী।]

নোয়ানই তো সুবুদ্ধির কায। তাহা ছাড়া, এখানকার জমি সেঁত-সেঁতে, হয়তো দীঘি ভরাট করার জের আজও মেটে নাই। সে অংশেও শিশুদিগকে এখানে নগ্নপদে দৌড়াদৌড়ি করিতে দেওয়া বা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দেওয়া সঙ্গত নহে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে। যাক্, শিশুমঙ্গল-সমিতির পক্ষ হইতে আমাকে শালিসী মানে নাই, আমার এত কথায় কায কি? প্রৌঢ় লোকের সুবিধা-অসুবিধার কথাই বলিয়া যাই। এখানে কয়েক বৎসর হইতে আর একটি মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে—নিরুপদ্রব অসহযোগ-আন্দোলনের শুভ মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত আন্দোলন ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপারগুলির নানারূপ প্রচেষ্টার রঙ্গভূমি এই মির্জ্জাপুর পার্ক্। কলেজ্ বয়কট্ করার ধর্ম্মঘট তো এই মহাপীঠেই ঘটিয়াছিল। তদবধি সভাসমিতি, শোভা-যাত্রা, খদ্দরমেলা, একটা না একটা অনুষ্ঠান এখানে লাগিয়াই আছে। যেন সেকালের হিন্দুগৃহের বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ! ফলতঃ শান্তিতে ভ্রমণ বা বায়ুসেবন প্রায়শই অসম্ভব। স্বাস্থ্যরক্ষা তো দূরের কথা, 'প্রাণে বাঁচা ভার।' সুতরাং আর দুই পা গিয়া পটোলডাঙ্গার গোলদীঘিতে ভ্রমণই সুবিবেচনার কার্য্য।

কিন্তু সেখানেও বিপদ্ বড় কম নহে। এমন কি, সময়ে সময়ে তাহা ছোট গোলদীঘিকেও ছাপাইয়া উঠে। দিন কতক তো গলাবাজি বনাম লাঠিবাজির জ্বালায় কাণ পাতিতে তথা মাথা পাতিতে পাওয়া যাইত না। সুতরাং সুবুদ্ধির মত গৃহকোণে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, ভ্রমণের সাধ বাসগৃহের দ্বিতলসংলগ্ন সরু বারাণ্ডায় টহল দিয়াই নিবৃত্ত করিতে হইত। তাহার পর, এখানেও সভাসমিতির অভাব নাই, সে সময়ে ভিড়ও বেজায় হয়। তখন গোলদীঘি গোলকধাঁধায় পরিণত হয়। ডাঙ্গায় ফুট্বল্ খেলা না থাকিলেও জলে ওয়াটার্-পোলো (Water-Polo)

আছে অর্থাৎ ডাঙ্গায় বাঘ না থাকিলেও জলে কুমীর আছে; তবে এ কুমীর জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া তাড়া করে না, এই যা' বাঁচোয়া। সন্তরণ প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য ভিড়ও মন্দ হয় না; আর যেদিন প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয়, সেদিন তো প্রবেশ অসম্ভব, বিনা টিকিটে নিষেধও বটে। ইহা ছাড়া কথকতা, গান প্রভৃতি পেশাদারী ব্যাপার আছে, বালকবালিকাদিগের মুখপ্রিয় খাদ্য ও অন্যান্য জিনিশপত্র অল্প-বিস্তর বিক্রয়ের চেষ্টাও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, বিশেষতঃ স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগে খদ্দরে নব অনুরাগের দিনে খদ্দরের ধুতী শাড়ী চাদর, অথবা দেশাত্মবোধের উদ্দীপক পুস্তকাদি লইয়া উৎসাহী যুবকদিগকে বসিতে দেখিয়াছি। তবে এ সকলে ভ্রমণের বা বায়ুসেবনের কোনও বিঘ্ন হয় না, বরং বৈচিত্র্য সংসাধিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তিরও উদ্রেক হয়। চড়কের দিন বৈকাল হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত এখানে হরেক রকম বিক্রেয় বস্তুর মেলা বসে, সে সময়ে ভিড় ঠেলা দুরূহ। যাহা হউক, ইহা বৎসরে এক দিন, তাহাও আবার বৎসরের শেষ দিন, সুতরাং বিঘ্নের খতিয়ানের মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে।

মোটের উপর, এই পটোলডাঙ্গার গোলদীঘিই আমাদের মত নিরীহ নির্জীব-প্রকৃতি দূরগমনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক প্রৌঢ় বা অকালবৃদ্ধের বায়ুসেবনের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোলদীঘি ও হেদুয়া ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রিয় বিহারভূমি। এ কথা গোলদীঘি সম্বন্ধে বিশেষভাবে খাটে। শুধু আজকাল নহে, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের প্রথম আমল হইতেই এখানে ছাত্রগণ অধিষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। অশেষশ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিতে দেখা যায়, এই স্থানে বসিয়া ইংরেজিনবিশ ছাত্রের দল লোককে দেখাইয়া দেখাইয়া মদ্যপান করিয়া ও তাহার অনুপান গোমাংসের শিককাবাব খাইয়া কুসংস্কারবর্জ্জন ও

'সৎসাহসের' 'example set' করিতেন। সে উচ্ছৃঙ্খলতার দিন আর নাই। পরবর্ত্তী কালের ছাত্রদিগের গোলদীঘিতে বসিয়া পান-ভোজনের দৌড় বিড়ি-বাড়সাই ও চীনের বাদামভাজা সাড়ে বত্রিশ ভাজা, বড় জোর, লেমনেড্, কুল্পীবরফের উর্দ্ধে আর উঠে না। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রাবস্থায় এই গোলদীঘি বা কলেজ্ স্কোয়ার্ আমাদেরও বড় প্রিয় ছিল।

বাস্তবিক আমাদের পূর্ব্বের ছাত্রাবস্থা ও এখনকার শিক্ষকের অবস্থা—ইহার মধ্যে যোগসূত্র এই গোলদীঘি বা কলেজ্ স্কোয়ার্। এখনকার ছাত্রদিগের ন্যায় আমরাও এক কালে এইখানে সন্ধ্যায় বিচরণ করিয়া কত গল্প করিয়াছি, কত আলোচনা করিয়াছি, কত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি। (তবে সে সবই পড়াশুনার কথা, এখনকার মত উগ্র রাষ্ট্রনীতি বা উদার সমাজনীতি নহে।) চন্দ্রালোকে সবুজ ঘাসের কোমল আস্তরণের উপর শয়ান অবস্থায় হেমচন্দ্রের—

'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে',
'জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে',
'আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষুঃ মেলি'
'ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল,'
(ভারতসঙ্গীত ও ভারতবিলাপ),

নবীনচন্দ্রের 'এই কি পলাশীক্ষেত্র ?'
'কোথা যাও ফিরে চাও, সহস্রকিরণ',
'দাঁড়া রে দাঁড়া রে ফিরে',

ও তখনকার দিনে উদীয়মান রবিকবির 'অয়ি সন্ধ্যে, অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী কেশ এলাইয়া,' 'জ্যোতির্ম্ময় তীর হ'তে আঁধার-সাগরে ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,' ইত্যাদি কবিতা যুগল-বন্ধুতে আবৃত্তি করিয়াছি অথবা সুহৃজ্জনের সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতসুধা পান করিয়াছি, আজ সে সব

কথা মনে হইলে একটা বেদনা-মিশ্রিত আনন্দ অনুভব করি, এ যেন সেই বৈষ্ণব-কবি-বর্ণিত 'বিষামৃত'।

আজ সেই সব সহাধ্যায়ী বা সমকালিক ব্যক্তিদিগের অধিকাংশ পরলোকে; যাঁহারা টিকিয়া আছেন, তাঁহাদেরও 'পাত্তা' পাওয়া যায় না, কে কোথায় কি ভাবে আছেন তাহার ঠিকানা নাই; যদি কালেভদ্রে দেখা হয়, তাহা হইলে আর সে গালভরা হাসি, সে বুকভরা আগ্রহ, সে প্রাণখোলা রহস্যালাপ, সে সরল ও সরস কথা-বার্ত্তা শুনা যায় না, সে নিবিড় প্রীতি-আলিঙ্গন, প্রেমিক-যুগলের মত সে গলাগলি করিয়া পাদচারণ,—এ সব তো এখন বালসুলভ চাপল্য বলিয়া ধিক্কৃত হইবে। এখন তাহার বদলে দেখি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, ওজনকরা কথাবার্ত্তা, পরস্পরের আর্থিক উন্নতি-সম্বন্ধে তুলনায় সমালোচনা, অথবা সংক্ষেপে 'কাষ্ঠহাসি' ও 'কাষ্ঠনকুতা'। সে সহৃদয়তা, সে সরসতা, সে স্নেহশীলতা, সে সমবেদনা, এখন আর বন্ধুবর্গের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে না, তাহা এখন সঙ্কীর্ণ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। হায় রে সে দিন! তথাপি যৌবনের ভালবাসার এমনই মোহ যে, দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শয়িত অবস্থায় যখন এ পারের সকল বন্ধন-চ্ছেদনের সম্ভাবনা বলবতী হইয়াছিল, তখন কতবার মনে হইয়াছে, যদি একটিবার সেই সব যৌবনের সুহৃদদের দেখা পাই। যাক্, এ সব উচ্ছ্বাসের কথা।

ছাত্রাবস্থার অবসানে শিক্ষকতাব্রত অবলম্বন করিয়া কয়েক বৎসর মফস্বল কলেজে অজ্ঞাতবাসের পর যখন কলিকাতার কলেজে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, (১০৫ পৃঃ), তখন ভুক্তভোগী সমব্যবসায়ী কর্ম্মসহচর বন্ধুর প্ররোচনায় বহুকাল গোলদীঘিমুখো হই নাই—কতকটা পূর্ব্বানুভূত সুখের অভাবের তীব্র অনুভূতির আশঙ্কায়, আর কতকটা সঙ্কোচবশতঃ—কেন না ছাত্রেরা অনেক সময় আমাদের শ্রেণীর জীবের পাঠনায়

পটুতা বা অপটুতা-বিষয়ে তুলনায় সমালোচনা করে, তাহা তাহাদিগের পক্ষে মুখরোচক হইলেও আমাদের পক্ষে হৃৎকর্ণরসায়ণ নহে, বুড়া ঈশপের কথায় 'Sport to them but death to us' (তাহাদের পক্ষে আমোদ-প্রমোদ কিন্তু আমাদের পক্ষে মরণ-সমান)! কিন্তু ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিয়া এখন মনের স্থৈর্য্য হইয়াছে, নিন্দা-স্তুতিতে বিচলিত হইবার বয়স কাটিয়াছে, পরপারের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছি, এখন এ পারের উপল-কঙ্করে আর পদতল ব্যথিত হয় না। নিজের আধিব্যাধির মধ্যেই সমাধিস্থ হইয়া আছি। ছাত্র-সম্প্রদায়ও এখন আর তুচ্ছ পরীক্ষা ও পাঠ্যপুস্তকের কথা, শিক্ষকের পাঠনাপটুতার কথা লইয়া, বৃথা সময় অপব্যয় করে না, তাহারা এখন স্বরাজ, অসহযোগ, অবনত জাতির উন্নয়ন, নারীসমস্যা, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা, প্রভৃতি বড় বড় কথার আলোচনা করে, আমরা অবজ্ঞাত, অবহেলিত, বিস্মৃত। ইহাতে যদি কোনও কোনও 'ঝুনো' শিক্ষকের মনের কোণে একটু অভিমান সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে নিরুপায়। হয় তো তখনকার নিন্দাতেও তাঁহারা বেদনার মধ্যেও একটু সুখ পাইতেন—ছাত্রবর্গের আলোচনার কেন্দ্রী পুরুষ বলিয়া!

যাক্ এ সব ব্যক্তিগত ব্যবসায়গত কথা লইয়া আর পাতা ভরাইব না। গোলদীঘিতে অপরাহ্নে ও রজনীর প্রথম যামে দলে দলে যুবক ছাত্র বিরাজ করে, তন্মধ্যে মুষ্টিমেয় বৃদ্ধ 'হংসমধ্যে বকো যথা'—গণনার মধ্যেই আসেন না। জগতে বৃদ্ধের তুলনায় যুবার সংখ্যা অনেক অধিক, অতএব ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু প্রাতে ঠিক এই অনুপাতটি রক্ষিত হয় না। তখন ছাত্রগণ 'দেয় মন নিজ নিজ পাঠে'; সুতরাং সন্তরণ-শিক্ষার্থী ভিন্ন অন্য শ্রেণীর যুবক এ সময়ে বড় একটা দেখা যায় না। যাহাদের জীবনের প্রভাত, প্রভাতে তাহারা বিরলদর্শন, আর যাহাদের জীবন-

সায়াহ্ন, সায়াহ্নে তাহারা বিরলদর্শন—বিধাতার বিপরীত বিধান বটে! প্রাতে অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক বৃদ্ধকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, নিজেও অকালবার্দ্ধক্যের দাবীতে তাঁহাদিগের দলে ভিড়িয়াছি; কিন্তু সে কেবল রোগমুক্তির পর প্রথম অবস্থায়। সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হওয়ার পর প্রভাতে উঠিয়া অভ্যাসমত লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। (আবার ব্যক্তিগত কথা আনিয়া ফেলিলাম।) যে কয়েকজন বৃদ্ধ সান্ধ্য-ভ্রমণে আসেন, তাঁহারা প্রাতের ন্যায় অবাধ-ভ্রমণের তেমন সুবিধা পান না, নিয়মরক্ষার জন্য ২।১ পাক দিয়া ভিড়ের ভিতর ঠেলাঠেলির ভয়ে আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন; আর বেঞ্চে সুখাসীন হইয়া বিশ্রব্ধালাপ করেন—অনেক স্থলেই নিজ নিজ সাংসারিক শান্তি-অশান্তির কথা, নিজ নিজ শারীরিক স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্যের কথা, অথবা ধর্ম্মকথা। তবে ইঁহাদিগের মধ্যে ২।৪ জন এমন সুস্থ ও সজীব ব্যক্তিও আছেন যাঁহারা এই 'পশ্চিমে বয়সি' আধিব্যাধি শোক-তাপ সহিয়াও যুবকের মত উদ্যমে অথচ প্রবীণের মত বিজ্ঞতার সহিত দেশের ও জাতির মঙ্গলামঙ্গলে, রাষ্ট্রনীতির বা সমাজনীতির জটিল সমস্যার, আলোচনা ও সমাধান করেন। এই সকল শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা এখন গোলদীঘি হইতে তথা পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, রাত্রিভোজনের কাল সন্নিহিত হইয়াছে। আর অধিক বিলম্ব করিলে গৃহিণীর নথনাড়া ও পাঠকবর্গের নিকট তাড়া খাইবার আশঙ্কা আছে।

পুরীপ্রবাস [১]

('অলকা', বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০)

অবতরণিকা

অনেক দিন হইতে পুরীতে পুরুষোত্তম বা দারুব্রহ্ম-দর্শনের মানস এবং 'দারুভূত মুরারি'র 'বসতি জলধি' অর্থাৎ সমুদ্র-দর্শনের সাধ ছিল। সশরীরে না হইলেও, মনে মনে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরীতে সমুদ্রতীরে বাঙ্গালী-কর্তৃক বাঙ্গালীর জন্য স্থাপিত, কিন্তু ইংরেজী নামে অভিহিত, পান্থনিবাস ভিক্টোরিয়া ক্লাবের অনুষ্ঠান-পত্র (prospectus) পর্য্যন্ত আনাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এখনও সে থানি ধূলিপটলসমাচ্ছন্ন অবস্থায় র‍্যাকের উপর অযত্নবিন্যস্ত বাজে কাগজ-পত্রের মধ্যে রহিয়াছে। লেখকের উক্তির সত্যতা (bona fide)-প্রমাণের দলিলগত সাক্ষ্য (documentary evidence) আর ইহা অপেক্ষা কি হইতে পারে ?

কিন্তু এই সাধ পূর্ণ হইবার পথে অনেকগুলি বাধা ছিল। প্রধান বাধা, কর্ম্মস্থান ছাড়িয়া বাহির হইবার সুযোগ ঘটিলেই অর্থাৎ লম্বা ছুটি পাইলেই,

---

(১) এই বিবরণ কি কারণে অসম্পূর্ণ আছে তাহা প্রবন্ধের শেষের মন্তব্যে দ্রষ্টব্য। যে সকল পাঠক উদ্দীপ্ত কৌতূহল নিবৃত্ত না হওয়াতে ক্ষুণ্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে এই প্রবন্ধ-প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশিত 'পুরীর চিঠি' (শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী-প্রণীত) এবং ইহার পরে প্রকাশিত, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু-লিখিত ও 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক-ভাবে মুদ্রিত (১৩২৯—৩০) প্রবন্ধাবলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এগুলি এখন পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। উভয় পুস্তকই উপাদেয়।— [পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।]

৺বিশ্বনাথের টান এত প্রবল হইত যে, ৺জগন্নাথের টান তাহার কাছে জোর ধরিতে পারিত না। কলির জীবের পাপমলিন মন লইয়া দেবতায় দেবতায় দ্বন্দ্ব—tug-of-war—ক্ষুদ্র-বুদ্ধি আমরা ইহার অর্থ কি বুঝিব ?

ইহা ছাড়া, পুরী-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আত্মীয় বন্ধুগণ ঐ স্থানের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিয়া কাণ ভারি করিয়া দিয়াছিলেন। যথা, প্রভাতে ষ্টেশনে পৌঁছিলেই সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অনিদ্রাকাতর ও রেল্‌গাড়ীর ভিড়ের ঠেলায় ক্লান্ত পান্থকে পাণ্ডার ফৌজ ও তাহাদের ছড়িদার বা অনুচরবর্গ মোটা মোটা খাতা খুলিয়া চৌদ্দ পুরুষের খবর জানিবার জন্য, 'কি জাতি কি নাম ধর, কোথায় বসতি কর,' পিতৃপিতামহের পরিচয় কি, ইত্যাদি প্রশ্নপরম্পরায় হায়রান পেশান করিয়া তুলিবে। বাণিজ্য-প্রধান জাতি-সকলের দেশে customs-houseএর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্ম-চারিবর্গের অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসাবাদও ইহার মত বিরক্তিকর নহে। তাহার পর, এই পাণ্ডা-পল্টনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাণে প্রাণে পুরুষোত্তমের পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিলে, জগন্নাথক্ষেত্রের আনন্দ-বাজারে ছত্রিশ জাতির স্পৃষ্ট, এমন কি উচ্ছিষ্ট, পর্য্যুষিত 'পকাল' (পান্তা) ভাত যে-সে আসিয়া মুখে গুঁজিয়া দিবে, মুখ ফিরাইবার বা বুঁজিবার যো নাই, তাহা হইলেই দেবতার দুয়ারে অপরাধ হইবে, এ কথা শুনিলে কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব আসিত, আজন্ম ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে [২] কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিত।

---

(২) ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার কতদূর প্রবল ও দৃঢ়মূল, তাহার একটি বিস্ময়কর প্রমাণ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'আত্মচরিতে' পাওয়া যায়। তিনি যখন 'অন্তরে ব্রহ্মভাবাপন্ন', তখনও "অন্ত্য জাতীয়া স্ত্রীলোকের রাঁধা ভাত মাটীর সানকে খাইয়া সমস্ত রাত্রি এত গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়াছিল যে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই।" (আত্মচরিত ২য় সংস্করণ ১০৯ পৃঃ)। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী-লিখিত জীবন-চরিত, ৯০ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

(যদিও এক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ বিধি ভিন্নরূপ।) ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া, 'হস্তদ্বারা স্পর্শিত নহে' যে বিংশ-শতাব্দীর স্বাস্থ্যতত্ত্বের, খাদ্য-বিভাগের, বিজ্ঞানসম্মত ছুৎমার্গের একটা বড় কথা ও পাকা কথা ইহা তো ভুলিতে পারি নাই।

আবার, পুরা-সহরের সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে শ্রুত হইয়াছিলাম যে এ স্থান উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগের নিত্য লীলাস্থল, আর রথযাত্রার অব্যবহিত পরেই বিসূচিকা সংক্রামক ও সংহার-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া ভক্ত যাত্রি-দিগকে সদ্যঃ সদ্যঃ মুক্তিদান করে। ইহার উপর, আমাদের মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ সমুদ্রকূলের যে অংশে বাসা লইতে সমর্থ, সেই অংশে ('স্বর্গদ্বারে') প্রত্যেক বালুকণায় নাকি pthisisএর bacilli—বানরের রোমশ গাত্রে উৎকুণের ন্যায়—কিলবিল করিতেছে, তথায় ত্রিরাত্রি বাস করিলেই যক্ষ্মারোগের বীজ শ্বাসযন্ত্রে সঞ্চারিত হইবে, অত্র সন্দেহো নাস্তি। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, সমুদ্রতীরে বাসের সুখ—ঘরে দ্বারে, শয্যায় আসনে বাসনে, ভাতে ডালে তরকারীতে, ঝোলে জলে দুধে, বালি কিচকিচ করিবে, রোজ অন্ততঃ এক মুষ্টি বালি উদরস্থ হইবে, তাহার ফলে উদরভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী, এরূপ কথাও শুনিয়াছিলাম। লোভনীয় সামুদ্রিক মাছ ও কাঁকড়া খাইলে তো পেটের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। আহারের তো এই হাল। তাহার উপর স্নানের ব্যবস্থাও কম হাঙ্গামের নহে। 'নুলিয়া'-নামক জেলিয়াকুলের সহকারিতা-ব্যতীত সমুদ্রস্নানে হাত পা ভাঙ্গা বা মচকান, মাথা ফাটা, বুকে বাজা, ঘাড় মটকান, মুখ থুবড়ান, হাঁটু ও কনুই বালিতে ঘষড়াইয়া ছাল-চামড়া উঠা, স্থূলোদর ব্যক্তির পেট ফাঁসিয়া যাওয়া, এমন কি শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটার লোমহর্ষণ বিবরণ শুনিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ফল কথা, এই সকল নানারূপ আতঙ্কের সমবায়ে মনটা এমন দমিয়া গিয়াছিল যে,

পুরীপ্রয়াণ-বিষয়ে ইতস্ততঃ যথেষ্টই ছিল। অথচ একটা কৌতূহল, একটা আকর্ষণ, একটা লোভ, একটা মোহ, বরাবরই প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। ইহা ঠিক পুণ্যপিপাসুর 'দয়াসিন্ধুবন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধু-সদনে (সুতয়া ?) জগন্নাথ-স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে' এবম্বিধ আকুল প্রার্থনা নহে, বরং বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারের সমুদ্র-দর্শনস্পৃহার সহিত ইহার মিল অধিক।

এতদিনে বর্ত্তমান বর্ষের দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে ৺জগবন্ধুর কৃপায় বহুদিনের সাধপূরণের শুভ সুযোগ মিলিয়াছিল। ৺জগবন্ধুর কৃপা—কথাটা শুধু একটা (cant phrase) বাঁধা গৎ মামুলি বুলি হিসাবে বলিতেছি না। বাস্তবিকই এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর করুণার সুস্পষ্ট নিদর্শন পদে পদে পাইয়াছি। প্রথম নিদর্শন—কলেজের চিরাগত প্রথা (বলিলে অত্যুক্তি হইবে না) গ্রীষ্মাবকাশ চৈত্র-সংক্রান্তি বা তাহার ২।৪ দিন আগে বা পরে হইতে আরম্ভ হয় এবং জুলাই মাসের প্রথমেই কলেজ খোলে। এবার নানা কারণে ছুটির সময় সরিয়া নড়িয়া আরম্ভ হইল বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি—আর শেষ হইল রথযাত্রার কেন, পুনর্যাত্রারও পরে। এমনটি আর কখনও ঘটে নাই—একেবারে অভাবনীয়। সুতরাং মনে ধারণা হওয়া অসঙ্গত নহে যে, আমাদের মত অধম অকৃতীকে 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা' কৃতকৃতার্থ করিবার জন্যই ইচ্ছাময়ের এই অপূর্ব্ব লীলা। এই ধারণায় 'মন চাঙ্গা' করিয়া, পুরীর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ শুনিয়া শুনিয়া দ্বিধাগ্রস্ত-চিত্ত হইলেও, তথায় গ্রীষ্মযাপনের অভিপ্রায় স্থির করিলাম। পারত্রিক মঙ্গল ছাড়া একটু ঐহিক মঙ্গলের আশায়ও এই ইচ্ছার উদ্ভব হইল। দুইমাস ধরিয়া মাথা ঘোরায় (giddiness) ভুগিতেছিলাম (ডাক্তারের মতে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া), পুরীর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় ও সমুদ্রবায়ুর প্রভূত (ozone) ওজোন্-গ্রহণে

মস্তিষ্কের উপকার হইবে আশা করিলাম। অকালে তীর্থদর্শন-সম্বন্ধে নিষেধ-বাক্যের একটা প্রতিপ্রসব আছে, সংক্রান্তিতে দর্শনে সে দোষ কাটিয়া যায়; তদনুসারে বৈশাখ-সংক্রান্তিতে দর্শন করিব এই সঙ্কল্প করিয়া মধ্যের কয়েকদিন উদ্‌যোগপর্ব্বে কাটাইলাম। ঘরকুণো বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা যে দক্ষিণমেরু-অভিযানেরই তুল্য, সুতরাং উদ্‌যোগ-পর্ব্বটা অধিক সময় লওয়া আর বিচিত্র কি?

উদ্‌যোগ-পর্ব্ব

একপক্ষ কাল যখন উদ্‌যোগপর্ব্বে গেল, তখন কৈফিয়ত-হিসাবে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া ভাল। কাশীতে বহুবার গিয়াছি, সুতরাং সেখানকার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আর সেখানে অনেক আত্মীয়ও আছেন। সেজন্য তথায় বাসা পাইবার জন্য কোনও বার বেগ পাইতে হয় নাই—যদিও সকল বার ভাল বাড়ী পাই নাই। কিন্তু পুরীতে সুবিধামত বাড়ী পাওয়া একটা সমস্যা। জলে নামিয়া সাঁতার শেখার চেষ্টার ন্যায়, কলিকাতা হইতে পা না বাড়াইয়াই পুরীতে বাসা ঠিক করার চেষ্টায় লাগিয়া গেলাম। পুরীতে কোনও পরিচিত লোক না থাকাতে এই সমস্যা-সমাধানের কোনও সহজ উপায় মিলিল না। অগত্যা কলিকাতার উত্তরে অন্যূন তিন শত মাইল্ দূরবর্ত্তী কুচবিহার-প্রবাসী একটি বন্ধুকে কলিকাতার দক্ষিণে অন্যূন তিন শত মাইল্ দূরবর্ত্তী পুরীনিবাসী পাণ্ডাকে পত্র লেখাইয়া, ইহার একটা সুরাহা করিবার জন্য ধরিয়া বসিলাম। (তাঁহার অপরাধ, তিনি ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে একবার পুরী গিয়া মাস দুই ছিলেন।) এ যেন মস্তক-পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক নাসিকাপ্রদর্শনের প্রয়াস! ইহাতেও নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, কলিকাতার যে সব ব্যক্তির পুরীতে বাড়ী আছে,

একটি বন্ধুকে মুরুব্বি পাকড়াইয়া তাঁহাদিগের নিকট হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করিলাম। কিন্তু ইহাতে কার্য্য এক ধাপও (!) অগ্রসর হইল না। বাড়ীওয়ালারা নিজের বাড়ী খালি আছে কি না নিজেই তাহার তত্ত্ব রাখেন না, স্থানীয় এজেণ্টের উপর ভার। তাঁহারা এজেণ্ট্‌কে লিখিবেন. এজেণ্ট্‌ তাঁহাদিগকে লিখিবে। পরে আবার মালিকের বাড়ীতে ধরনা দিয়া আমাকে সে সংবাদ লইতে হইবে, ইহাতে কালব্যয় আছে, কষ্টভোগ আছে, অথচ একটা চরম ব্যবস্থাও (Finality) হয় না। দিন কতক এই লুব্ধ আশ্বাসে থাকিয়া শেষটা এ পথ পরিহার করিয়া কুচ-বিহারের বন্ধুটিকে লিখিলাম তিনি যেন পাণ্ডাকে সরাসরি ভাবে আমার সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিতে বলেন। পাণ্ডা যথাসময়ে ও যথানিয়মে জানাইলেন, 'পুরীধামে সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বারে' বাসা ঠিক। (কাশীর 'আনন্দ কাননে রুদ্র সরোবরে গৌরীপীঠে' মনে পড়িয়া গেল।) কিন্তু ত্রিশ বৎসরের অধিককাল ছেলে পড়াইয়াও ঘটে যে টুকু বুদ্ধি আছে, তাহারই জোরে সন্দেহ করিলাম, এটা হয়তো ব্যবসাদারী চাল—যজমান ত যুটুক, তাহার পর যা হয় একটা হিল্লে করা যাইবে। পৌঁছিয়া দেখিলাম, ঠিক যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই। পাণ্ডা ঠাকুর মহা সপ্রতিভভাবে যাত্রী-তোলান বাড়ীতে তোলাইলেন ও আহারের জন্য প্রসাদের যোগাড় করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমাদের আসিতে বিলম্ব হওয়াতে সমুদ্রতীরের সে বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক তিন দিন তীর্থবাসের পর মুস্কিল-আসান হইয়াছিল। ইহাও জগবন্ধুর কৃপার আর একটি নিদর্শন। সে কথা যথাস্থানে বলিব।

একজন সহকর্ম্মী (colleague) লম্বা ছুটিটা কোথায় কাটাইবেন, সে সম্বন্ধে এতাবৎকাল কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। অনেকটা 'কাশী যাই কি মক্কা যাই' ভাব। কাশী ও প্রয়াগে

তাঁহার পরমাত্মীয়গণ বিরাজ করিতেছেন, এই জন্যই তিনি কাশী, প্রয়াগ বা বিন্ধ্যাচল এই তিনটি স্থানের কোন্‌টিতে যাইবেন এসম্বন্ধে অস্থিতপঞ্চকে পড়িয়াছিলেন, অথচ 'পশ্চিমে'র প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ভয়ঙ্কর "লু"র ভয়ে কোনটিরই উপরে ভরসা পাইতেছিলেন না। এই সন্ধিক্ষণে মুমূর্ষুর কর্ণে তারকব্রহ্ম নামের ন্যায়—ভক্তের কর্ণে মধুর হরিনামের ন্যায়—আমি তাঁহার কর্ণে শ্রীক্ষেত্রের নাম কীর্ত্তন করিলাম। তিনি পূর্ব্বে ২।১ বার পুরী গিয়াছিলেন, এবারও পুরীর কথা ২।১ বার ভাবিয়াছিলেন। আমি (নিজের গরজে) পুরী যাইতেই তাঁহাকে ভজাইলাম, তিনিও ভজিলেন। শুধু তাহাই নহে, আমার যাত্রিক দিনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আমার অগ্রগামী—(harbinger, pioneer, advance-guard, forlorn hope, 'to prepare the way for the Lord'. ইংরেজীতে ছাইভস্ম যাহা হয় বলুন)—হইয়া (সস্ত্রীক) পুরী যাত্রা করিলেন। ফল কথা, তিনিই আমার 'উদ্ধবদূত' হইলেন। কথা থাকিল, তিনিই পাণ্ডার সহিত দেখা করিয়া তাহার সহযোগে আমার জন্য বাড়ীর সন্ধান করিবেন, সুবিধা-মত বাড়ী পাইলে, চাই কি, আমরা দুইটি পরিবার একত্র থাকিব। (পুরীতে এরূপ বন্দোবস্ত আক্‌সার ঘটে।) তাঁহার শুভাদৃষ্টবশে তাঁহার নিজের বাসের একটি সুন্দর সুবিধা হইল, একজন ধনী বন্ধুর প্রশস্ত ভবনে তাঁহার বসবাসের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু আমার জন্য দশদিন দশরাত্রি চেষ্টা করিয়াও তিনি একটিও খালি বাড়ী পাইলেন না।

যাহা হউক, এ অধমের তিন দিন জগবন্ধুর সান্নিধ্য-লাভের পর তিনি 'স্বর্গদ্বারে' [৩] একটি ছোট বাড়ী আমার জন্য আবিষ্কার করিলেন।

---

(৩) বার বার তিনবার 'স্বর্গদ্বারে'র উল্লেখ করিলাম, কিন্তু যে সকল পাঠকের ভাগ্যে কখনও পুরী যাওয়া ঘটে নাই, তাঁহারা শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন না। পুরীর

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়

(৯২ পৃঃ, ১০৮ পৃঃ)

বাড়ীটি ছোট হইলেও ভাড়ায় পোষাইয়া লইয়াছে—'হরে দরে হাঁটুজল' যাহাকে বলে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাড়ীটি আমাদেরই জেলার একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের। তিনি যে তাঁহার সুখাবাসের জন্য বহুব্যয়ে নির্ম্মিত সুরম্য দ্বিতল হর্ম্ম্যের পার্শ্বে আমাদের মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ভাড়া লওয়ার উপযোগী একটি ক্ষুদ্র একতালা বাড়ী অল্পব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেজন্য ৺জগবন্ধু তাঁহার মঙ্গল করুন।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ আজকাল 'ছুটিতে হাওয়া খাওয়া'র ফ্যাশানের নিন্দা করিয়া বলেন যে, ইহার ফলে বিদেশে অজস্র খরচ করিয়া স্বদেশকে দরিদ্র করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি দূরপ্রবাসেও যে দেশস্থ জমিদারের তহবিলেই অর্থাগম (তাহা যত সামান্যই হউক) ঘটাইয়াছি, আশা করি সে জন্য আমি উঁহাদিগের প্রশংসা পাইব। সে যাহা হউক, এই মাথা গুঁজিবার স্থানটুকু পাইবার জন্য আমি বিশেষভাবে আমার সহকর্ম্মী বন্ধুটির নিকট কৃতজ্ঞ। ৺জগবন্ধু তাঁহার মঙ্গল করুন। [৪]

তীর্থের পথে

পুরী পৌঁছানর—এমন কি পুরী রওয়ানা হওয়ার সংবাদ দিবার পূর্ব্বেই পুরীতে বাসা পাওয়ার কথা বলিয়া বসিয়া প্রক্রমভঙ্গ-দোষ করিয়া ফেলিলাম—এ যেন 'রাম না হইতেই রামায়ণ'। এইবার যাত্রার

সমুদ্রতীরবর্ত্তী শ্মশান এই নামে অভিহিত। স্বর্গদ্বারই তো বটে! [পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।]

(৪) দুঃখের বিষয় বন্ধুটি (৺নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত) অনেকদিন রোগভোগের পর গত আশ্বিন মাসে প্রয়াগধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন।—[পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের মন্তব্য।]

কথা বলি। বৈশাখ-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন পুরী এক্‌সপ্রেস্ ধরিবার জন্য বেলা থাকিতেই, সুতরাং নৈশভোজন না করিয়াই, পেটরা বিছানা পোঁটলাপুঁটলী তৈজসপত্র পুত্রকলত্র ঘোড়ার গাড়ীতে বোঝাই করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হইলাম। ট্রেন্ যদিও রাত্রি ৮৷৷৹ টায় ছাড়ে, তবুও ভয়ানক ভিড় হয় বলিয়া বেশ একটু আগে হইতেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, ট্রেন্ in হইবামাত্র যাহাতে উঠিতে পারা যায়। উঠিলামও তড়িঘড়ি, কিন্তু ভিড়ের অভাব হইল না। ভাবিলাম শূন্যোদরে আসিয়া ভালই করিয়াছি; এমনই কষ্টেসৃষ্টে স্থান হয়, পূর্ণোদর হইলে তো আরও স্থানাভাব ঘটিত। কিছুদিন পূর্ব্বে সাহিত্যসম্মিলন-উপলক্ষে মেদিনীপুর গিয়াছিলাম। সেই আমার বেঙ্গল্-নাগপুর রেল্‌ওয়েতে প্রথম ভ্রমণ। এইবার দ্বিতীয় কিস্তি। শুনিয়াছিলাম পুরী এক্‌সপ্রেস্ হাওড়া হইতে একটানা খড়্গাপুর পর্য্যন্ত লম্বা দৌড় দেয়, মধ্যে কোথাও থামে না। কিন্তু কাযে দেখিলাম অন্যরূপ; এই পথটার মধ্যে ট্রেন্ একাধিক বার থামিল, এবং শুধু এই পথটুকুতে কেন, বরাবর দেখিতে দেখিতে আসিলাম, এ লাইনের গাড়ী একবার থামিলে আর নড়িতে চাহে না। উড়িষ্যার বাতাস লাগিয়া এই গয়ংগচ্ছ ভাব কি না কে জানে? ফলে প্রায় দুই ঘণ্টা (লেট্ হইয়া) বিলম্বে ট্রেন্ ঠিকানায় দাখিল হইল। কলিকাতার দগ্ধারণ্য ছাড়িয়া আসিয়া প্রত্যূষকাল হইতে লক্ষ্য করিতেছিলাম, দু'ধারে অগণিত নারিকেল ও তালগাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া (?) রহিয়াছে; এ দৃশ্যের সৌন্দর্য্য তো উপলব্ধি করিলামই, পরন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগের দিক্ হইতেও বুঝিলাম যে ডাব নারিকেল তাল-শাঁস ও বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল পুরীতে বেশ সুলভে মিলিবে।

ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত বন্ধু ও পাণ্ডার ছড়িদার উভয়কেই উপস্থিত দেখিলাম। তাঁহাদিগের সাহায্যে দুইখানি মানুষে-টানা গরুর

গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করিলাম ও নিজেরাও উঠিলাম। এখানকার এটা নূতনতর বটে। ডাণ্ডি, পুস্‌পুস্, রিক্‌স জানি বটে, মানুষে-টানা গরুর গাড়ী—এ যেন সোণার পাথরবাটী। ইহা বোধ হয় উড়িষ্যার নিজস্ব, বিশেষত্ব। যে কারিগর ঠুঁটো জগন্নাথ-মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন তিনিই বোধ হয় এই অপূর্ব্ব যানেরও প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। অনেকে (বিশেষ করিয়া তীর্থক্ষেত্রে) গরুর কাঁধে উঠিতে আপত্তি করেন, তাঁহাদের আপত্তিখণ্ডনের জন্যই কি এই বিধান? বুঝিলাম গোজাতির প্রতি যে ভক্তি, মনুষ্যজাতির প্রতি সে ভক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। (পরে সাক্ষি-গোপাল ষ্টেশন্ হইতে উক্ত দেবতার মন্দিরে যাইতে ইহা অপেক্ষাও উদ্ভট গোযানে চড়িয়াছি—গোযানে একটি মানুষ ও একটি গরু যোড়া, রফা বন্দোবস্ত বটে।) শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত সমস্ত পথ—"কোথা হইতে আসিয়াছেন, বাড়ী কোন্ জিলা, পাণ্ডা কে?" এই প্রশ্নবৃষ্টিতে এক পাল পাণ্ডা ও পাণ্ডার অনুচর বিব্রত করিয়াছে; সঙ্গে আমার পাণ্ডার ছড়িদার থাকিলেও প্রশ্নবৃষ্টির নিবৃত্তি হয় নাই; নিজে তো প্রথম হইতেই রণে ভঙ্গ দিয়াছিলাম, ওয়াকিবহাল বন্ধুটিও কৈফিয়ত দিতে দিতে ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইলেন। কখনও রোষ কখনও বিনয় প্রকাশ করিয়াও, কখনও বীররস, কখনও করুণরসের অবতারণা করিয়াও, অব্যাহতি পাইলেন না। 'বোবার শত্রু নাই' এই প্রবাদবাক্য পরখ করিতে গিয়াও বিফল-প্রয়াস হইতে হইল। যতক্ষণ না সেই 'চিচিং ফাঁক'-গোছের pass-wordটি প্রকাশ পাইল, পাণ্ডার তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারিত হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পাই নাই। পাণ্ডার ছড়িদারের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-রূপ মূক-অভিনয়েও ফল হইল না। বরং সেজন্য টিট্‌কারী খাইতে হইল। 'এও কপালে ছিল?' খাস কলিকাতায় একাদিক্রমে বিশ-পঁচিশ বৎসর বাস করিয়াও উড়িয়ার টিটকারী হজম করিতে হইল।

কবি ঠিকই বলিয়াছেন—'স্থানং প্রধানম্।' বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে—'বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত নহে।'

শ্রীমন্দিরে

প্রশস্ত রাজপথ ('বড় ডাণ্ডা') অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্দিরের পূর্ব দরজা বা সিংদরজায় অরুণস্তম্ভের সম্মুখে পৌছিয়া পাণ্ডার নির্দ্দিষ্ট বাসায় মালপত্রসহ পুত্রদ্বয় ও বন্ধুটিকে পাঠাইয়া দিয়া পাণ্ডার ছড়িদারের সঙ্গে ৺জগবন্ধু দর্শনোদ্দেশ্যে সস্ত্রীক সেই বাসি কাপড়ে ধূলোপায়ে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ইহাই নাকি এখানকার রীতি। ইহাকে 'ঝাঁকি দর্শন' বলে। ইহাতে কালাকাল শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নাই। থাকিবেই বা কেন? "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ।" যে দেবতার স্মরণের এত মাহাত্ম্য, তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনে তো সর্ব্ব অশুচিতা, অগ্নিস্পর্শে তৃণের ন্যায়, বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা যখন গরুড়স্তম্ভের পাদমূলে দণ্ডায়মান হইলাম (প্রথমে এইখান হইতে দর্শন করিতে হয়, মহাপ্রভু এইরূপ করিতেন, এখনও তাঁহার শ্রীহস্তের চিহ্ন স্তম্ভগাত্রে পরিদৃষ্ট হয়) তখন কি কারণে গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল। (দিনের মধ্যে এরূপ অনেকবার দ্বার রুদ্ধ হয়।) কিন্তু বাঞ্ছাকল্পতরু সে অবস্থায়ও ভক্তকে বঞ্চিত করেন না, দুয়ারে দুইটি নাতিক্ষুদ্র ফোকর দিয়া দর্শনলাভে ধন্য হইলাম। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা হস্তপদহীন, সুদর্শন চক্র শুধু ডাঁটটা। তখনকার মত এই ত্রিমূর্ত্তি ও অপর তিনটি মন্দিরে বিমলা (৫১ পীঠের অন্যতম), লক্ষ্মী ও সত্যভামা এই দেবীত্রয়কে দর্শন ও প্রণাম করিয়া পরকালের কার্য্য করিয়া ইহকালের কার্য্যের তাড়ায় বাসা-অভিমুখে দ্রুতপদে রওনা হইলাম। মন্দিরের বিশাল চত্বরে বহুতর মন্দির ও মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবদেবী

আছেন, তাঁহাদিগকে নিঃশেষে দর্শন করিবার সে সময় নহে, আত প্রয়োজনও নহে।

বাসাটি শ্রীমন্দিরের পূব দরজার ঠিক সম্মুখে—রাধাবল্লভ মঠ। তথায় পৌছিয়া মুখপাত-স্বরূপ পায়খানা দেখিয়াই হরিভক্তি উড়িয়া গেল। শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের পরেই এই বীভৎস দৃশ্য নয়নগোচর করা—প্রকৃতই স্বর্গ হইতে নরকে পতন ; যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনও ইহার কাছে হারি মানে। তাহার পর, বাসায় শয়নঘর পাওয়া গেল বটে, কিন্তু পাকঘর পাওয়া গেল না। কেন না একটি মাত্র পাকঘর, কলিকাতা হইতে বায়ুপরিবর্ত্তন তথা তীর্থ-দর্শনের জন্য আগত বহু-পরিবার দুইটি ভদ্রলোক সাজায় দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারা অষ্টাহ বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং দখলি স্বত্ব জন্মিয়াছিল, উচ্ছেদ করা অসাধ্য। অগত্যা তিন দিন প্রসাদভোজন 'শাপে বর' হইল ; দুই দিন সাধারণ প্রসাদ, একদিন 'কণিকা-ভোগ'-নামক উপাদেয় খিচুড়ি (বলরামের ভোগ)। পুণ্যের পরা কাষ্ঠা বটে। পুণ্যবলেই হউক আর ৺জগবন্ধুর অপার করুণায়ই হউক, পেটের অসুখ হয় নাই। বাজারের দধি আম ও খাবার অবশ্য প্রসাদের সঙ্গে গোঁজা দেওয়া হইত। শ্রীমন্দিরের নিকটেই একটি দোকানে উৎকৃষ্ট খাবার ও একটি বাঙ্গালীর দোকানে উৎকৃষ্ট দধি-সন্দেশ পাওয়া যায়। যাহা হউক, প্রভুর কৃপায় 'ভোজনং যত্র তত্র' হইতে পারিল না। কিন্তু 'শয়নং হট্ট-মন্দিরে'ই হইল। সারাদিন সারারাত্রি ধরিয়া বাহিরের লোক আসার আটক ছিল না, ইহা ছাড়া কুকুরের অবাধ গতিবিধি। এ অবস্থায় জিনিশ-পত্রের হেফাজতের জন্য দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন ভিন্ন উপায় ছিল না, অথচ দ্বার বন্ধ করিলেও মশার উৎপাত। নূতন স্থানে আসিয়াই মশারী খাটানর ব্যবস্থা করাও সময়-সাপেক্ষ। যাহা হউক, এই ভাবেই ত্রিরাত্রি তীর্থবাস করা গেল। সমুদ্র-তীরে বাসার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

এই তিন দিন শ্রীমন্দিরের সান্নিধ্যবশতঃ আশ মিটাইয়া দেবদর্শনের সুযোগ হইয়াছিল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গেই শ্রীমন্দির চোখে পড়িত, রাত্রে শয়নের প্রাক্‌কালেও সেই দৃশ্য, দিবাভাগেও যখন তখন মঠের প্রশস্ত বারাণ্ডায় বাহির হইলেই চক্ষুঃ সার্থক হইত। মন্দিরাভ্যন্তরেও ধীরে-সুস্থে বহু দেবদেবী-দর্শন এবং শ্রীমন্দিরের ভিতর-বাহিরের কারুকার্য্য-নিরীক্ষণ (অবশ্য উপর উপর, বিশেষজ্ঞের চক্ষে নহে) করিবার অখণ্ড অবকাশ পাইয়াছিলাম। সমুদ্রকূলে ভ্রমণ ও সমুদ্রতীরে বাসের পূর্ব্বেই লক্ষ্মীমন্দিরের অঙ্গনে সমুদ্র-বায়ু উপভোগ করার সৌভাগ্যও হইয়াছিল। সকল দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। তবে দুইটি মূর্ত্তি বড়ই ভাল লাগিয়াছিল—বটপত্রশায়ী বটকৃষ্ণ শিশু-মূর্ত্তি এবং ষড়্‌ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি। (শ্রীগৌরাঙ্গের চরণচিহ্নাঙ্কিত শিলাখণ্ডও একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে।) নাটমন্দিরের ভিতর-গাত্রে চিত্রিত মূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর—যদিও নিতান্ত হালের। রত্নবেদী প্রদক্ষিণ ইহার মধ্যে একদিন হইয়াছিল, তবে অন্ধকারে, পিছলে, উচ্চনীচ সিঁড়ি ভাঙ্গিতে, পদস্খলনের এবং ভিড়ের জন্য শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছিল। এমন প্রশস্ত চত্বর, এত উচ্চ চূড়া, এত অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির, এমন বিশালতা ও বৈচিত্র্য কাশীর কুত্রাপি দেখি নাই (অসিঘাটের জগন্নাথ-নৃসিংহের প্রশস্ত চত্বরেও নহে)। কাশীধামের সমস্ত মন্দির একত্র করিলেও এমনটি হয় না। (শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে কোনও কোনও স্থানে এরূপ বিশালতা আছে।) শ্রীমন্দিরের বহির্গাত্রে নির্ম্মিত কতকগুলি অশ্লীল মূর্ত্তি ইহার একমাত্র কলঙ্ক। এগুলি আদিরসের উদ্দীপক নহে, বীভৎসরসের সঞ্চারক। দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধুতে (দুই ইয়ারে বলিতেছি না) বা পতি ও ধর্ম্মপত্নীতে একত্র দেখিতেও লজ্জাবোধ করে। দেবতত্ত্বের বা দেহতত্ত্বের কি গূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য এগুলির অন্তর্নিহিত, মূঢ় আমরা তাহা জানি না, বুঝি না।

বড় বড় মনীষীরা এ সম্বন্ধে বিস্তর গভীর গবেষণা করিয়া পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। * আমার সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, এই বিংশ শতাব্দীতে যদি কোনও কালাপাহাড় এগুলি ধ্বংস করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পৌরাণিক দেবদেবী-মূর্ত্তি ক্ষোদিত করেন, তাহা হইলে (জন কতক স্থিতিশীল ধর্ম্মধ্বজী ভিন্ন) বোধ হয় সমগ্র হিন্দুজাতি তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

বারান্তরে অন্যান্য কথা বলিব।

অসমাপ্ত

(*) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ' পুস্তক ও শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্নতত্ত্ব' প্রবন্ধ (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০) দ্রষ্টব্য।

'পুরীপ্রবাস'-প্রবন্ধের শেষে বলিয়াছি, 'বারান্তরে অন্যান্য কথা বলিব।' এই 'বারান্তর' আর আসিল না। জন্মান্তরেও শেষ হইবে কি না জানি না। বড় উৎসাহে ৺জগবন্ধুর পুরীর বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু খসড়ায় এই অংশটুকু প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছে। রথযাত্রার ২।৪ দিন পরে দুইটি পুত্রকে টাইফয়েডে আক্রান্ত অবস্থায় কোনও রকমে ট্রেনে তুলিয়াছিলাম। কলিকাতায় এক মাস যন্ত্রণাভোগের পর কনিষ্ঠ পুত্রটী গৃহ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছে, অপরটি ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাইয়াছে। নিজেও বর্ষাধিক কাল নানা রোগে ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। প্রবন্ধে বড় মুখ করিয়া করুণাসিন্ধু ৺জগবন্ধুর কৃপালাভের কথা (১৪১ পৃঃ) বলিয়াছি। সেই কৃপার যে ইহাই শেষ ফল হইবে তখন তাহা জানিতাম না। জানি না তাঁহার কাছে কি 'সেবাপরাধ' করিয়াছি যাহার জন্য এই শাস্তি পাইলাম। যদি আর কখনও তাঁহার দর্শন-সৌভাগ্যলাভ হয়, তাহা হইলে প্রাণের এই বেদনা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব। আপাততঃ পুরীদর্শনের ও তদ্ বিবরণ-প্রদানের সখ খুব মিটিয়াছে।

[পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।]
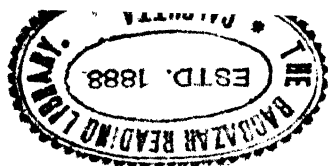
শেষ কথা

প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে নিজের রোগভোগের কথা, শোকতাপের কথা, ব্যারাম-বিপত্তির কথা বর্ণনা করিয়া সহৃদয় পাঠকের মন বেদনা-ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছি, হয় তো কোনও কোনও স্থলে পাক দিয়া সূতা লম্বা করিয়া বিরক্তির উদ্রেকও করিয়াছি। কিন্তু বৎসরাধিক কাল নানা রোগভোগের পর গত ২।৩ বৎসর হইতে ক্রমেই সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম হইয়াছি ; তাহার ফলে, রোগশোকের দাপটে অধ্যয়ন-অধ্যাপনে যে বিতৃষ্ণা হইয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে, এমন কি, গত বৎসর কলেজের কার্য্য ষোল আনার উপর আঠারো আনা নিষ্পাদন করিতে পারগ হইয়াছি এবং এবারকার দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে পাটনা, গয়া, কাশী, বিন্ধ্যাচল, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, লছ্‌মণঝোলা, এই সকল দূরদেশ-ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, নিদারুণ গ্রীষ্মে এ সকল স্থানে যাতায়াতে ক্লান্তিবোধ করি নাই, বরং স্ফূর্ত্তিবোধ করিয়াছি. অতিরিক্ত শ্রমে ও পথের অনিয়মে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় নাই—এই সুসমাচার শুনাইয়া পাঠকের হৃদয়ে বেদনা-বিরক্তির স্থলে আনন্দের সঞ্চার করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। (লোককে কষ্ট দেওয়া পাপ নহে কি ? মহাজন-বাক্য আছে, 'পাপঞ্চ পরপীড়নে।')

আমাদের শাস্ত্রে, দুঃখদুর্দ্দিনের বর্ণনায় সমাপ্তি করা নিষিদ্ধ। তাই কীর্ত্তনের আসরে দেখি, বিরহ-অবস্থার বর্ণনায় কীর্ত্তন শেষ করার নিয়ম নহে, যুগলমিলন ঘটাইয়া দিয়া লীলাকীর্ত্তন শেষ করিতে হয়। লম্বা পালা এক বৈঠকে শেষ করিতে না পারিলে 'কল্য রাধাকৃষ্ণের মিলন হইবে'

শ্রোতৃবর্গকে এই আশ্বাস দিয়া পেশাদার গায়ক-সম্প্রদায় সেদিনকার মত পালা সাঙ্গ করে, এরূপও দেখিয়াছি। (Tragedy) বিয়োগান্ত নাটক লিখিতে নাই, সেইজন্য ভবভূতি বাল্মীকীয় রামায়ণের সুবিদিত বৃত্তান্ত ওলট-পালট করিয়া রামসীতার 'সম্মেলন'-সাধন করিয়া 'উত্তর রামচরিত'-নাটকে যবনিকাক্ষেপণ করিয়াছেন। আমার এই সামান্য কাহিনী কীর্ত্তনও নহে, নাটকও নহে, কিন্তু তথাপি প্রাচীন বিধির অনুসরণে আরোগ্যের দশার উল্লেখে রোগের দশার বর্ণনার দোষ কাটাইয়া দেওয়াই উচিত। আহারের কথা যখন পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি (এ বিষয়ে লেখকের চিরদিনই পক্ষপাত), তখন আহারের বিষয় হইতেই একটি উপমা আহরণ করিয়া বলিতে পারি, ইহাতে পাঠকের মুখের—শ্রীবিষ্ণুঃ, মনের তিক্তস্বাদটা কাটাইয়া দিবে ('Take the bitter taste from the mouth') এবং 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বহুকালব্যাপী (chronic) কঠিন রোগের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নীরোগ হইবার পাট্টা পাই নাই। 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্', সুতরাং ছোটখাট রোগ-বালাই তো জীবনের চিরসাথী; যতক্ষণ দেহধারণ করিতে হইবে, ততক্ষণ ব্যাধিবীজ হইতে শরীর-ক্ষেত্র একেবারে মুক্ত থাকিতে পারে না—বিশেষতঃ শেষ বয়সে। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দিকাসি-জ্বরে শীত-বর্ষায় দু'চার দিন ভোগায়; হয় তো ঠাণ্ডা লাগায় গলায় বেদনা হয়, গাল-গলা ফোলে, এ সব উপসর্গ তো উহার আনুষঙ্গিক। কখনও কখনও আহারে মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারিলে বদহজম ও পেটের অসুখ হয়, ইহা তো অনিবার্য্য, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে। যেমন স্বামি-স্ত্রী

একত্র ঘরকন্না করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু খিটিমিটি লাগেই (গ্রাম্য কবি বলেন, 'এক ঘরে ঘর করতে গে'লে ঝগড়া কি তা' হয় না ?'), তেমনি উদর ও রসনা এক ঘরে যখন বাসা বাঁধিয়াছে, তখন রসনা ঝোঁক সামলাইতে পারিল না ও উদর কুপিত হইল, এরূপ ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটিবে বৈ কি ? তাই বলিয়া নিক্তির তোলে পান ভোজন, রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া, কি কেহ করিতে পারে ? প্রতীকার তো নিজের হাতেই আছে—এক আধ দিন উপবাস ('হরিবাসর') করিলেই লেঠা চুকিয়া যায়, রোগের জড় মরে।

তাহার পর, বুড়া বয়সের ব্যাধি—দন্তশূল মাঝে মাঝে মাথা খাড়া দেয়, তাহাকে রোখে কে ? যখন পাতিয়া বসে তখন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়াইয়া ছাড়ে, আহারনিদ্রা বন্ধ হয়, বাড়াবাড়ি হইলে শয্যা-শায়ী করে। ভুক্তভোগী জানেন, ইহার কি যন্ত্রণা। অনেক দুঃখে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্‌পীয়ার বলিয়াছেন, "There was never yet philosopher That could endure the tooth-ache patiently." [১] অর্থাৎ যিনি যত বড় দার্শনিকই হউন, দন্তব্যাধি সহিষ্ণু-ভাবে বরদাস্ত করিতে কেহই পারেন নাই। (কবিবরের নিশ্চিত সাক্ষাৎ জ্ঞান ছিল।) ইহা বুড়া বয়সের সঙ্গের সাথী, শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। তবে এইটুকু বাঁচোয়া, এ তীব্র যন্ত্রণা এক এক ক্ষেপে ২।৩ দিনের অধিক স্থায়ী হয় না, নতুবা তো অতিষ্ঠ হইতে হইত। দন্ত দেহমধ্যস্থ থাকিয়া যে কত বড় 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' তাহার প্রণিধান বুড়া বয়সে প্রত্যক্ষভাবে হয়। এ শত্রু সংহার করিয়াও এড়ান নাই। ভূয়োদর্শী প্রিন্সিপ্যাল্‌ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, দাঁতটি সমূলে উৎপাটিত

---

(১) Much Ado About Nothing," Act V, Scene1.

করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি সেই শূন্য স্থানে এক এক সময় বিষম শূলুনি উপস্থিত হয়। তাহা হইলে 'মাথা নাই তা'র মাথাব্যথা' কথাটা নিতান্ত আজগবী নহে। দন্তের এই ব্যবহারে বেশ বুঝা যায় যে ক্রমেই দেহ-ঘরের মিস্ত্রীরা কাযে জবাব দিতেছে, ('notice to quit') ঘর ছাড়িতে নুটিস্ দিতেছে। চক্ষুঃকর্ণও ক্রমে ক্ষীণশক্তি হইতেছে, বহির্জগতের সহিত বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতেছে, ফলে পাক ধরিয়াছে, বোঁটা শুকাইতেছে, তথাপি আঠা মরে না, ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি হয় না, আমাদের চৈতন্য হয় না।

যাক্, এ সব অধ্যাত্মতত্ত্ব। বুড়াবয়সের আর একটি আশঙ্কার জিনিশ, বাতব্যাধি। বোধ হয় ৩০ বৎসর আগে একবার দর্শন দিয়াছিলেন, এবং এক পক্ষ কাল ভোগাইয়াছিলেন। সে তো অতীত যৌবনের কথা। সম্প্রতি মাস কয়েক পূর্ব্বে আবার দেখা দিয়াছিলেন; দুইদিনের বেশী স্থিতি হয় নাই, কিন্তু সেই দুই দিনেই বিলক্ষণ বেগ দিয়াছিলেন। বোধ হয় 'জানান্' দিয়া গেলেন যে, 'আবার আসিব'! দুই বারই ঔষধ-প্রলেপ-মালিশে সারিয়াছে। পিতৃদেব একবার দুই তিন বৎসর ধরিয়া ভুগিয়াছিলেন, যদিও পরে বেশ সারিয়া অনেক দিন জীবিত ছিলেন (জানি না অহিফেন-প্রসাদাৎ কি না)। বড় আশঙ্কা হয়, পাছে আমার অদৃষ্টে শেষদশায় এই ভোগ থাকে। অহিফেনটাও অভ্যাস করি নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, পিতাপুত্র উভয়েরই দক্ষিণ হস্তে এই ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছিল। নিজের বেলায়, ইহাতে তত বিস্ময়ের কারণ নাই, কেন না আযৌবন দক্ষিণ-হস্ত-চালনা সর্ব্বপ্রকারে বেশী বেশীই করিয়াছি।

আরোগ্যের কথা বলিতে গিয়া আবার রোগের কথাই বলিতে বসিলাম। আর না। এখন অন্য কথা বলি। রোগ-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি

পাইয়াছি বটে, কিন্তু শোকতাপ হইতে নিস্তার পাই নাই। এ বিষয়ে ভগবান্ অভাগা লেখকের প্রতি মুক্তহস্ত। বাল্যে (৮।৯ মাস বয়সে) মাতৃ-বিয়োগের কথা ধর্ত্তব্য নহে, কেন না তখন অজ্ঞান শিশুর শোক অনুভব করিবার শক্তি ছিল না; জ্ঞান হইলে অবশ্য বুঝিয়াছি মাতৃহারার কি দুর্ভাগ্য। যৌবনে একাধিক শিশু পুত্র-কন্যা হারাইয়াছি, একটি বালক পুত্রকেও চির-বিদায় দিয়াছি; তখন অবশ্য সেই সব শোক খুবই প্রাণে লাগিয়াছিল; কিন্তু কালের শীতল হস্ত-প্রলেপে সে সব ক্ষত (মাতৃহৃদয়ে না হইলেও) পিতৃহৃদয়ে এক প্রকার নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাহার পর, প্রৌঢ় বয়সে, ৬।৭ বৎসরের ব্যবধানে, একবার নহে, দুই দুই বার নিদারুণ পুত্রশোকে হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, সে অনির্ব্বাণ বহ্নির আর উপশম নাই, রাবণের চিতার মত অবিরত ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। 'শ্মশান করেছি হৃদি'; 'আর কিছু নাই মা চিতে, চিতার আগুন জ্বলছে চিতে, চিতাভস্ম চারিভিতে।' রোগ-শোকের সম্মিলিত আঘাতে দেহ-মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কার্য্যে নিরুৎসাহ, জীবনে বিতৃষ্ণা আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু সংসার-বিধানের এমন অমোঘ প্রভাব যে এই নিদারুণ শোকও ক্রমে সহিয়া আসিতেছিল, আবার অল্পে অল্পে কার্য্যে প্রবৃত্তি, সংসারে আসক্তি জন্মিতেছিল; কিন্তু এমনি লীলাময়ের লীলা-রহস্য যে আবার গতবর্ষে নূতন করিয়া শোক পাইতে হইয়াছে, আবার একটি বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের মায়া কাটাইতে হইয়াছে। ভগবান্ যেন শোকে বৈচিত্র্য-সাধনের জন্য পুনঃ পুনঃ পুত্রশোক দিয়া এবার কন্যার জন্য শোক-তাপের বিধান করিলেন। যে কন্যা নিজে রোগগ্রস্তা হইয়াও, চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি ৺কাশীধামে মাসের পর মাস শয্যাগত অবস্থায় দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তখন সর্ব্বদা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমার

শুশ্রূষা করিয়াছে, যাহার অক্লান্ত সেবা দেখিয়া আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন, সেই স্নেহের কনিষ্ঠা কন্যা ৩।৪ বৎসর ধরিয়া কালরোগে ভুগিয়া, রোগজীর্ণ জীবনের শেষ কয়েক মাস অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, মাতৃজাতির পরমকাম্য সন্তান-লালন-পালনের সুখ লাভ করার সুযোগ পাইয়াও তাহাতে বিড়ম্বিত হইয়া, বিংশতি বর্ষ বয়সে জীবনের সকল সাধ অপূর্ণ রাখিয়া কি জানি কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে।

আবার তিন মাস যাইতে না যাইতে ১০।১১ বৎসরের দৌহিত্রী সেই পথেই প্রয়াণ করিয়াছে। 'একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে।' বাস্তবিক, মানুষের প্রাণ কাঠ পাথরের চেয়েও কঠিন, তাই এত শোকতাপ সহ্য করিয়াও অটুট থাকে। কথায় বলে, 'অল্প শোকে কাতর, আর অধিক শোকে পাথর।' আর বিধাতার প্রাণ ততোধিক কঠোর, নিজের সৃষ্ট জীব-সম্বন্ধে তিনি এই সকল নিষ্ঠুর বিধান সংঘটন করিয়াও নির্ব্বিকার। করুণাময় পরমেশ্বরের একি নিষ্করুণ ব্যবস্থা! 'Great are thy tender mercies.' থাক্, এই অবোধ্য রহস্য (The inscrutable ways of Providence) সম্বন্ধে অন্ধ অজ্ঞ আমরা বৃথা জল্পনা করিব না। আর এ বিয়োগ-দুঃখের আলোচনা করিয়া পাঠকের মনে বিষাদ-অবসাদের সঞ্চার করিব না। পাঠককে আনন্দ-দানের সঙ্কল্প করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়া তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করিলাম, এমনি আমার দুরদৃষ্ট। যাক্, এ প্রসঙ্গ বর্জ্জন করি। বরং এই কয় বৎসর রোগভোগের, এমন কি শোক-তাপের ফলে কি লাভ-লোকসান হইয়াছে তাহারই একটা খতিয়ান পাঠক-সমীপে নিকাশ-আখেরীর মত পেশ করিলে মন্দ হয় না।

যদিও দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়াছি, এবং দারুণ যন্ত্রণাও দীর্ঘকাল ধরিয়া সহ্য করিয়াছি, তথাপি এখনকার সুস্থ অবস্থায় দেখিতেছি, মোটের

উপর ক্ষতি অল্পই হইয়াছে, লাভই বেশী হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভগবানের কঠোর বিধানের গূঢ় মঙ্গল-অভিসন্ধি না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিন্দা করি, তাঁহার উপর রাগ-অভিমান করি, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধার, বিরাগের ভাব পোষণ করি। যাক্, এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ছাড়িয়া, এক্ষণে সূচিকটাহ-ন্যায়ে অল্প ক্ষতির কথা আগে সারিয়া লইয়া অধিক লাভের কথা পরে আলোচনা করিব।

প্রথম ক্ষতি, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে পারি না। একটু বেশী ক্ষণ লেখাপড়ার কায করিলে মস্তিষ্কের কেমন যেন অবসাদ আসিয়া পড়ে, আর অধিক ক্ষণ মস্তিষ্ক-চালনার শক্তি থাকে না। আবার খানিক ক্ষণ বেড়াইলে ক্লান্তিবোধ হয়, চরণ আর চলিতে চাহে না। অথচ সমগ্র কর্ম্মজীবনে ইহাই আমার একমাত্র ব্যায়াম (physical exercise) ছিল। অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার পর ৩।৪ ঘণ্টা একটানে পথে পথে টো টো করিয়া ঘোরার বরাবর অভ্যাস ছিল; এখন এক ঘণ্টা চলিলেই অবসন্ন হইয়া পড়ি। ইহা অবশ্য জরার লক্ষণ। ক্রমে এ পরিবর্ত্তন ঘটিতই। তবে রোগ-শোকে শরীর-মন জীর্ণ হওয়ায় একটু যেন শীঘ্র শীঘ্র ঘটিয়াছে, অকাল-বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, ষষ্টি বর্ষ বয়স না হইতেই স্থবির হইয়া পড়িয়াছি। সমবয়স্ক, এমন কি আমা অপেক্ষা ৫।৭ বৎসরের বড়, পুরাতন সহপাঠীদিগের অনেককে যেমন সবল, সুস্থ ও কর্ম্মঠ দেখি, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারি কত সত্বর এবং কত দ্রুত আমার শক্তিহ্রাস হইয়াছে। সত্য বটে, কখনই খুব বলবান্ ও শ্রমসহিষ্ণু ছিলাম না, তথাপি এতটা অবনতি এত শীঘ্র হইবার কথা নহে। যাহা হউক, ইহাতে নিজের ব্যবসায়ের নিয়মিত কার্য্যের কোনও ত্রুটি হইতেছে না, কোনও রূপ অপকর্ষও লক্ষিত হয় না, একথা বুকে হাত দিয়া (with a clear conscience) বলিতে পারি।

দ্বিতীয় ক্ষতি, প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া যে একটা রচনার ঝোঁক, প্রবন্ধ লেখার বাতিক ছিল, সেটা একেবারে লোপ পাইয়াছে। তবে এটাকে ক্ষতি বলিব কি লাভ বলিব, ঠিক বুঝি না। এক হিসাবে দেখিলে ইহা লাভ ; কেন না নিজের অবলম্বিত ব্যবসায়ে যথেষ্ট পড়াশুনা করিতে হয়, যথেষ্ট মাথা খাটাইতে হয় (যদিও মৌলিক গবেষণা—Original research করিতে হয় না)। তাহার উপর এই দুর্ব্বল দেহ ও মস্তিষ্ককে অন্য ভাবে খাটাইয়া আর বৃথা জীবনী শক্তির অপচয় করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। এরূপ 'burning the candle at both ends' (বাতীর দুই মুড়া পোড়ান) এ বয়সে সমীচীন নহে। অনেকের অবশ্য বার্দ্ধক্যেও সজীবতা থাকে ('green old age'), তাঁহাদের দেহমনে চিরবসন্ত, চিরযৌবন বিরাজিত। সে সকল অনন্য-সাধারণ প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের মত সাধারণ মানবের সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। অন্য দশ জনের মত আমারও কোন যোগ্যতা নাই, এই বিশ্বাস জন্মিলে মনে বেশ একটা শান্তির ভাব আসে, আর কোন হাঙ্গামা থাকে না। খ্যাতনামা মার্কিন্ লেখক হোম্স্ [২] বেশ কথাটা বলিয়াছেন—"When one of us who has been led by native vanity or senseless flattery to think himself or herself possessed of talent arrives at the full and final conclusion that he or she is really dull it is one of the most tranquillising and blessed convictions that can enter a mortal's mind."—বিশেষতঃ যখন স্পষ্ট বুঝা যায়, চেষ্টা করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় সেই সরসতা সঞ্চার

(২) The Autocrat of the Breakfast-table, III.
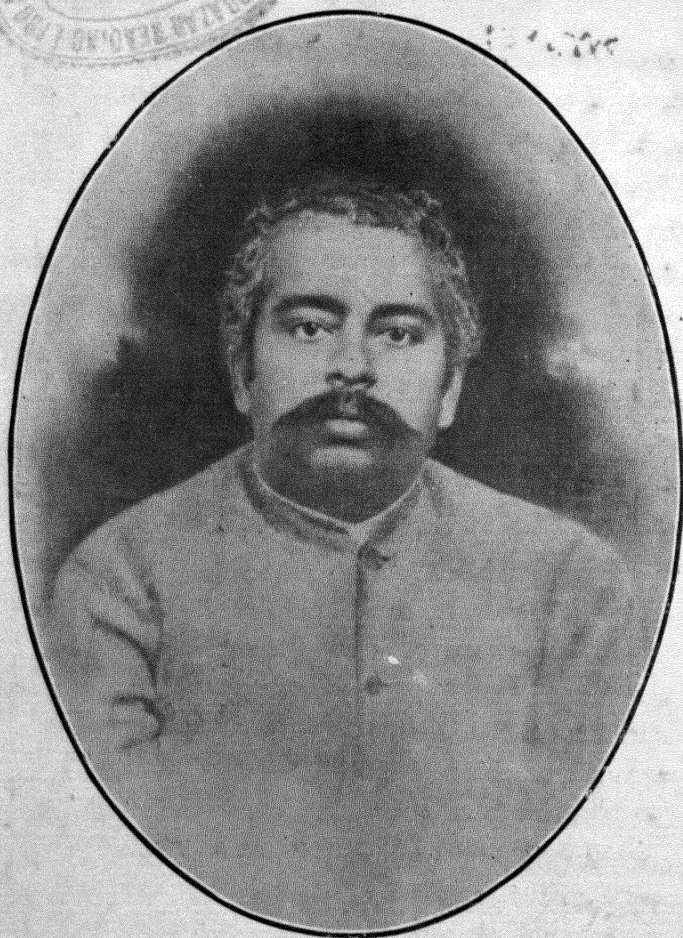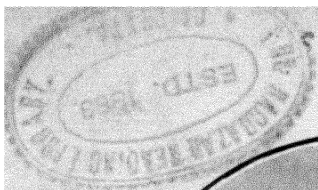
৺রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়

(৯৪ পৃঃ)

করার ক্ষমতা আর নাই। স্বীকার করি, শেষ কথাটায় তলায় তলায় বেশ একটু আত্মপ্রশংসার রেষ আছে, কিন্তু ইহা আমার (dead selfএর) মৃত 'আমি'র প্রশংসা এই মনে করিয়া পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন না কি? চারি বৎসর পরে আবার লেখনী ধারণ করিয়াছি, কিন্তু কলমের প্রত্যেক টানেই বুঝিতেছি, পূর্ব্বের সে শক্তি আর নাই। যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি দেবী কাণে কাণে বলিতেছেন, 'বৃথা এ সাধনা'। দেবীর অকালবোধনে শ্রীরামচন্দ্র সুফল পাইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের মত জীবের সে আশা দুরাশা। এ অকালবোধন নহে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ। ইহার ফল ভাল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? পাঠকের মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে বিরক্তির সঞ্চার হওয়ারই ষোল আনা সম্ভাবনা। একজন বিলাতী লেখক রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, 'I no longer delight my readers, I punish them,' আমি আর পাঠকগণকে আনন্দদান করি না, শাস্তিবিধান করি। এ অক্ষম লেখকের পক্ষে কথাটা রঙ্গতামাসা নহে, প্রকৃত।

একথা প্রকৃত হইলেও, আর এক হিসাবে দেখিলে রচনাশক্তির লোপ যে (regrettable) ক্ষোভের বিষয় সুতরাং ক্ষতির খতিয়ানে ধর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের রচনা পাঠ করিয়া, মনীষিগণের উচ্চ-ভাবুকতাময় চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়া, এক সঙ্গে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করেন বটে; সে আনন্দ বিমল, সে জ্ঞান মহৎ, তাহাও ঠিক। কিন্তু তথাপি শুধু পরের চিন্তা আত্মসাৎ করিয়া মানব পূর্ণতা লাভ করে না; নিজের চিন্তার স্ফূর্ত্তিতেই, সাহিত্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশেই, প্রকৃত আনন্দ। উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও সে রচনায়, সে আত্মপ্রকাশে একটা সার্থকতা আছে, কেন না সে রচনায় ইহাই সপ্রমাণ করে যে লেখক বাহির হইতে

সংগৃহীত জ্ঞানের জড় মৃদ্‌ভাণ্ড বা প্রগাঢ় অধ্যয়নের অচেতন যন্ত্র নহেন ; তাঁহার নিজে চিন্তা করিবার শক্তি আছে এবং সে চিন্তা নিপুণভাবে প্রকাশেরও শক্তি আছে। এ হিসাবে দেখিলে রচনাশক্তির লোপ একটা ক্ষতি বলিয়া মানিতেই হইবে।

তৃতীয় ক্ষতি, দীর্ঘকাল রোগভোগের ফলে এবং বার্দ্ধক্যের জন্য পরিপাক-শক্তি কমিয়াছে ; সুতরাং তদনুযায়ী আহারের বহর কমাইতে হইয়াছে, দায়ে পড়িয়া সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ রাত্রের আহার যথাসম্ভব লঘু করিতে হইয়াছে, (চারিটি ভাত, একটু ঝোল ও একটু দুধ), কেন না নিদ্রাবস্থায় হজমের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, রাত্রে আহারের মাত্রা একটুমাত্রও অতিক্রম করিলেই পেটে বায়ু জন্মে, বদহজম হয়, চোঁয়া ঢেকুর উঠে, ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত দেখিতেছি একাহারীই হইতে হইবে। পরমহংস-দেবের সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি আর না পারি, তাঁহার স্থূল বিষয়ে উপদেশ—দিনে বন্দুকগাদা করিয়া খাওয়া ও রাত্রে পেটের এক কোণ খালি রাখিয়া খাওয়া—বেশ মনে ধরিয়াছে এবং ইষ্টমন্ত্রের মত এই উপদেশ হৃদ্‌গত করিয়াছি।

ইহাতে কিন্তু একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। কলিকাতার সমাজে নিমন্ত্রণটা পনর আনা জায়গায় রাত্রিভোজনেরই হয় ; সুতরাং নিমন্ত্রণ পাইলে সমস্যায় পড়িতে হয়। ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া নিমন্ত্রণের আকর্ষণ একেবারে ত্যাগ করা কঠিন। অথচ নিমন্ত্রণ স্বীকার করায়ও আত্মনিগ্রহের আশঙ্কা আছে। আমাদের প্রাচীন 'মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণে'র প্রথা যে কতদূর সমীচীন ছিল, তাহা এক্ষণে বেশ প্রণিধান করিতেছি। কেন না দিনের বেলায় গুরুভোজন করিলে রাত্রে 'লঙ্ঘন' দিলেই সকল গ্লানি কাটিয়া যায়। পক্ষান্তরে রাত্রে গুরুভোজন করিয়া পরদিন খাড়া উপবাস করিলেও

জড় মরে না, balance ঠিক রাখা যায় না। জানিয়া শুনিয়াও কিন্তু সকল সময়ে সম্পূর্ণ লোভজয়ী হইতে পারি না। আমাদের বয়োবৃদ্ধ প্রিন্সিপ্যাল্ মহাশয় এ বিষয়ে আদর্শ হইবার যোগ্য। তিনি আহারের মাত্রা যথাসম্ভব কমাইয়াছেন, অনশন বা অর্দ্ধাশনের ঘোর পক্ষপাতী হইয়াছেন এবং ইহাতে যে নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ হওয়া যায়, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা নিয়ত এই সত্য প্রচার করেন। তাঁহার একটি কথা বড় খাঁটি। তিনি বলেন, সকলেরই জন্মকালে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যপেয়ের বরাদ্দ বিধাতা পুরুষ মাপিয়া দিয়াছেন ; বরাদ্দ ফুরাইলে আয়ুঃও ফুরাইবে। নিত্য অধিক করিয়া খাইলে অল্পদিনেই পুঁজি ফুরায় সুতরাং আয়ুঃ শেষ হয় ; আর অল্প করিয়া খাইলে অধিক দিন চলে, সুতরাং আয়ুর পরিমাণও বাড়িয়া যায়! ভাব্‌বার কথা বটে।

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মাছ ও দুধ। ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া আমরা মাংস-ভোজনে খুব ঝুঁকিয়াছি। যৌবনে যাহাই হউক, এ বয়সে মাছ-মাংস ত্যাগ করাই উচিত। মাংসটা এক প্রকার ত্যাগই হইয়াছে ; (যে দিন যোটে না সে দিন খাই না, এই হিসাবে নহে!) তবে এই বৈরাগ্য মনের বলের প্রভাবে নহে, দশনের বলের অভাবে। সুযোগ উপস্থিত হইলে মাংস-চর্ব্বণের ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া ঝোলটুকু চুমুক দিয়া খাইয়া 'মহাপ্রসাদে'র সম্মান রক্ষা করি। মৎস্যটা রবিবারে ভিন্ন অন্য বারে চালাইতে হয়, তবে পরিমিত মাত্রায়। একেবারে ত্যাগ করিলে সাত্ত্বিকতা-বৃদ্ধিও হয়, মস্ত একটা খরচাও বাঁচিয়া যায় ; কিন্তু ছাড়িতে কেমন একটু মায়া করে, একটু 'ইতস্ততঃ' বোধ হয়, কেন না বাঙ্গালীর বিশেষত্বই মৎস্য-ভোজনে। ইহাতে মস্তিষ্কের পুষ্টি হয়, চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি কতকগুলি জন্মগত সংস্কার আছে, সেগুলি কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন বর্ষার ইলিশ, হেমন্তের

গল্‌দা চিংড়ি ও শীতকালের ভেট্‌কি-ভাজন পরিহার করিতে পারি এমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নহি, তখন দৈনন্দিন আহার্য্যের ফর্দ্দ হইতে চূণোপুঁটী বাদ দিয়া আর কি ফল ? কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্বিধ মুখপ্রিয় মৎস্যই বা পরিহার করা যাইবে না কেন ? তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করিয়া ফল নাই ; বাঁচিয়া থাকিয়াও খাদ্য-জগতের ওরূপ উপাদেয় পদার্থ হইতে জোর করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করাই যে পরম-পুরুষার্থ, তাহা আমি মনে করি না। 'ভিন্নরুচিহি লোকঃ।'

দুধটা বাল্যের তথা বার্দ্ধক্যের প্রধান আহার ; বিশেষজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি, ইহার মত নির্দ্দোষ পুষ্টিকর ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ (perfect) খাদ্য আর কিছুই নাই। কিন্তু রোগের অবস্থায় এবং রোগমুক্তির প্রথম অবস্থায় অনেকদিন দুধ একেবারে বন্ধ করিতে হইয়াছিল ; শুধু, এমন কি, সাগু বা সোডাপানির সহিত খাইলেও পেটে বায়ু জমিত, বিষম অস্বস্তি হইত, সারারাত্রি হাঁসফাঁস করিতে হইত এবং নিদ্রা হইত না। যাহা হউক, ক্রমে অল্প মাত্রায় অভ্যাস করিয়া এক্ষণে দুইবেলায়ই চলে, তবে পূর্ব্বের অভ্যাসের তুলনায় অল্প পরিমাণে। রাত্রে না খাইলেই যেন ভাল হয়—বিশেষতঃ দারুণ গ্রীষ্মে। কিন্তু অভ্যাসটা ছাড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। 'পশ্চিমে' দেখিলাম দারুণ গ্রীষ্মে অনেকে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দুই বেলায়ই দধিভোজন করেন ; কিন্তু দিনের বেলায় শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে দধিভোজন করি বটে, 'ন রাত্রৌ দধিভোজনম্' নিষেধটা না মানিতে সাহস হয় না। ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, নালী ক্ষীর, এককালে খুবই প্রিয় ছিল ; কিন্তু সে পথে চলা এখন দুঃসাহসের কার্য্য। তবে কখনও ন'মাসে ছ'মাসে এক আধ দিন চলে—তাহাও মধ্যাহ্নে। অতিপ্রিয় পরমান্ন-ভোজন একেবারে আর সহে না। বাস্তবিকই জীবন একটা বিড়ম্বনা হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, কতদিন এরূপ আত্মবঞ্চিত হইয়া ধরাধামে থাকিতে হইবে ?

দুধ খাইলে পেটে বায়ু হওয়ার কথা বলিয়াছি। এই উপসর্গ-উপশমের উপায়টি তারিফ করিবার জিনিশ। দুই জন বন্ধু দুই রূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তবে দুইটিই 'সঘৃত সোপকরণ' ও আমার মনের মত! প্রথম ব্যবস্থা, মধ্যাহ্ণে ভাতের সহিত, যেরূপ সহে সেইরূপ, অল্প পরিমাণে সদ্যঃপ্রস্তুত গব্যঘৃত; দ্বিতীয়, উক্ত সময়ে ভাতের পাতে ২।১ খানি গব্যঘৃতপক্ক লুচি শুধু লবণ দিয়া আহার। উভয় ব্যবস্থার ফলে উপসর্গটির একদম নিবৃত্তি হইয়াছে। এবং ইহার একটি by-product হইয়াছে বড় আরামের। মধ্যাহ্ণে ভাতের পাতে কয়েকখানি লুচি সেই অবধি বাহাল রহিয়া গিয়াছে; ঔষধ এখন আহারে পরিণত হইয়াছে; অবশ্য এখন আর গব্যঘৃত ও লবণের বাঁধাবাঁধি নাই। রকমফের হইবে বলিয়া সময়ে সময়ে নিমকি কচুরি শিঙ্গারা এমন কি পাঁপর-ভাজাও চলে, বিশেষতঃ শীতকালে এবং রবিবারে নিরামিষ আহারে। তবে সবই ব্রাহ্মণের বিধবার মত দুপুরে ভাতের পাতে; বৈকালিক জলখাবারে বা রাত্রিভোজনে অচল। দধিদুগ্ধের সঙ্গে—বঙ্গ-সীমন্তিনীগণের বেশ-প্রসাধনের পর টিপ পরার মত,—Finishing-touch-হিসাবে ২।১টা সন্দেশ বা রসগোল্লা ভোগ লাগানও একটি নূতন অভ্যাস হইয়াছে। ফলতঃ আহারে প্রাচুর্য্য না থাকিলেও পারিপাট্য বাড়িয়াছে। আবার নিজের রুচির ঝোঁকে ভোজন-ব্যবস্থার আলোচনায় মত্ত হইয়াছি। স্বভাব যাইবে কোথায়? আর না। এক্ষণে ভোজনে, তথা উহার আলোচনায়, রা'শ টানার প্রয়োজন। ফল কথা, ইহাকে যদিও ক্ষতির ফর্দ্দে স্থান দিয়াছি, তথাপি একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে এটা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি নহে, লাভ। সংযমশিক্ষা এক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়—বিশেষতঃ শেষ দশায়।

ক্ষতির কথা তো বলা হইল। এইবার লাভের কথা বলি।

আমার বরাবর বাল্যকাল হইতে বেলায় উঠা অভ্যাস। পঠদ্দশায়

তথা চাকরির জীবনে ইহার জের চলিয়াছে। যাঁহারা ভিতরের কথা জানেন না, তাঁহারা মনে করেন ছাত্রজীবনে অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়ার ফলে এই অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে। এবং শিক্ষকজীবনেও সেই প্রয়োজনে অভ্যাসটি কায়েম হইয়াছে। আসল কথা কিন্তু তাহা নহে, এ অভ্যাসটি আমার মজ্জাগত। (To burn the midnight oil) রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তৈল পোড়ান অধ্যয়নশীল ব্যক্তির লক্ষণ হইলেও, অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়াশুনা করার ঝোঁক আমার কথনও ছিল না, প্রয়োজনও বোধ করি নাই। রাত্রি দশটা জোর এগারোটা পর্য্যন্ত পড়াশুনাই যথেষ্ট মনে করিতাম। অন্যের প্ররোচনায় কচিৎ কখনও ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। নতুবা জাগরণক্লেশে তবিয়ত খারাপ করা, স্বাস্থ্যভঙ্গ করার উপর আমি চিরকালই নারাজ। রাত্রে পড়াশুনা যদি বা করি, রাত্রে লেখার অভ্যাস তো কস্মিন্ কালেও নাই—এক দৈনিক হিসাব ছাড়া। প্রৌঢ় বয়সে চালশে ধরার জন্য চশমা লওয়ার পর হইতে রাত্রে পাঠের অভ্যাস একদম ছাড়িয়াছি। কেবল যেদিন সন্ধ্যাকালে রোঁদে বাহির হইয়া পুরাতন বইএর হাটে মনের মত কোনো বই সস্তার সওদা করিতে পারি, সেই দিন রাত্রে তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া ও দুই চারি পাতা পড়িয়া নিয়মভঙ্গ করি। স্বীকার করি, রাত্রে নিরিবিলিতে একাগ্র মনঃসংযোগ হয়, তাহাতে অন্য সময়ের ছয় ঘণ্টার কায দুই ঘণ্টায় হয়। কিন্তু তথাপি এতটা পড়ার আঠা এ পক্ষের কখনও নাই। আমার বিলাতী ওস্তাদ ল্যাম্বের রচনায় এক স্থানে বেলায় উঠার পক্ষে ও ভোরে উঠার বিপক্ষে খুব একটা জোরাল নজির আছে।* কিন্তু ওস্তাদজির সেই উৎকৃষ্ট রচনার সহিত পরিচয়-সৌভাগ্যলাভের অনেক পূর্ব্ব হইতেই

(*) *Essays of Elia, Second series. Popular Fallacies* : **'that we should rise with the lark.'**

আমার এই অভ্যাস ছিল। থাক্, এ সব কেতাবী বিদ্যা জাহির না করিয়া এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকার সময় রোগযন্ত্রণার জন্য সারারাত্রি নিদ্রা হইত না, হয় তো জ্বরের ঘোরে প্রথম রাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিত, কিন্তু বাকী রাতটা থাড়া (?) জাগিতে হইত। যখন কঠিন পীড়া সারিল, তখনও রাত্রে পেটে বায়ুর সঞ্চারে এমন অস্বস্তি হইত, এমন হাঁসফাঁস করিতাম, যে ঘুমায় কাহার সাধ্য? যত রাত্রি হইত, ততই অস্বস্তি বৃদ্ধি পাইত। রাত্রে পেটে কিছু না পড়িলেও এ ভাবের কোনও ব্যতিক্রম হইত না। অনেক তোয়াজে (১৬৫ পৃঃ) পেটের সে ভাবটা গিয়াছে, কিন্তু সেই অবধি রাত্রে সুনিদ্রা হয় না, ৩।৪ বার ঘুম ভাঙ্গে এবং শেষবার ভোররাত্রে ঘুম ভাঙ্গা এখন পাকা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনও কারণে কোনও দিন অধিক রাত্রিতে ঘুমাইলেও ঠিক যথাসময়ে ঘুম ভাঙ্গে। গ্রীষ্ম-কালে ৫টায় বা তাহারও পূর্ব্বে; শীতকালে ৬টার পূর্ব্বে। ইহা একটা লাভ বলিতে হইবে বৈ কি? কেন না ইহাতে প্রাতে কায করিবার অনেক সময় পাই। আর আমার রীতিমত লেখা ও পড়ার সময়ই প্রাতঃকাল, রাত্রি-কাল নহে। আপশোষের বিষয়, এই অভ্যাসটিও হইল আর প্রাতে অনেক দিনের অভ্যাস-মত যে রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম, সে রচনাপ্রবৃত্তিও গেল। হয় তো দশ বৎসর পূর্ব্বে এই অভ্যাসটি হইলে 'ফোয়ারা' ও 'পাগলা-ঝোরা'কে শতধারা বা সহস্রধারায় পরিণত করিতে পারিতাম। তবে জানি না, তাহাতে সাহিত্যক্ষেত্রের কতটা ক্ষতিবৃদ্ধি হইত। যাহা হউক, এখন সমস্ত সময়টাই কলেজের কার্য্যের উপযোগী পড়াশুনায় ব্যয় হয়, তাহাতে অধ্যাপনার কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি, ইহাও তো একটা লাভ। এবং এই লাভ ভোরে ঘুম ভাঙ্গার নবলব্ধ অভ্যাসের ফল। সুতরাং ইহাকে 'শাপে বর' বলিতে পারি।

এইবার দ্বিতীয় লাভের কথা বলি। সময় অমূল্য রত্ন; পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে প্রচুর কার্য্য-সম্পাদনের মূলধন এই অমূল্য-রত্ন-লাভের কথা বলিয়াছি। দ্বিতীয় লাভটি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য। কাশীর নিদারুণ গ্রীষ্মে দীর্ঘকাল রোগভোগের অবস্থায় স্ত্রীপুত্রকন্যার যে ঐকান্তিক সেবা-যত্নের পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি এবং মানব-মানবীর হৃদয়কে এই অগাধ ভালবাসা ও করুণার আধার-স্বরূপ সৃষ্টি করার জন্য ভগবানের প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছি। অবশ্য পূর্ব্বেও কত বার রোগে ভুগিয়াছি, সেবাও পাইয়াছি। কিন্তু আর তো কখনও এত দীর্ঘকাল এমন কঠিন পীড়ায় শয্যাগত থাকি নাই। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর এমন অক্লান্ত সেবা পাইবার অবসরও পাই নাই। পত্নীর সেবা-সম্বন্ধে স্কটের সেই সুন্দর বাক্যটি উদ্ধৃত করিলেই সকল কথা বলা হইল—

When pain and anguish wring the brow,

A ministering angel thou.'

নিজে রোগগ্রস্তা হইয়াও কনিষ্ঠা কন্যা কিরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিল সে কথা পূর্ব্বেই (১৫৭পৃঃ) বলিয়াছি। সর্ব্বোপরি পুত্রের সেবার একাগ্রতা ও (thoroughness) সম্পূর্ণতা। আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হইয়া অব্যাহত স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করুন, তাঁহাকে যেন কখনও কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে না হয়। মনে হয়, বিধাতা আর কয়েকটি পুত্রকে হরণ করিয়া এই 'শিবরাত্রির সলিতা'টি আমার মুখ চাহিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, যাহাতে শেষ বয়সে সেবা-যত্নের কোনও ত্রুটি না হয়। কথাটা স্বার্থপরের মত বলা হইল, কিন্তু সংসারী জীবের হৃদয়ে উচ্চ পবিত্র ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপর ভাবও বিরাজ করিতেছে, তাহার লোপ তো সম্ভব নহে।

ইহা ছাড়া, কে আপন কে পর তাহারও সুস্পষ্ট পরিচয় এই রোগশয্যায় পাইয়াছি। 'বিদেশ বিঁভুই'এ চারি মাস কাল রোগ-ভোগের

অবস্থায় যাহাদিগের উপর 'প্রতিবেশিত্ব' ছাড়া আর বিশেষ কোনও দাবী নাই, এমন লোকে ইজি-চেয়ার, টানাপাখা, খসখসের টাটি প্রভৃতি আরামের উপকরণ যোগাইয়াছে এবং নিত্য আসিয়া সংবাদ লইয়াছে, কেমন আছি। আর মৃত্যু হইলে দশ রাত্রি অশৌচ পালন করিতে হইবে, এমন জ্ঞাতিও ৪ মাসের মধ্যে ৪ দিন তত্ত্ব লইয়াছেন কিনা সন্দেহ—অথচ একই সহরে বাস করিয়া। সর্ব্বাপেক্ষা গভীরভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে কলিকাতা-বাসী খুড়া মহাশয়ের (পিতৃদেবের পিতৃব্যপুত্র) ৪ অকৃত্রিম স্নেহ করুণা। কলিকাতায় প্রাণে প্রাণে আমাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য তাঁহার সে কি আন্তরিক আকুলতা, কি প্রবল চেষ্টা, কি উৎকট দুর্ভাবনা! বোধ হয় পিতৃস্নেহও ইহার নিকট পরাজিত। এই সব স্নেহ-সমবেদনার, সেবাযত্নের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, মানবচরিত্রের এই মধুর দেবভাবের সাক্ষাৎ উপলব্ধি, ইহা কি একটা কম লাভ? সেদিন পিতৃব্য মহাশয়ের একটি অল্পবয়স্কা বিধবা দাসী বলিতেছিল, "ভাগ্যে বালবিধবা হইয়াছিলাম, তাই তো নিঃঝঞ্ঝাট হইয়া ধর্ম্ম-সাধনায় মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিতে পাইয়াছি।" আমারও তেমনি মনে হয়, ভাগ্যে রোগ-যন্ত্রণায় দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিয়াছি, তাই তো আত্মীয়-অনাত্মীয়ের এই পবিত্র কোমল দেবভাবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও দেখিতেছি, অশিব হইতে শিবের উৎপত্তি। তাই ভক্তের বাণীর প্রতিধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়—

'সূক্ষ্ম দৃষ্টি দাও প্রভু, হৃদয়েতে দাও বল।
অশুভ না হেরি যেন তব কার্য্যে, হে মঙ্গল ॥'

এইবার তৃতীয় লাভের কথা বলি। এইটি পরম ও চরম লাভ—

(৪) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেশান্‌স্ জজ্। একণে তিনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করিতেছেন ও অনন্তকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক উন্নতি। একটু গোড়া হইতে আরম্ভ করি, নতুবা কথাটা সুস্পষ্ট হইবে না। শৈশবে মাতৃহীন অবস্থায় নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণের বিধবা মাতৃসমা ঠাকুরমাতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইলেও এবং হিন্দুয়ানির কেল্লা পল্লীগ্রামে বাল্যজীবন যাপন করিলেও হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে, আচার-অনুষ্ঠানে একটা আস্থার ভাব জন্মে নাই। গৃহে গৃহদেবতার অভাব বোধ হয় তাহার একটা কারণ (গৃহদেবতা লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত প্রবল জ্ঞাতিদিগের গৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন)। তবে লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা প্রভৃতি যথা-নিয়মে অনুষ্ঠিত হইত। ইংরেজিনবিশ পিতার পুত্র হওয়াতেও সম্ভবতঃ আমার এইরূপ মতিগতি হইয়াছিল। তখনকার ইংরেজিনবিশদিগের আচরণের কথা বোধ হয় পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে তখনকার দিনে ইংরেজী চর্চ্চা করিলেই হিন্দুয়ানি লোপ পাইত। ঋষিকল্প ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সম্ভবতঃ এরূপ ব্যতিক্রম আরও ২।৪টি ছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কেমন যেন একটা অবিশ্বাসের আবহাওয়া বহিত।

বাল্যেই ভিন্ন গ্রামে পিতৃদেবের নিকট পাঠের সুবিধার জন্য (তিনি তথাকার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার্ ছিলেন) স্থানান্তরিত হইয়াছিলাম; সেখানে যে জমিদার-গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, সে গৃহের আবহাওয়া বিশুদ্ধ ছিল; গৃহে শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠিত, নিত্য পূজারতি ভোগরাগ হইত; ইহা ছাড়া দুর্গোৎসব প্রভৃতি 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ' ছিল। বাঙ্গালানবিশ প্রাচীন ব্রাহ্মণ জমিদার মহাশয় আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। তথাপি এই গৃহের বা গৃহপতির প্রভাব কিছুই অনুভব করি নাই। তবে উপনয়নের পর, কি জানি কেন, (মন্ত্রশক্তি?) প্রবল উৎসাহ ও পরম নিষ্ঠার সহিত এক বৎসর কাল ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং কখনও আচারহীন হইব না বলিয়া স্নেহময়ী পিতামহী দেবীকে আশ্বাস দিয়াছিলাম।

তাহার পর, কি করিয়া কি হইল জানি না, এক বৎসর পরে সব আচার-অনুষ্ঠান লোপ পাইল, প্রায় 'পৈতা পোড়াইয়া ভগবান্' হইলাম। হয় তো ভিন্ন গ্রামের এই নিষ্ঠাবান্ পরিবারে থাকিলে অভ্যাসটা যাইত না—(অন্ততঃ এত শীঘ্র); কিন্তু 'মাইনার্' পাশ্ করাতে আবার স্বগ্রামে ফিরিলাম এবং আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের (মুড়াগাছা) এন্ট্রেন্স্ স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। পরীক্ষার বৎসরে কৃষ্ণনগর সদরে পড়িতে গেলাম এবং তথা হইতে পর পর দুইটি পরীক্ষা পাশ্ করিয়া কলিকাতায় বি এ ও এম্ এ ক্ল্যাসে পড়িলাম। সহরের বাতাসে এই অবহেলার ভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। কৃষ্ণনগরে পঠদ্দশায় শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মোপদেশ স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই, উহা উষরক্ষেত্র-নিহিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছিল। কলিকাতায়ও তখন বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের, 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র 'যুগ'। কিন্তু সেই আন্দোলনও আমাকে স্পর্শ করে নাই। রঙ্গমঞ্চে তখন 'বিল্বমঙ্গল', 'চৈতন্যলীলা', 'প্রভাস-মিলন', 'নন্দ বিদায়ে'র পূর্ণ প্রভাব; যাত্রার আসরেও তখন নীলকণ্ঠ ও মতিরায়ের ভক্তিরসের বান ডাকিয়াছে। কিন্তু সেই সকলের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য উপভোগ করিলেও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণনগরে পঠদ্দশায় পর পর দুইজন ব্রাহ্ম হেড্ মাষ্টারের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম এবং দুইজন ব্রাহ্ম ছাত্রের সহিতও মিশিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের প্রভাবও কোন আধ্যাত্মিক বৈলক্ষণ্য সংসাধন করিতে পারে নাই। বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে কখনও পোক্ত নহি, জানি না, বিজ্ঞানশাস্ত্রের জটিল নিয়মে হিন্দু ও ব্রাহ্ম প্রভাব পরস্পরকে নষ্ট (neutralise) করিয়া আমার চিত্তক্ষেত্র 'শূন্য' দিয়া পূর্ণ করিয়াছিল কি না। [৫]

---

(৫) একটা কথা যথাস্থানে বলিতে ভুলিয়াছি। ইহার মধ্যে একদিন তান্ত্রিক

এই ভাবে কলেজে অধ্যয়নের অবস্থা তো কাটিলই, অধ্যাপনার অবস্থায়ও কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। ভাগলপুরে অল্প কয়েক মাসের জন্য আদর্শ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মাতুল মহাশয়ের ৬ সংসর্গে ও সদ্‌দৃষ্টান্তেও কোন ফল হইল না। দুর্ভাগ্যক্রমে তথা হইতে বহরমপুরে চাকরি লইলাম ও সেখানে দীর্ঘ তিন বৎসর কাল অবস্থান করিলাম (১০০ পৃঃ)। বহরমপুরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ৺মোহিতচন্দ্র সেন, ৺বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও ৺সীতানাথ নন্দী—এই চারিজন আদর্শ ব্রাহ্মের সংস্পর্শে আসিলাম। কিন্তু এবারেও মাতুল মহাশয়ের হিন্দু আদর্শ ও এই ব্রাহ্ম আদর্শ—উভয়ের সঙ্ঘাতে আমার ভাগ্যে সেই 'শূন্য'ই থাকিয়া গেল। হাঁসের পালক যেমন জলে ডুবিয়া থাকিয়াও ভেজে না, আমিও তেমনি হিন্দু বা ব্রাহ্ম আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত থাকিয়া গেলাম। কুচবিহারে বাসকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম (militant) প্রবল রাষ্ট্রধর্ম্ম (State religion) দেখিয়া মজ্জাগত হিন্দুভাবটা (এতদিন চাপা থাকিয়া ?) একবার মাথা খাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, ব্যাপারটা তাহার দরুণ বেশ অপ্রীতিকর হইয়াও ছিল ; কিন্তু জানি না উদ্ধত যৌবনের সেই বিদ্রোহিভাব কতটা মৌখিক, এবং কতটা আন্তরিক।

এই তো গেল আমার দীর্ঘকালের অবিশ্বাস ও ক্রিয়াহীনতার ইতিহাস।

দীক্ষাও হইয়া গেল। কিন্তু সেটা পূজনীয়া পিতামহী দেবীর আগ্রহে ও সহধর্ম্মিণীর উপরোধে। ব্যাপারটা নিতান্তই উপরোধে ঢেঁকি গেলা হইল। আচার-অনুষ্ঠানের বেলায় যথাপূর্ব্বং থাকিয়া গেল।

(৬) টি. এন্ জুবিলি কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল্ ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং কালপূর্ণ হইলে তাঁহার কাশীলাভ ও তাহার ফলে শিবলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে।

তাহার পর, যখন বয়ঃপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য উপার্জ্জনশীল সদ্যোবিবাহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুতে মহাশোকে নিমগ্ন হইলাম, তখন কার্য্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, সেই শোক ভুলিবার, দাবাইয়া রাখিবার প্রবল চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রাণের মহাশূন্যতা সেই কর্ম্ম-বাহুল্যে পূর্ণ হইল না। প্রাণের আকুলতায় আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলাম, শান্তির জন্য ব্যগ্র হইলাম, আশ্রয় ও শান্তি পাইলাম '**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে।**' স্বয়ং পরমহংসদেব ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী হইলেও ভ্রাতুষ্পুত্র-শোকে বিচলিত হইয়াছিলেন এবং ইহার বর্ণনা অল্প কথায় কিন্তু সুস্পষ্টভাবে করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইলাম। যাহা হউক, কথামৃত-পানে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা ও শান্তিলাভ করিলেও সমস্ত মনঃপ্রাণ ইহাতে সাড়া দিল না।

তাহার পর, আবার ৬।৭ বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যোযশোভাগী কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যু ঘটিল এবং মধ্যম পুত্রটি সেই একই সময়ে একই রোগে (টাইফয়েডে) শয্যাশায়ী হইয়া দীর্ঘকালে অতি কষ্টে রক্ষা পাইল। নিজেও পূর্ব্ব হইতে রোগে ভুগিতেছিলাম, এক্ষণে শোকে মুহ্যমান হইয়া রোগক্ষীণ শরীরের অবহেলা করাতে এবং রোগের প্রকোপে শরীরপাত হইলেই পরিত্রাণ পাই এই আশায় অনিয়মের মাত্রা বাড়াইয়া তোলাতে, শেষে দুরারোগ্য কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলাম। শরীর ও মনের এই অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় চিরাভ্যস্ত লেখাপড়ার কার্য্যে, সরস কাব্য-নাটক হইতে আনন্দ ও জ্ঞানাহরণে, সাহিত্যের মারফত আত্মপ্রকাশে আর সুখ, আনন্দ, শান্তি, সান্ত্বনা বিন্দুমাত্রও পাইলাম না। বরং সারাজীবন ধরিয়া অল্পে অল্পে সংগৃহীত স্তূপাকার গ্রন্থরাজি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিতে বা অগ্নিতে আহুতি দিতে, বিলাতী বিদ্যার জাহাজ 'দরিয়ামে ডাল্' দিতে প্রবল ঝোঁক হইল, অধ্যয়ন বিড়ম্বনা ও অধ্যাপনা 'ভূতের বেগার' বলিয়া

জ্ঞান হইতে লাগিল। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল, "আমায় দে মা পাগল ক'রে, আমার কায নাই মা জ্ঞান-বিচারে।"

অনন্যোপায় হইয়া আবার সেই 'কথামৃত'-পানে ব্যাপৃত হইলাম, এবার যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শান্তি ও সান্ত্বনা পাইতে লাগিলাম। কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, পাগল হরনাথ, সাধু নাগ মহাশয় প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশাবলীও পাঠ করিতে লাগিলাম। মনে একটা গভীর ছাপ পড়িয়া গেল। একটা কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপাঠ, জপধ্যান প্রভৃতিতে আত্মসমর্পণ করিবার সৎপ্রবৃত্তির উদয় হইল। (পিতৃদেবেরও শেষ বয়সে আচার-অনুষ্ঠানে মন বসিয়াছিল।) বহু ইংরেজীনবিশ অবিশ্বাসী অনাচারী হিন্দুসন্তানেরই শেষ দশায় এইরূপ পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং আমার এই সুমতির উদয়ে নূতন বা অদ্ভুত কিছুই নাই।

তাহার পর, বৎসরাধিক কাল দুরারোগ্য রোগভোগ; অনেক সময়ে অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা যেন নিদারুণ পুত্রশোকজনিত মনোবেদনাকেও ছাপাইয়া উঠিত। তখন সেই বহুকালের অনভ্যস্ত (কিন্তু হিন্দুসন্তানের মজ্জাগত) 'কালী কল্পতরু শিব জগদ্‌গুরু', 'দুর্গে দুর্গতিহারিণি', 'হরি নারায়ণ মধুসূদন', (গঙ্গা-নারায়ণ ব্রহ্মেরও বড় বাকী ছিল না), নাম-উচ্চারণে ও জপে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া রোগ-যন্ত্রণা ভুলিবার, সহ্য করিবার, শক্তি-আহরণে সচেষ্ট হইলাম। অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিরহে বিনোদের ব্যবস্থা পাওয়া যায়; জানি না বৈদ্যক-শাস্ত্রে রোগে বিনোদের ব্যবস্থা আছে কি না। থাকুক বা না থাকুক, সঙ্কটে পড়িয়া রোগী এ ক্ষেত্রে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইল। উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়াও কালীদুর্গা-মধুসূদন নামজপ, গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্রজপ, নানা দেবতার স্তব-পাঠ, গীতা ও চণ্ডীপাঠ (শুধু আবৃত্তি, মর্ম্মার্থগ্রহ নহে), প্রভৃতি চলিতে লাগিল, এবং নানারূপ আচার-নিয়মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিলাম।

ইহা ছাড়া, মৃত্যুভয়ে নহে (মৃত্যু তো শান্তি), যন্ত্রণার দায়ে, ক্রিয়াবান্ লোক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা চণ্ডীপাঠ, বটুকভৈরব-স্তবপাঠ, মহামৃত্যুঞ্জয় যাগ, গ্রহযাগ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইলাম। ঘোর অবিশ্বাসী অতিবিশ্বাসীতে পরিণত হইল, দর্পহারী মধুসূদনের এমনই লীলা। ত্রিরত্ন ও ত্রিলৌহ-ধারণ, কবচ-ধারণ, মণিবন্ধে দ্রব্যগুণসম্পন্ন বৃক্ষমূল-ধারণ, কিছুই বাকী রহিল না। জানি না কিসে কি হয়, যেদিন সদাচারী ব্রাহ্মণ দ্বারা বটুকভৈরব-স্তবপাঠ ও নবরূপ-পুটিত চণ্ডীপাঠ আরব্ধ হইল, সেই দিনই রাত্রি হইতে এক ডিগ্রী করিয়া জ্বর কমিতে লাগিল। ভাল ভাল কুইনিন্ খাইয়া কিছুই উপকার হয় নাই। বরং যেদিন রীতিমত কুইনিন্ সেবন চলিত সেই দিনই জ্বরবৃদ্ধি হইত, আর যেদিন কুইনিন্ বন্ধ থাকিত সেদিন জ্বরের ততটা বৃদ্ধি হইত না। তাজ্জব ব্যাপার বটে! প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর তখন বর্ষা নামাতেও হয় তো জ্বরের উপশম হইয়াছিল, কেন না জ্বরটা যে গরমের দরুণ তাহা বিচক্ষণ ডাক্তার বাবু শেষটা সাব্যস্থ করিয়াছিলেন। তথাপি আধিভৌতিক কারণটাই যে সব আর আধ্যাত্মিক কারণটা কিছুই নহে, প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, অতিপ্রাকৃতের প্রভাব এক্ষেত্রে কিছুই নাই, সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহাতে বিজ্ঞ পাঠকবর্গের অবজ্ঞার হাস্যের পাত্র হইতে হইলেও আপত্তি নাই।' শেক্স্পীয়ারের সেই সুপরিচিত বাণী আমার রক্ষাকবচ হইবে।—'There are more things in Heaven and Earth, ···Than are dreamt of in your philosophy.'

ক্রিয়াহীন অবিশ্বাসী ইংরেজীনবিশের এই ধর্ম্মচর্চ্চার সংবাদে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ নিশ্চিতই মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু আর একটি কথা শুনিলে তাঁহারা হয় তো উচ্চহাস্য করিয়া উঠিবেন—

বিশেষতঃ যাঁহারা লেখকের কণ্ঠস্বরের সহিত পরিচিত। জ্বরের ঘোরে, রোগের যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে স্তবস্তুতি, জপধ্যানে সন্তুষ্ট না হইয়া ধর্ম্মসঙ্গীত গায়িয়া একটু স্বস্তিলাভের প্রয়াস পাইতাম। এবং রোগমুক্ত হইয়াও এ অভ্যাস একেবারে ছাড়ি নাই। তবে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান চৈতন্য হইয়াছে, সুতরাং প্রতিবেশীদিগের, এমন কি গৃহস্থিত পরিজনবর্গের কাণ বাঁচাইয়া (এবং নিজেরও মান বাঁচাইয়া) গান গাই। নিজের সঙ্গীত সাধনার নমুনা-হিসাবে নহে, পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টি, কৌতূহল-নিবারণ বা কৌতুক-বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে কয়েকটি গীতের উল্লেখ করিতেছি। যখন কাণে শুনিতে হইবে না, শুধু চক্ষুঃ বুলাইতে হইবে, তখন বোধ হয় ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ নাই। তবে আরম্ভ করি। [১]

'বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ, দিতেছ, তারা।
সে কেবল দয়া তব বুঝেছি মা দুঃখহরা॥
সন্তান-মঙ্গল-তরে, জননী তাড়না করে,
ও মা তাই বহি মা সুখে শিরে দুখেরি পসরা॥' ইত্যাদি

'মা, মা, বলে আর ডাক্‌ব না, পেয়েছি পেতেছি কত যন্ত্রণা॥
ছিলাম গৃহবাসী, কর্‌লি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখ সর্ব্বনাশী॥' ইত্যাদি

'শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি।' ইত্যাদি

'মনের বাসনা শ্যামা শবাসনা, শোন্ মা বলি।
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী॥
হৃদয়-মাঝে, উদয় হইও মা, যখন কর্‌বে অন্তর্জলী॥' ইত্যাদি

'মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামা-পদ-নীল-কমলে।' ইত্যাদি

(১) যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ, গানগুলি তাঁহাদিগের সুপরিচিত। সেইজন্য ও স্থানাভাবে সমগ্র গীত কোনও স্থলেই উদ্ধৃত হইল না।

'এমন দিন কি হ'বে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে তারা ব'য়ে পড়্‌বে ধারা॥' ইত্যাদি
'সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥' ইত্যাদি
'যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মা-কে।' ইত্যাদি

বংশানুক্রমে আমরা শাক্ত, সুতরাং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের 'শ্যামাবিষয়' যেমন আমার হৃদয়ে (ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা-সত্ত্বেও) appeal করে, প্রাণে লাগে, তেমন আর কিছুতেই করে না। (পিতৃদেবও এ সব গান গায়িতে ভাল বাসিতেন, তিনি এ অকৃতী সন্তানের মত সুর-তাল-বিষয়ে আনাড়ী ছিলেন না।)

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি-নবিশ বাঙ্গালী কবির দৃষ্টান্তে কালী করালী মূর্ত্তিকে 'অনার্য্যের কালী' বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিলেও, যৌবনে এই মূর্ত্তি-দর্শনে হৃদয়ে কেমন যেন আতঙ্ক উপস্থিত হইত, ইংরেজ কবির 'Nature, red in tooth and claw' বাক্যটি স্মরণ করাইয়া দিত। শক্তির 'সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ-সৌমেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী' মূর্ত্তিই (দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, কমলা, গণেশ-জননী) 'সৌম্যানি যানি রূপানি' ভাল লাগিত, 'যানি চাত্যর্থঘোরাণি' সেগুলি ভাল লাগিত না।

কিন্তু পরিণত বয়সে মহাকালের রুদ্রলীলার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া এখন 'কালীপদ-নীলকমলে' আমার 'মন-ভ্রমরা' মজিয়াছে। এখন সেই করালী মূর্ত্তির রৌদ্র সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছি।—

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান করে হ'য়ে গিরি-গুহাবাসী॥'

স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণীর উদাত্ত সুরে এই ক্ষীণ সুর মিলাইয়া আমিও বলি, 'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।'

আবার হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ ভাব পোষণ করি না, হরিনামেও বিমুখ নহি। অত্র প্রমাণং যথা—

'হরি অন্তে যেন পাই দরশন।' ইত্যাদি

'হরি, তোমাতে আমাতে শুধু মুখের কথাতে হ'বে কি হে পরিচয়।
আমার ষোল আনা প্রাণ, সংসারেতে টান,
শুধু লোক-দেখানে বলি কোথা দয়াময়॥' ইত্যাদি

'সজল-জলদাঙ্গ, সুত্রিভঙ্গ, বাঁকা তরুমূলে।
হেরিলে হরে জ্ঞান-মন, প্রাণ পড়ে পদতলে॥' ইত্যাদি

"একবার এস শ্রীহরি।
আমার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী॥" ইত্যাদি

'একবার দাঁড়াও বংশীধারী হরি, হেরি নয়ন মুদে।' ইত্যাদি

'আমার কতদিনে হ'বে সে প্রেমসঞ্চার।' ইত্যাদি।

রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ আর তুলিলাম না। কেন না তৎকথনে, শ্রবণে, এমন কি স্মরণে, আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়।

আবার কালীকৃষ্ণের অভেদসূচক এই গানগুলিতেও আনন্দ পাই। যথা—

'আজি কেন কালী কদম্বেরই মূলে।
নরশিরহার লুকালে কোথায়, বনফুলমালা কে দিল গলে॥' ইত্যাদি

'আমার হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে॥' ইত্যাদি

'ওমা কালী, মুণ্ডমালী, একবার বনমালী-রূপ কর্ মা ধারণ।' ইত্যাদি।

শুধু কৃষ্ণকালী কেন, বিশুদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীতে, হালের কান্তকবির কান্ত-পদাবলীতেও নারাজ নহি। 'তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।'

ইত্যাদি। 'আমার মন ভুলালে যে, কোথায় আছে সে।' ইত্যাদি। 'কেন বঞ্চিত হ'ব চরণে।' ইত্যাদি। 'কবে তৃষিত এ মরু।' ইত্যাদি।

তবে সত্য কথা বলিতে কি, সাকারে যেমন ধরিতে ছুঁইতে পাই, নিরাকারে তেমন পাই না। তাই কালীকীর্ত্তন-কৃষ্ণকীর্ত্তনে যেমন প্রাণ ভরিয়া যায়, বিশুদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীতে তেমনটি হয় না। ইহা অবশ্য আমারই দোষ, নিম্নাধিকারীর কথা। আমাদের মত অবোধ অধমের হিতের জন্যই তো 'ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' 'প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্।'

যাক্, এই নীরস সঙ্গীতচর্চ্চার বিড়ম্বনায় আর কায নাই। অনেক উচিতবক্তা বন্ধু লেখকের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দেখিয়া 'রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী' ইতি শ্লোকার্দ্ধ ঝাড়িয়া অনাস্থার ভাব দেখাইয়াছেন এবং রোগ-যন্ত্রণার তাড়নাজনিত ভক্তিভাব অচিরস্থায়ী ও অধিকদূর শিকড় নামাইতে পারে না, 'কারণস্যাপায়ে কার্য্যস্যাপায়ঃ' ঘটিবেই ঘটিবে, এইরূপ মন্তব্য জারী করিয়া নিজেদের দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু পাঠকবর্গকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, এ 'ভাব'টুকু সুস্থ সবল অবস্থায়ও নষ্ট হয় নাই, স্থায়িভাব দাঁড়াইয়াছে। (It has come to stay.) সমগ্র প্রকৃতির আমূল আলোড়ন করিয়া নূতন সত্তায় পরিণত করিয়াছে। তবে ইহা স্বীকার করি যে এই 'ভাবে' এখনও বিভোর হইতে পারি নাই, জপধ্যান-ধারণায় তন্ময় হইতে শিখি নাই; হইবার অদূর বা সুদূর সম্ভাবনা আছে কিনা তাহাও জানি না। সকলই গুরুর ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অবশ্যই 'আসিবে সে দিন আসিবে।'

'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥

* * * * *

যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, তন্ত্রসারে সার তুমি ॥'

আর এ বিষয়ে বেশী বলিব না। দেখিতেছি, মহাজনের নিষেধবাণী বিস্মৃত হইয়াছি। 'আপন ভজন-কথা, না কহিও যেথা সেথা।'

বেশ বুঝিতেছি, এই সুদীর্ঘ নীরস একঘেয়ে আত্মকাহিনী পাঠকবর্গের নিরতিশয় বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে রোগভোগের বিবরণে বিরক্ত করিয়াছি, সেই বিরক্তি কালের গতিতে লোপ পাইয়াছিল, আবার চারি বৎসর পরে পাঠকবর্গকে বিরক্তির স্থলে আনন্দ দান করিব বলিয়া আরম্ভে প্রতিশ্রুতি দিয়া শেষটা উত্তক্তই করিয়া তুলিলাম। ইহা লেখকের বার্দ্ধক্যদশার অকাট্য প্রমাণ। একটু বিলাতী রসিকতার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইহা শুধু 'dotage' (ভীমরতি) নহে,—'anecdotage' বুড়াবয়সের অভ্যাস-মত 'আপন কথা চৌদ্দ কাহন'। এজন্য পাঠকবর্গের নিকট সানুনয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বিদায় লইতেছি। দীর্ঘ অবকাশ-যাপনের পর কল্য হইতে নিজের ব্যবসায়ের কার্য্যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া লাগিব, বিদেশী কবির অতুলনীয় দৃশ্যকাব্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রাণমন ঢালিয়া দিব; এই ভগ্ন দেহমন লইয়া আর যে কখনও 'জননী বঙ্গভাষা'র সেবা করিবার অবসর ও সামর্থ্য হইবে এমন ভরসা করি না। (এখন তো এই শেষ কথা বলিলাম। তবে দুষ্ট-সরস্বতী ঘাড়ে চাপিলে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানি না।)

ইতি ১৮ই আষাঢ় ১৩৩৪, রবিবার।

*** 'শেষ কথা' বর্ত্তমান বর্ষের 'মাসিক বসুমতী'র শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট
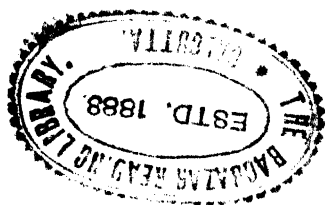
শ্মশ্রু-সংহিতা

বা

দাড়ীর কথা

('নব্যভারত', আষাঢ় ১৩২০ ;—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

"যখন জন্মিলা দাড়ী চিবুক-উপরে।
স্বর্গ হ'তে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥"

—ইতি উদ্ভট।

এ হেন পুণ্যশ্লোক শ্রীমৎ শ্মশ্রু ঠাকুর ওরফে দাড়ীর কথা লিখিতে যাইতেছি,—মা কুললক্ষ্মীগণ, তোমরা উলুধ্বনি কর, এই শুভদিনে বঙ্গের গৃহে গৃহে মঙ্গল-শাঁখ বাজাও। আদিত্যাদি গ্রহগণ এবং নক্ষত্র ও রাশি-সমূহ ইঁহার দীর্ঘায়ুঃ বিধান করুন।

যে মহাভাগের কথা বেদ, বাইবেল্, কোরান, পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার পুণ্য-কাহিনী বিবৃত করিতে ব্রতী হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, বুঝি এতদিনে আমারি শ্মশ্রুধারণ সার্থক হইল! মনে হইতেছে, আমার কথা শুনিয়া হয় তো ইঁহার আদিবিবরণ জানিবার জন্য অনেকেরই অন্তরে নিরতিশয় কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবে, তাই আমি তৎসম্বন্ধে বহুল গবেষণা ও বিবিধ তথ্যের উদ্ঘাটন এবং প্রত্নতত্ত্ববারিধি-মন্থনপূর্ব্বক যাহা কিছু উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই সর্ব্বাগ্রে সকলকে উপহার প্রদান করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণ, আপনারা "স্বস্তি" বলুন।

বাইবেল্ গ্রন্থের "জেনেসিস্" বা উৎপত্তি-শীর্ষক আদিপর্ব্বে লিখিত আছে—

"So God created man in his own image, in the image of God created he man."

অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীয় প্রতিকৃতিতে, কিনা নিজের ছাঁচে, অর্থাৎ তাঁহার অবিকল অনুরূপ করিয়া, মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আদিমানব আদম যে শুকদেবের ন্যায় দাড়ী-গোঁফ নিয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রোমের পোপ্-প্রাসাদের একটি প্রাচীন সমাধিশিলাতে ইহার অকাট্য নিদর্শন এখনো বর্ত্তমান। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, মানবের স্রষ্টা ঈশ্বরের (অথবা, স্বদেশী সৃষ্টি-প্রকরণের ভাষায় বলিতে গেলে, 'ব্রহ্মা'র) নিশ্চয়ই শ্মশ্রু আছে, কারণ যাহা ছাঁচে নাই, তাহা প্রতিকৃতিতে থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা যখন ব্রহ্মার আত্মজ, অর্থাৎ আসলের হুবহু সইমোহরের নকল, তখন ব্রহ্মাতে দাড়ীর বিদ্যমানতা স্বতঃসিদ্ধ।

এ সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্র কি বলেন তাহাও জ্ঞাতব্য। সুশ্রুতের শারীর-স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে—"শ্মশ্রুলোম.........প্রভৃতীনি পিতৃজানি।" ভাবপ্রকাশেও উক্ত আছে—"শ্মশ্রু চ লোমানি.........পিতৃজানি হি।" অর্থাৎ শ্মশ্রু প্রভৃতি পিতা হইতে জন্মে। অতএব আদিপিতা ব্রহ্মার যে শ্মশ্রু আছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

একটা অবান্তর কথা বলিতেছি। শ্রুতিতে আছে—"ত্রয়ঃ কেশিনঃ," অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিনই কেশী, কিনা তিন জনেরই চুল আছে। কেশ বলিতে 'কে মস্তকে শেতে' অর্থাৎ যাহা মস্তকে শয়ন করে, তাহাই। মস্তকের সীমা যখন গলা পর্য্যন্ত, তখন মুখস্থিত লোম অর্থাৎ শ্মশ্রু এবং গুম্ফও কেশের অন্তর্ভুক্ত। অতএব ব্রহ্মা প্রভৃতি যখন পুরুষ, তখন বেদের মতে তাঁহাদের যে চুল এবং তৎসঙ্গে দাড়ী এবং

গোঁফও আছে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না, কারণ বেদ আপ্তবাক্য, সুতরাং অভ্রান্ত। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত আছে—"মৎকেশা বসুধাতলে।" শাস্ত্রকারদের কাহারো কাহারো মতে বিষ্ণুর অপর নাম "কেশব," এই জন্য যে তাঁহার অভিরূপ কেশ আছে—"অভিরূপাঃ কেশাঃ যস্য স কেশবঃ," অথবা তিনি ভগবানের কেশরূপ অংশ হইতে জাত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, পৃথিবী দৈত্যগণের দ্বারা উপদ্রুত হইলে অজ ও শাশ্বত হরি তাঁহার একটী শ্বেত ও একটি কৃষ্ণ কেশ উৎপাটন-পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমার এই দুই কেশ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার সমুদয় ভার হরণ করিবে।" ঐ কৃষ্ণ কেশ বাসুদেবপত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে প্রবেশ করিয়া কংসারি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। অতএব গোটা শ্রীকৃষ্ণ হরির একগাছি চুল বই আর কিছুই নহেন। বিষ্ণুর যে লোম ছিল, তাহা আমরা তাঁহার শ্রীবৎসনামক বক্ষঃস্থ শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলীচিহ্ন দ্বারা অবগত হই। ভবিষ্যপুরাণের উত্তর-ভাগেও বিষ্ণুর লোম থাকার উল্লেখ দেখা যায়। শ্মশ্রুও যখন লোম-বিশেষ, এবং অতি গৌরবান্বিত লোম, এবং বিষ্ণু যখন পুরুষ, তখন উক্ত পুরাণ দ্বারাও তাঁহার দাড়ী থাকা প্রমাণ হয়।

ভবিষ্যপুরাণের একটী আখ্যায়িকা এই—পুরাকালে যখন দেবাসুর-কর্ত্তৃক ক্ষীরোদ-সাগর মথিত হয়, তখন বিষ্ণু বাহু ও জঙ্ঘা দ্বারা মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। মন্থন জন্য ঐ পর্ব্বত অত্যন্ত বেগে ঘূর্ণিত হইলে বিষ্ণুর লোম-সকল ঘর্ষিত ও উৎপাটিত হইয়া তটান্তরে সংলগ্ন এবং তাহা হইতে দূর্ব্বার উৎপত্তি হয়। ইহার উপরে অমৃতবিন্দু পতিত হওয়ায় ইহা চিরদিনের মত অজর ও অমর হইয়া সর্ব্বত্র শোভা পাইতেছে। সেই জন্যই এখনো আশীর্ব্বাদকালে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইরূপ, সমুদ্রমন্থন-কালে লোমপুঙ্গব দাড়ীর উপরেও অমৃতবিন্দু পতিত হইয়া

থাকিবে, কারণ সেই হইতে দাড়ীও অজর এবং অমর হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য ও গৌরবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এত যে ইহাঁকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্য নাপিত-পরশুরামগণ আবহমানকাল দৌরাত্ম্য করিয়া আসিতেছে, তথাপি ইহাঁর মরণ হইল না।

এই যে বিষ্ণুর লোম হইতে উৎপন্ন দূর্ব্বার কথা বলিতেছিলাম, ভাদ্র-মাসের শুক্লাষ্টমীতে উপবাসান্তে যথোপচারে ইহার পূজার বিধি আছে, ইহাকে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত বলে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে স্ত্রীলোকদিগের সন্ততিবিচ্ছেদ হয় না, পরন্তু তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ভবিষ্যোত্তরের মতে এই ব্রতানুষ্ঠান প্রত্যেক নারীরই কর্ত্তব্য। যখন নকলের পূজাতেই এত ফল, তখন অবশ্য প্রত্যেক বুদ্ধিমতী নারীই বুঝিবেন, লোমশ্রেষ্ঠ দাড়ীর পূজাতে আরো কত অধিক ফল লাভ হইতে পারে। অতএব আশা করা যায়, অদ্য হইতে নারীগণ, বিশেষতঃ পুণ্যশীলা সুসভ্যা মহিলাগণ, গৃহে গৃহে দাড়ীর অষ্টমী-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া অক্ষয় সুকৃতি-সঞ্চয় ও সন্ততিবিচ্ছেদ-নিবারণ দ্বারা নারীজন্মের পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

গারুড়পুরাণে দাড়ীর শুভাশুভ লক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"সংপূর্ণং ভোগনাং কান্তং শ্মশ্রু স্নিগ্ধং শুভং মৃদু।
সংহতং চাস্ফুটিতাগ্রং রক্তশ্মশ্রুশ্চ চৌরকঃ॥"

অতএব হে রক্তবর্ণ শ্মশ্রুধারী, দর্পণে মুখ দর্শন করিয়া সাবধান হও, পুলিস যেন থানাতল্লাসি করিয়া তোমাকে বমাল-সমেত গ্রেপ্তার করিয়া চালান না দেয়।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণের শেষাধ্যায়ে—"শ্মশ্রুমাবর্ত্ত্য পাণিনা" ইত্যাদি বাক্যে ক্রোধার্ত্তের দাড়ী-আবর্ত্তনের কথা লিখিত দেখা যায়।

দানধর্ম্মে দাড়ী-ধারণের ফল এইরূপ উক্ত আছে—

"কেশশ্মশ্রু-ধারয়তামগ্র্যা ভবতি সন্ততিঃ।"

অতএব দাড়ী ধারণ করিলে আর কাহারো নিঃসন্তান হইতে হইবে না। শ্মশ্রুধারণ সন্তান-লাভের অমোঘ, অব্যর্থ মহৌষধ জানিবে।

বরাহপুরাণে দাড়ীর ক্ষৌরকর্ম্মের কথা লিখিত আছে, এবং গোভিলের শুদ্ধিতত্ত্বেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

দাড়ীর নালিস এই—

জানি না আমি ক'ার পাকা ধানে মই দিয়াছিলাম যে, প্রাক্তন-ফলে বর্ত্তমান যুগে এক দল তথাকথিত পুরুষসিংহ দিব্য করিয়া আমার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে ফৌজদারী বালাখানার জনৈক প্রসিদ্ধ কবিরাজ "লোমশাতন চূর্ণ" বিজ্ঞাপিত করিয়া বিজয়-পাঞ্চজন্যে প্রথম সমরোল্লাস ঘোষণা করেন। কিন্তু অধিক লোক তখনও আমার নির্ম্মূলীকরণ-কার্য্যে ব্রতী হয় নাই। অধুনা একদল বিলাতফেরতা নিজেরা পরামাণিক সাজিয়া বিলাতী অস্ত্রে আমাকে ছেদন-পূর্ব্বক শিখণ্ডিরূপ ধারণ করিয়া আমার বিরুদ্ধে ভয়ানক অসদ্‌দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ও আমাকে মর্ম্মাহত করিতেছে। আমি যদিও স্বয়ম্ভূ এবং চিরবর্দ্ধনশীল, তথাপি ইহাদের বেয়াদবী আমার অসহ্য হইয়াছে। ইহাদের দেখাদেখি বহুসংখ্যক অন্যবিধ লোকও তাহাদের সুন্দর মুখ চাঁচা-ছোলা করিয়া আমার সাতিশয় ক্রোধের উদ্রেক করিয়াছে। আমার এমন নয়নাভিরাম, আনাভিলম্বিত, স্নিগ্ধকুঞ্চিত নিবিড় বপুঃ ইহাদের চক্ষুঃশূল কেন হইল, কেন ইহাদের এমন দাড়ী-phobia রোগ জন্মিল, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধ আছে, তিনিই জানেন, যখন নব-বসন্তের সান্ধ্য-সমীরণ এই বিনোদ শ্মশ্রুদামের সহিত কেলি করে, তখন কেমন মনে হয় যেন শ্যাম সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি-বিক্ষেপ হইতেছে। বিধাতার এমন সৌন্দর্য্য যে

ধ্বংস করে, আমি অভিসম্পাত করিতেছি, অচিরেই তাহার ভিটায় ঘুঘু চরিবে। যদি কোন ভগীরথ আমার ধ্বংস-প্রাপ্ত বিস্তৃত বংশকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীকে মর্ত্তে আনয়ন করেন, আর যদি আমার যুগ-যুগান্তরের কর্ত্তিত অংশ-সমূহের resurrerction (পুনরুত্থান) হয়, তাহা হইলে আমি এই কালাপাহাড়-দিগকে এখনই সবংশে ডুবাইয়া মারিতে পারি।

লোকে বলে বোবার শত্রু নাই, কিন্তু দেখিতেছি, একথা নিতান্তই মিথ্যা, আমি আজন্ম অনাদিকাল হইতে মৌনাবলম্বন করিয়া আছি, কিন্তু তথাপি নিষ্কৃতি পাইলাম না। সিদ্ধবাক্ বিষ্ণুশর্ম্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি ঠিক কথা—

"অপরাধো ন মেঽস্তীতি নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।
বিদ্যতে হি নৃশংসেভ্যো ভয়ং গুণবতামপি॥"

কিন্তু আমি আর মৌনী থাকিব না, আমি অচিরেই সভাসমিতি করিয়া এ সম্বন্ধে তুমুল agitation (আন্দোলন) আরম্ভ করিব এবং অনতিকাল মধ্যেই "Society for the Prevention of Cruelty to Beards" (দাড়ীর প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সমিতি) প্রতিষ্ঠা করিব। কিন্তু সমিতি করিবার কথা মনে হইলেই বড় ভয় হয়, পাছে সরকার বাহাদুর C. I. D.র শিকারী টিকৃটিকি-ব্যূহকে লেলাইয়া দিয়া ইহা দলন করিতে প্রবৃত্ত হন। যাহা হউক, আজ মনে বড় আক্ষেপ হইতেছে যে, W. C. Bonnerjee মহাশয় জীবিত নাই. সেই দীর্ঘশ্মশ্রু সৌম্যকান্তি মহাপুরুষ এই সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে উক্ত সমিতির সভাপতি-নির্ব্বাচনের জন্য আমাকে আর চিন্তিত হইতে হইত না।

বর্ত্তমান সময়ে সকলেই নিজের নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ত। বৈদ্য-কায়স্থ-সংবাদে আমরা Risley সাহেবের প্রসাদাৎ কবি ও game-cocks

বা ক্রীড়া-কুক্কুটের লড়াই দেখিতে পাইতেছি। বৈশ্য-সাহা-সমিতির প্রতিষ্ঠা, পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে যুগী বলা হইত, অধুনা তাঁহাদের যোগী[১] নামকরণ ও উপবীত-ধারণ, ইত্যাদি বিবিধ অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা চতুর্দ্দিকেই জাগরণ ও পুনরুত্থানের যুগের লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, এ সময়ে আমরা দাড়ীগণ শুধুই কি ঘুমাইয়া থাকিব? 'বঙ্গবাসী' প্রচার করিয়াছিলেন যে, তিব্বত-দেশীয় ছাগল তাহার লোমকর্ত্তনের অপরাধে মানুষের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিয়া বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়াছিল, আর চিবুক-সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া নির্য্যাতিত দাড়ীই কি শুধু কিল খাইয়া কিল চুরি করিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। এই 'সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী'র দিনে যুগমন্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া 'সঞ্জীবনী' নির্য্যাতিত দাড়ীকে রাহুগ্রাস হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য একেবারে কিছুই করিতেছেন না। এক সময় আমি ব্রাহ্মসমাজের নিকট কত আশা করিয়াছিলাম, পুরাকালে ব্রাহ্ম হইলেই দাড়ী তাঁহার inseparable accident (অবিচ্ছেদ্য আনুষঙ্গিক) ছিল, কিন্তু নব্যগণ ইহার ব্যতিক্রম করিয়া আমাকে বড়ই নিরাশ করিয়াছেন।

আহা, আমার দুঃখ কেন জানি হঠাৎ নবীভূত হইয়া উঠিল! মনে পড়িল আরো পূর্ব্বকালের কথা। মুসলমানগণ আমাকে কত উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কথা আপনারা একটুকু শ্রবণ করুন। হজরত মহম্মদ (দয়া) স্বয়ং কখনও আমাতে ক্ষুর প্রয়োগ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানই দাড়ী রাখিবে ও তহার প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিবে। আমার প্রতি অত্যধিক সম্ভ্রম-বশতঃ তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যাঁহারা সর্ব্বদা যুদ্ধ (অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধ) করিবেন,

১ ভাষাতত্ত্ব এই মতের সমর্থন করে। যেমন রোগীর প্রচলিত উচ্চারণ 'রুগী,' সেইরূপ 'যোগী'র প্রচলিত উচ্চারণ 'যুগী'। গোপী = 'গুপী'; লোভী — 'লুভী', দোষী = 'দুষী' প্রভৃতি তুলনীয়। ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের টিপ্পনী।

কাফেরগণ হয় তো অনেক সময় তাঁহাদের দাড়ীর অবমাননা করিতে পারে, এই জন্য তাঁহাদের দাড়ী না রাখিলেও চলে, এবং এই নিয়ম রাজাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁহার হুকুম এই যে, প্রত্যেককেই নূ্যনকল্পে একমুষ্টি ও এক বুরুল পরিমাণ দীর্ঘ দাড়ী রাখিতেই হইবে। এই সকল নিয়ম-লঙ্ঘন মুসলমান শাস্ত্রে গুণা (পাপ) বলিয়া লিখিত আছে। আর একটী প্রবাদ এই যে, যাহারা একদিনের জন্যও দাড়ীতে ক্ষুর ব্যবহার করিবে, তাহারা স্বর্গে আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা লাইলি ও মজনুর বিবাহ-দর্শন হইতে বঞ্চিত হইবে। মুসলমান শাস্ত্রে আরো লিখিত আছে যে, মনুষ্যের মুখ খোদাতালার "নুর" (আলো) দ্বারা নির্ম্মিত, এই কথা, তাহার মুখের গঠনেই প্রমাণিত হয়, কারণ আরবী ভাষায় 'নুর' লিখিতে যে কয়টী অক্ষরের প্রয়োজন, তাহার প্রত্যেকটীর আকারই মনুষ্যের মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই মুসলমানগণ আমাকে 'খোদার নুর' বলিয়া থাকেন। এমন সার্থক নাম আর কেহ আমায় দেয় নাই। বঙ্গের মুসলমানগণ এক সময় আদর করিয়া কি সুন্দর নাম দিয়া আমাকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।—

"বুল্‌বুল্‌খন্দ, নছল্‌-বন্দ,
সাবাস্‌-দাড়ী, খোদার নুর।"

এমন সময় ছিল, যখন আমার পুঞ্জীভূত ঘন নিবিড় দেহকে চিরুনী দ্বারা প্রসাধন করিতে যাইয়া যদি কোন মুসলমান ইহার ২।১ গাছি কেশ অনবধানতা-বশতঃ ছিঁড়িয়া ফেলিত, তাহা হইলে তাহাকে সযত্নে সংরক্ষণ-পূর্ব্বক দ্বিখণ্ড করিয়া তখনই গোর দেওয়া হইত। দ্বিখণ্ডীকরণ-দ্বারা স্বর্গের দূতের সঙ্গে এইরূপ সর্ত্ত সাব্যস্ত হইত যে, গোরদাতা মরণান্তে অবাধে অফুরন্ত সরবৎ ও চিরসৌন্দর্য্যময়ী স্থিরযৌবনা হুরী-সমন্বিত স্বর্গে গমন করিতে পারিত। St. Chrysostom বলিয়াছেন, এক সময়ে

পারস্যদেশীয় নৃপতিগণ স্বর্ণসূত্রের বিন্যাস-দ্বারা আমার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেন। এখনও পারস্যরাজের আকটিলম্বিত দাড়ী প্রজাবৃন্দের শ্রদ্ধা ও পূজা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে তুরস্ক-দেশেও আমার কতকটা সম্মান আছে। সেখানে কেহ কাহারও দাড়ী কর্ত্তন করিলে নিরতিশয় অপমানের কথা হয়। পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ, ভর্ত্তা ও পিতার দাড়ী চুম্বন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু সম্মান-প্রদর্শন করিলে কি হইবে, কালক্রমে মুসলমানদের মধ্যে এমন কথারও সৃষ্টি হইল যে, যাহার মাথা ছোট অথচ দাড়ী চারি অঙ্গুলীর অধিক লম্বা সে আহাম্মক। Forbes সাহেব এইরূপ গল্প সঙ্কলন করিয়াছেন যে, একদিন এক মৌলবী সন্ধ্যার সময় দীপালোকে ঐ কথাটী পাঠ করিয়া ভাবিলেন, তাঁহার মাথা ছোট, অতএব তাঁহার দাড়ী চারি অঙ্গুলীর অধিক লম্বা কি না, তাহা মাপিয়া তিনি আহাম্মক কি না, ইহা তাঁহার ঠিক করা কর্ত্তব্য। তিনি তখন হস্ত দ্বারা মুঠ করিয়া দাড়ী ধরিয়া দেখিলেন যে, তাহা চারি অঙ্গুলীর বেশী লম্বা, তখন তাহা ছাটিয়া ফেলিবার জন্য কাঁচি খুঁজিয়া না পাইয়া অগত্যা প্রদীপের শিখাতেই ধরিয়া দিলেন, আর অমনি তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, এবং দাড়ী তো পুড়িলই, সম্ভবতঃ বৈশ্বানর তাঁহার মুখখানিও চুম্বন করিয়া চিরদিনের মত চিহ্ন রাখিয়া দিলেন, এবং মস্তক ছোট ও দাড়ী চারি অঙ্গুলীর অধিক লম্বা হইলে যে মানুষ আহাম্মক হয়, মৌলবী এই উক্তির প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়া শাস্ত্রের প্রতি আস্থাবান্ হইলেন। আমার শত্রু-পক্ষীয়গণ এমনই ভাবে গল্প রচনা করিয়া আমাকে অবমানিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আমার মনে হয়, সেই হইতেই "দাড়ী" হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়া কাহারো কাহারো নিকট 'দাড়ি' হইয়া গিয়াছেন। তবেই দেখুন মুসলমানের কাছেও আমার প্রকৃত মর্য্যাদা-লাভ হইল না।

পরন্তু, দেখিতে পাইবেন, ইঁহাদের হাতে আমার আরো কত লাঞ্ছনা হইয়াছিল।

আরও প্রাচীনকালে বাল্মীকি প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ হিন্দু মুনিঋষিগণ লম্বিত শ্বেত শ্মশ্রুধারণ করিয়া আমার কত গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আর তাঁহাদের লক্ষ পুরুষ নিম্ন বংশধরগণ, আমার মনে হয় মুসলমানদিগের সহিত জেদ করিয়াই, দাড়ীর একেবারে ভিটা উচ্ছন্ন করিয়া সনাতন টিকী-দ্বারা তাহার অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দাড়ী কি নিম্নমুখ বলিয়া উর্দ্ধমুখ 'আর্কফলা'র ন্যায় ভাল Lightning Conductor (বিদ্যুৎ-পরিচালক) নয়? হিন্দুগণ দাড়ীরূপ নৈমিষারণ্য ধ্বংস করিয়াছেন বলিয়াই আজ তাঁহাদের এমন অধোগতি হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ এই নৈমিষারণ্যের লুপ্তোদ্ধার করিতে পারিলে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি আর বহুদূরে থাকিবে না। দৃশ্যমান দাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ কত অদৃশ্য ধর্ম্মবীজ-সকল যে কামাইয়া ফেলিতেছেন, তাহা কি কখনও কেহ ভাবিয়াছেন? এই দাড়ীতে হাত বুলাইয়া তো ব্রহ্মা বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতে ও ব্যাস মহাভারত, বাল্মীকি রামায়ণ, মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমর কবিতা-কদম্ব রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। দেখুন, আমার প্রসাদে আজ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কত সমাদর। সুরেন্দ্রনাথের যদি দাড়ী ছাটা না হইত, তাহা হইলে আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, তিনি Uncrowned King না থাকিয়া ভট্টপল্লীর আশীর্ব্বাদে ভারতের না হউক বঙ্গের নিশ্চয়ই Crowned King হইতেন। অহো, কি পরিতাপ, কি পরিতাপ!!

মধ্যযুগে য়ুরোপ্‌খণ্ডেও আমার প্রতি সাতিশয় সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল। আদি ফরাসী নৃপতিগণ-মধ্যে এইরূপ প্রথা ছিল যে, বিশেষ বিশেষ দলিল ও সনন্দে মোহর (seal) অঙ্কিত করিবার সময়

রাজার তিনগাছি দাড়ী মোহরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। ইহাই রাজার চূড়ান্ত অনুমোদন বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপ দলিলাদির সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজার শ্মশ্রুরাজির নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির আশঙ্কা উপস্থিত হইলে দায়ে পড়িয়া এই প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। রাজার ফ্যাশানের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য ফরাসীগণ এক বিশেষ ছন্দের গোঁফকে royale (রাজবল্লভী) এবং নিম্নোষ্ঠের অধঃস্থিত কেশকে imperiale (বাদসাহী) নামে অভিহিত করিয়া রাজ-সম্মানে নন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ফরাসী নৃপতিগণের মধ্যে আমার সংহার-কার্য্য প্রচলিত হইলে রাজা প্রথম ফ্র্যান্সিস্ দৈব-বিড়ম্বনায় চিবুকের একটি ক্ষতচিহ্ন ঢাকিবার জন্য দাড়ী রাখিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার দেখাদেখি অন্যেরাও আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

স্পেন্ দেশে কিন্তু রাজার অনুকরণে ইহার বিপরীত দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল। রাজা পঞ্চম ফিলিপ্ যখন বহু চেষ্টা করিয়াও দাড়ী উৎপাদন করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার চাটুকার আমীর-ওমরাগণ দাড়ীশূন্য চিবুক ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সময় সময় তাঁহারা দীর্ঘনিঃশ্বাস উন্মোচন করিয়া গভীর আক্ষেপের সহিত বলিতেন, "Since we have lost our beards, we have lost our souls !"—ঠিক, ঠিক !! মুসলমান শাস্ত্রে নাকি উক্ত আছে যে স্ত্রী-লোকদের আত্মা নাই, কিন্তু স্পেনের সম্ভ্রান্ত-বংশীয়গণ আমাকে হারাইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন যে দাড়ী-বিরহিত হইলে পুরুষ-নামধারিগণেরও আত্মা থাকে না। দাড়ীর ক্ষৌরীকরণ—আত্মহত্যা। Indian Penal Codeএ আত্মঘাতীর কোন শাস্তি নাই, কিন্তু আত্মহত্যার উপক্রমের জন্য শাস্তির বিধি আছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট্ কি এতদ্দেশীয় ক্ষৌরকর্ম্ম-প্রয়াসী কাপুরুষগণের কোন রূপ শাসনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না ?

পর্টুগ্যাল্‌ও আমার মর্য্যাদা-রক্ষণে অন্যান্য অনেক দেশের অপেক্ষা অগ্রগামী ছিল। পর্ত্তুগীজ্‌ রণতরী-সমূহের অধ্যক্ষ Jaun de Castro এই পুণ্য ভারত-ভূমির গোয়া নগরী হইতে এক সহস্র মুদ্রা ধার করিবার সময় একগাছি দাড়ী (pledge) প্রতিভূ-স্বরূপ দিয়া বলিয়াছিলেন, "All the gold in the world cannot equal this natural ornament of my valour."—পৃথিবীর সমগ্র স্বর্ণরাশিও আমার শৌর্য্যের এই স্বাভাবিক ভূষণের সমকক্ষ হইতে পারে না। সাবাস! বীরপুরুষ! এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া তুমি যে অনির্ব্বচনীয় পুরুষকারের পরিচয় দিয়াছ এমন আর কুত্রাপি শ্রুতিগোচর হয় নাই। তোমার এই উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস ধন্য হইয়াছে।

স্বনামখ্যাত জর্ম্মন্‌ সম্রাট্‌ Frederick Barbarossa অর্থাৎ লোহিত-শ্মশ্রু ফ্রেডারিক্‌ আমার দ্বারা চিহ্নিত এই সম্মানিত নামে অভিহিত হইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন।

ক্ষুদ্র বেল্‌জিয়মের তথাকথিত সংস্কারকগণের কথা মনে হইলে আমার শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে যাহারা আমার সংহার-কার্য্যে ব্রতী ছিল, তাহারা যে-সকল নিষ্ঠাবান্‌ সভ্য আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ধারণ করিতেন তাঁহাদিগকে অখৃষ্টান্‌ বলিয়া বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তদানীন্তন Roman Churchএর খৃষ্টান্‌গণও এইরূপ অনৈষ্ঠিক মতবাদ পোষণ করিত, সেইজন্য আমার নিরতিশয় নিষ্ঠাবান্‌ সেবক সমগ্র Greek Churchএর খৃষ্টান্‌গণের সহিত ইহাদের ভীষণ অপ্রেমের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপবাসিগণের মধ্যে আমাকে সংহার করার প্রবৃত্তিই প্রবল দেখা যাইতেছে; অপর পক্ষে এসিয়াবাসিগণের মতিগতি মোটের উপর আমাকে ধারণ করার দিকেই লক্ষিত হইতেছে। ইহাতে

অদূর ভবিষ্যতে যুরোপবাসিগণের উপর এসিয়াবাসিগণের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠারই সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। ইংরেজগণ ইহাকে divine warning মনে করিয়া বুঝিয়া শুনিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। নহিলে ভবিষ্যতে শুভ দেখি না। সম্প্রতি লাহোরের Muslim Outlook-নামক পত্রিকা আশা করিতেছেন যে ইংরেজগণ এই দেশের রাজত্ব পরিত্যাগ করিলে মুসলমানগণ, প্রয়োজন হইলে আফ্‌গান জাতির সাহায্যে, ভারতে মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠা করিবেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক অজ্ঞতা দেখা যাইতেছে। যদি সত্য-সত্যই এমন দিন আসে তাহা হইলে তখন পার্সিয়ান্‌গণেরই নেতৃস্থানীয় হওয়ার সম্ভাবনা, কারণ দাড়ীর দৈর্ঘ্যে এবং দাড়ীর প্রতি যত্ন ও সম্মান-প্রদর্শনে ইঁহারাই এসিয়ার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মুসলমান।

ইংরেজদের কাছেও আমি যে কতকটা সম্মান না পাইয়াছিলাম, তাহা নহে। দাড়ীর reverend lengthএর কথা কে না জানেন? ইংরেজের দেশে আমাকে রীতিমত ভয় করা হইত, তাহার প্রমাণ তাঁহাদের ভাষায়ই মুদ্রিত রহিয়াছে। To beard a man, to beard the lion in his den, ইত্যাদি কথার সৃষ্টি ঐ ভয় হইতে। কিন্তু রাজা অষ্টম হেন্‌রীর সময়ে ব্যবহারাজীবগণ আমার প্রতি এমনই নারাজ হইয়াছিলেন যে Lincoln's Innএর কর্ত্তৃপক্ষ দাড়ীধারিগণকে দ্বিগুণ মূল্য না দিলে আহারার্থ Great Tableএ বসিতে দিতেন না। ইহার পরে রাজা চতুর্থ এড্‌ওয়ার্ড্‌ আমার উপর টেক্স বসাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজ্ঞী মেরীর সময়ে Protestant martyrদের অধিকাংশই দাড়ীসহ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সার্ টমাস্ মোর্ আমাকে অবমানিত হইতে দেন নাই বলিয়া ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যূপকাষ্ঠে গ্রীবা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার

দাড়ীটিকে সাবধানতার সহিত বাহিরে রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "My beard hath not committed treason" আমার দাড়ী তো রাজদ্রোহে অপরাধী নয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ আমার টেক্স সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়ন করেন। এক পক্ষের বেশী বয়স্ক দাড়ীর জন্য বার্ষিক তিন শিলিং চারি পেনী টেক্স নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু এই বিধি কার্য্যকারী হয় নাই। (বরং সেই আমলে ফ্যাশান্-দোরস্ত ব্যক্তিগণ কোদালের আকৃতি দাড়ী, ফ্যাক্ড়াওয়ালা (forked) দাড়ী ইত্যাদি রকমারি কাটছাঁটের দাড়ী এবং লাল, জরদা প্রভৃতি নানান্-বর্ণী দাড়ী ধারণ করিয়া বাহার দিতেন। দাড়ীর কাট-ছাঁট দেখিয়া দাড়ীধারীর বৃত্তিব্যবসায় বুঝা যাইত।) পূর্ব্ব-কালের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু অধুনা এই ভারতবর্ষে কোন কোন খৃষ্টান্ মিশনের পাদ্রিপ্রমুখ কতিপয় শ্বেতাঙ্গ-নন্দনের আচরণ দেখিয়া আমি নিরতিশয় শঙ্কিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি।

শাস্ত্রে আছে—"স্তনকেশবতী নারী রোমশঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
উভয়োরন্তরং যচ্চ তদেব স্যান্নপুংসকম্॥

এই নপুংসক শিখণ্ডীদিগকে দেখিলে যাত্রাভঙ্গ হয়, অথচ ইহারা এই কলিকাতা সহরে নৈকষ্য হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অবাধে বুক ফুলাইয়া বিচরণ করিতেছে, দুঃখের কথা আর কত বলিব!

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, রুষিয়ার সম্রাট্ পিটার্ দি গ্রেট্এর নিকট আমি বড়ই লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম। তিনি অহঙ্কৃত হইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত আমার উপরে টেক্স বসাইয়া ছিলেন এবং সেই টেক্স-আদায়ের জন্য প্রত্যেক সহরের বহির্দ্বারে কেরাণী মোতায়ন করিয়াছিলেন। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের প্রত্যেকেরই দাড়ীরূপ Luxury বা বিলাসিতা সম্ভোগ করার জন্য এক মুদ্রা ও তদূর্দ্ধ শ্রেণীর লোককে ১০০ মুদ্রা করিয়া টেক্স দিতে হইত। আর যাঁহারা এই আইন

অমান্য করিতেন তাঁহাদিগকে জোর করিয়া কামাইয়া দেওয়া হইত। সম্রাট্ পিটার্ কি এই বীরত্বের জন্যই the Great আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হরি, হরি, দুঃখের কথা বলি কা'র ঠাঁই! এ দেশেও কখন কখন কোন কোন হাকিমের দাড়াতঙ্ক-রোগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যদিও ততটা বাড়াবাড়ি দেখা যায় না।

দৈব-দুর্বিপাক হইতেও আমার যে বিড়ম্বনা হয় নাই, এমন নহে। যাঁহারা Old Testament পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাচীন হিব্রুযুগের দাড়ীর plague এর কথা অবগত আছেন। কিন্তু কেহই যখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না, তখন আমি আর এই সম্বন্ধে অভিযোগ করিব না। অপর পক্ষে আমি করুণাময় স্রষ্টার অপরিসীম দয়ার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। "Neither shalt thou mar the corners of thy beard", বাইবেল্ গ্রন্থে ইহা মহান্ ঈশ্বরের আদেশ। কিন্তু হায়, আধুনিক খৃষ্টান্দের মধ্যে কয়জনই বা এই আদেশ পালন করিয়া থাকেন? বাইবেলের প্রতি খৃষ্টান্দের আর তেমন আদর ও সম্মান দেখা যায় না। আমার বিভিন্নরূপ বিন্যাস ও ব্যবহারে কিরূপে শ্মশ্রুমান্ পুরুষের শোক ও হর্ষ, অহঙ্কার ও নিরাশা প্রভৃতি জ্ঞাপিত হইত তাহার বহু দৃষ্টান্ত বাইবেলের নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এই দিকে খেয়াল করে কে?

প্রাচীন গ্রীস্‌দেশেও আমি সম্মানিত হইয়াছিলাম। ঐ দেশের মুকুটমণি সক্রেটিসের মস্ত লম্বা দাড়ী ছিল, এবং লোকে ঐ দাড়ীকে তাঁহার অলৌকিক জ্ঞানের চিহ্ন মনে করিত। সেই জন্য তাঁহার জনৈক শিষ্য (Persius) তাঁহাকে 'Magister Barbatus' অর্থাৎ Bearded Master বা দীর্ঘশ্মশ্রু গুরু বলিতেন। কিন্তু দীর্ঘতা-সম্বন্ধে জর্ম্মন্ চিত্রকর যোহন মেয়ো (Johann Mayo) আমাকে যেমন গৌরবান্বিত করিয়াছেন,

এমন আর কেহই করেন নাই। এই চিত্রকরের দাড়ী এত দীর্ঘ ছিল যে, তিনি যখন দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তাঁহার দাড়ী মৃত্তিকা স্পর্শ করিত, সেই জন্য তাঁহার চলন-কার্য্যের সৌকার্য্যার্থে তিনি কখন কখন তাহা দোভাঁজ করিয়া বাঙ্গালীর ধুতির কোঁচার ন্যায় কটিবন্ধে গুঁজিয়া রাখিতেন। এই শ্মশ্রুমান্ পুরুষ John the Bearded বলিয়া খ্যাত হন। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী মেরী একবার মস্কো নগরে ৪ জন এজেণ্ট্ পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজনের দাড়ী ৫ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা ছিল। ইঁহার এই দীর্ঘ শ্মশ্রু-সন্দর্শনে রুষিয়ার সম্রাট্ স্বয়ং Ivan the Terribleএর ভীষণ মুখচ্ছবিতেও হাসির ছায়াপাত হইয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে পুরুষের দাড়ী ১২ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু নারীর চুল ৮ ফুটের বেশী লম্বা হইতে দেখা যায় নাই। হে বিবাহ-বাসরের সুরসিকা বাক্‌চতুরা ঝুনো প্রাচীনাগণ, এখন 'বর বড়, না ক'নে বড়' তোমরা তাহা ঠিক করিয়া নাও। প্রাচীন রোম্‌রাজ্যে এক সময়ে আমাকে খারিজ (abolish) করা হইয়াছিল। তখন আমাকে ধারণ করা Barbarism অর্থাৎ বর্ব্বরতার অথবা দাসত্বের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু মহামনাঃ Frankগণ আমাকে সযত্নে ধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের দেশে দাসগণকে দাড়ী কামাইতে বাধ্য করিতেন। ইহার পরে এমন সময় আসিল যখন রোমের যুবকগণ আমার প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রচুর দাড়ী-উৎপাদনের জন্য চিবুকে এক প্রকার তৈল ব্যবহার করিতেন এবং নিজদিগকে barbatulus বা স্বল্পশ্মশ্রু বলিয়া গৌরব করিতেন। যাঁহারা দীর্ঘ দাড়ী রাখিতেন তাঁহাদিগকে গ্রীসের মহামতি Socratesএর ন্যায় barbatus বা দীর্ঘশ্মশ্রু আখ্যা দেওয়া হইত। সম্রাট্ নীরো দেবতা Jupiter Capitolinusকে তাঁহার কয়েকগাছি দাড়ী অর্ঘ্যরূপে অর্পণ

করিয়াছিলেন। Israel-বংশীয় ইহুদিগণ দাড়ীহীন মিশর দেশ হইতে আমাকে নিরাপদে রক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করার প্রথা অপেক্ষাও ইহুদি-প্রভৃতি জাতির আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করার গুরুত্ব অনেক অধিক। প্রাচীন মিশরীয়গণ যদিও আমাকে ধারণ করিতেন না তথাপি আমার গৌরব-সম্বন্ধে ইঁহারা উদাসীন ছিলেন না। আনন্দোৎসবের সময় ইঁহারা কৃত্রিম দাড়ী ধারণ করিয়া নিজেদের পুরুষকারের পরিচয় দিতেন, আর ইঁহাদের পুরুষ-দেবতাগণকে ইঁহারা দাড়ী দ্বারা শোভিত করিতেন।

আমার কর্ত্তন অথবা ক্ষৌরীকরণ লইয়া তাতার ও পারসিকদের মধ্যে এবং তাতার ও চীনাদের মধ্যে যে কত যুদ্ধঘোষণা ও রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। টলটলায়মান Celestial Empire-বাসী চীনাগণ নিতম্ববিলম্বিত [২] টিকীর বড়াই করিয়া আমাকে নির্য্যাতন করিয়াছিল, সেইজন্য ইহাদের বেণীসংহার তো হইয়াছেই, অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি কে বলিতে পারে?

আমার অঙ্গীকার এই যে, 'ঋতং বদিষ্যামি', সত্য বলিব, প্রাণান্তেও সত্য গোপন করিব না। তাই বক্ষঃ বিদীর্ণ হইলেও আমার একটি মহা অপমানের কাহিনীর উল্লেখ এখানে করিতেছি। আমার নিষ্ঠাবান্ পৃষ্ঠপোষক এক নৃপতির নিকট একটী অজাত-শ্মশ্রু যুবক দূতরূপে প্রেরিত হইলে নৃপতি তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন সেই দুর্বিনীত যুবক উত্তরে বলিয়াছিল, 'আমার প্রভু যদি আগে জানিতেন যে আপনার

(২) নিতম্ব স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু যাহাদিগের লম্বিত ও বদ্ধবেণী দেখিলে নারী-ভ্রম হয় তাহাদিগের বেলায় এ শব্দটি ঠিকই হইয়াছে।—ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকা কারের টিপ্পনী।

নিকট দাড়ীর মূল্যই বেশী, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমার পরিবর্ত্তে একটী ছাগলকে আপনার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিতেন।' কি অপমান! কি অপমান! ছাগলকে উপমান করিয়া আমার প্রতি এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্যবাণ বর্ষণ করিল! কিন্তু "Sufferance is the badge of our tribe," তাই আমি সমস্ত অপমান গলাধঃকরণ করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া আছি।

আমাকে কামাইবার প্রথা প্রতীচ্যদেশে সর্ব্ব-প্রথম অধঃপতিত গ্রীক্ কাপুরুষগণের দ্বারাই প্রচলিত হয়। Alexander the Great, Peter the Greatএর মতই তথাকথিত Great ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি যখন দেখিলেন যে যুদ্ধকালে শত্রুগণ সৈন্যদের দাড়ী-আকর্ষণ-পূর্ব্বক সহজেই জয়ী হইতে পারে, তখন Macedonian armyকে দাড়ী কামাইতে আদেশ করিলেন। ইহার ফলে গ্রীক্ জাতির কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা কাহারো অবিদিত নাই। রোম্ যখন ধ্বংসোন্মুখ, তখন সিসিলি-দ্বীপবাসী গ্রীক্জাতীয় ক্ষৌরকারগণের নিকট হইতে রোমকগণ দাড়ী কামান শিক্ষা করিল। বিখ্যাত Scipio Africanusই দৈনিক ক্ষৌরকার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক, এইজন্য ইনি ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ক্ষৌর-কর্ম্মিগণ এই প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষের নাম মুখস্থ করিয়া রাখুন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে রোমন্থন করিয়া ধন্য হউন। কোন কোন কাপুরুষ রোমক সম্রাট্ পাছে ক্ষৌরকার তাঁহার গলা কাটিয়া দেয় এই ভয়ে দাড়ী কামান হইতে বিরত হইলেন। রোমান্দের মধ্যে যখন কোন যুবকের দাড়ী প্রথম কামান হইত তখন বিশেষ সমারোহ ও উৎসব হইত, উচ্চবংশীয় কোন লোক ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং তিনি এ যুবকের ধর্ম্মপিতা হইয়া থাকিতেন, যুবক

সেই দিবস নানা প্রকার উপঢৌকন প্রাপ্ত হইত এবং বহুলোক আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। দাড়ীর এই প্রথম ফসল সাধারণতঃ কোন গৃহদেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত হইত।

মুসলমানদের মধ্যে সেলিম-নামক ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক সুলতান প্রথম দাড়ী কামান। প্রধান পুরোহিত ইহার প্রতিবাদ করিলে ইনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, ইঁহার উজির সাহেব যাহাতে তাহা ধরিয়া টানিয়া ইহাঁকে চালাইতে না পারেন তজ্জন্য তিনি তাহা সংহার করিয়াছেন। বলিহারি যাই সুলতানজির পুরুষকার! আমার সংহারকার্য্যের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কতদূর অপরাধী তাহা শ্রবণ করুন। পুরাকাল হইতে দার্শনিক ও ধর্ম্মযাজক-প্রভৃতি পুরুষোত্তম-গণের নিকটই আমি অধিকতর সমাদৃত হইয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু প্রায় দুই হাজার বৎসর যাবৎ বৌদ্ধভিক্ষুগণ আমার প্রতি হিংসা-পরায়ণ হইয়া আমাকে মর্ম্মাহত করিয়াছেন। আজকাল বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ও অনুশীলন চলিতেছে। Research Scholarগণ জানিয়া রাখিবেন, মহাত্মা বুদ্ধদেবের 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' এই মহানির্দ্দেশ তাঁহার শিষ্য ও অনুবর্ত্তিগণ যেমন জবাই করিয়াছেন এমন আর কেহ করে নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সশ্মশ্রু গুম্ফকেশাদির বংশ নাশ করিয়া অহিংসার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে আমার আধিপত্যের এমনই প্রসার ছিল যে, কোন কোন বিধুমুখীও তখন শ্মশ্রুমুখী হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা "ক্বচিৎ ক্বচিৎ ব্যভিচারী, ছাগীর মুখে যথা দাড়ী" এই শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। য়ুরোপখণ্ডেও নারীজাতির মুখকমল আমার দ্বারা অলঙ্কৃত হয় নাই এমন নহে। ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে Venice-নগরীতে এক নর্ত্তকীর আবির্ভাব হয়, ইহার large

bushy beard ছিল। এই শ্মশ্রুমতী বিধুমুখীর নর্ত্তন ও তৎসঙ্গে ঘন ঘন শ্মশ্রু-সঞ্চালনে না জানি কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছিল! সম্রাট্ Charles XIIএর সৈন্যদলস্থ একটী স্ত্রীলোকের দেড় গজ লম্বা দাড়ী ছিল। Pultowaর যুদ্ধে ইহাকে বন্দী করা হয় এবং ১৭২৪ খ্রীঃ অব্দে Czar এর নিকট উপহার-রূপে প্রেরণ করা হয়। ১৮৫২-৫৩ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডন্ নগরে strong black beard ও large whiskers-সমন্বিত একটী নারী প্রদর্শিত হয়। এমন আরো অনেকের কথা ইতিহাসে উক্ত আছে। বর্ত্তমান সময়ে যুগধর্ম্ম-প্রভাবে যখন কোন কোন নারীর পুংবদ্ভাব দেখা যাইতেছে, তখন আর কিছু না হউক ব্যাকরণের সামঞ্জস্য-রক্ষার জন্য কালক্রমে ইঁহাদের কোমল কপোলে আমার নবোন্মেষ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।[*] আহা, এমন শুভদিন কি হইবে, আবার কি আমার বিজয়-বার্ত্তা কামিনীর কমনীয় কণ্ঠে নিনাদিত হইবে, রমণীর মুখপঙ্কজের চতুর্দ্দিক্-স্থিত দাড়ীরূপ শৈবালের আবেষ্টনের মধ্যে মেঘের কোলে সৌদামিনীর ন্যায় তাঁহাদের চারু আস্য দেখিয়া বিগত জীবনের সকল নির্য্যাতন, সকল লাঞ্ছনা ভুলিতে পারিব!

ভারতের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিলে কাহার না মনে আনন্দের সঞ্চার হয়? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণার্জ্জুন, বীর হুঙ্কার, গাণ্ডীব-টঙ্কার, হনূমান্‌চন্দ্রের সূর্য্যকে বগলে ধারণ ও উল্লম্ফনে সাগর-লঙ্ঘন-

---

(*) কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আশঙ্কা করিতেছেন যে আজকাল নারী-মহলে মস্তকের কেশচ্ছেদনের (Bobbed hair) যে ফ্যাশান্ হইয়াছে তাহার ফলে অচিরে নারীর গোঁপদাড়ী গজাইবে, কেন না একস্থানে কেশের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথ রোধ করিলে অন্যত্র তাহার উদ্ভব হইবে। ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ।

ইত্যাদি যখন স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে, তখন আমার এই সঙ্কুচিত প্রাণটার কি বিপুল সম্প্রসারণ অনুভব করি! কিন্তু কেহ কি একটু তলাইয়া দেখিয়াছেন যে কবিকল্পনার এই অতিজাগতিক দৌড়ের মূল কোথায়, আর এই আর্য্যভূমির পূর্ব্ব গৌরবের আদি-কারণই বা কোথায়? পিতামহ ব্যাস ও আদিকবি বাল্মীকির নিশ্চয়ই আপাদ বা আজানু বা অন্ততঃ আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু ছিল, যাহাতে হাত বুলাইয়া তাঁহারা এই সমস্ত অপূর্ব্ব সৃষ্টি লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা"; একালে জীবিত থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন, "হায়, সেই দাড়ীই বা কোথায়, আর কবি-কল্পনাই বা কোথায়"? "O Tempora! O Mores!" আমার পরম সৌভাগ্য যে বর্ত্তমান সময়ে Dr. Ruddock-প্রভৃতি মনীষিগণ ওজস্বিনী ভাষায় আমার দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। উক্ত ডাক্তার-প্রবর বলেন,—

"The beard and moustache are a kind of natural respirator. Can we doubt the wisdom and beneficence of the Creator in giving this ornament to man, who is so frequently exposed to atmospheric vicissitudes, and withholding it from the woman, who, as she keeps at home, requires no such appendage? Hair is an imperfect conductor of both heat and cold, and placed round the entrance of the lungs, acts as a blanket which promotes warmth in cold weather, and prevents the dissolving of ice in hot weather. In many instances, the hirsute appendages

would protect lawyers, clergymen, or other public speakers, and singers, from the injurious effects of rapid variations of the atmosphere, from which professional men so often suffer. The beard and moustache should be permitted to grow, as they afford an excellent protection to the delicate organs of the voice.........the hair planted on the human face by the wisdom and goodness of the Creator, has its uses, and we may add, its beauties. Let the young man, therefore, never become a slave to the false and pernicious fashion which compels him to shave off the beard, as it is found contributory to the health, if not the personal improvement, of those who wear it."

অতএব হে ব্যবহারাজীব, হে ধর্ম্মযাজক, হে গায়ক, শিক্ষক ও প্রচারক-প্রমুখ বাগ্মিগণ, যাহারা গলাবাজি করিয়াই খাও, তোমরা উৎকর্ণ হইয়া এই সাহেব মহোদয়ের কথা শ্রবণ কর। এই বর্ত্তমান শুভমুহূর্ত্তেই সংকল্প করিয়া বাগ্‌যন্ত্রকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমাদের কণ্ঠের উপকণ্ঠে দাড়ীরূপ মসৃণ ও সুশোভন কম্বল-ধারণের জন্য কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও। মাভৈঃ, আমি বলিতেছি কুচ্-পরোয়া নাই, তোমাদের বাক্‌শক্তি নিশ্চয়ই আয়ুষ্মতী হইবে।

ডাক্তার রাডক্ আরো বলেন যে, দাড়ীকে Cultivate করা অর্থাৎ দাড়ীর রীতিমত চাষ করা কর্ত্তব্য। কি অপূর্ব্ব উপদেশ! ডাক্তার সাহেবের লেখা ও লেখনীর উপর স্বর্গ হইতে পুষ্প-চন্দন বর্ষিত হউক। হে ক্ষৌরকার ও স্বায়ত্ত-ক্ষৌরব্রতধারিগণ, অদ্য হইতে তোমরা নৃশংস লোমসংহার-বৃত্তি-পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে লোমশ্রেষ্ঠ দাড়ীর চাষ

করিতে থাকহ। এ দেশের লোক কেন যে ক্ষৌরকর্ম্মীকে আবহমানকাল অযাত্রা বলিয়া আসিয়াছে, তাহার গূঢ় কারণ এতদিনে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। আর হে ইংরেজগণ, হে পুণ্যশীল রাডক্ সাহেবের স্বজাতীয়গণ, তোমরা পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া থাক। আমার চাষ করিলে, আমাকে দীর্ঘ করিলে, কাহার সাধ্য তোমাদিগকে হ্রস্ব করিতে পারে? আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমরা ঈদৃশ কৃষিকার্য্যে নিষ্ঠার সহিত নিরত থাকিলে এবং যথারীতি আমার তোয়াজ করিলে তোমাদের Rule Britannia অনন্ত-কাল বজ্র-গম্ভীর-নির্ঘোষে দিগ্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিবে।

লেখকের নিবেদন—

দাড়ীর সাহিত্য ক্রমশঃ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। বেদ, বাইবেল্, কোরান, পুরাণ এবং বিভিন্ন দেশের ইতিহাস প্রভৃতি ছাড়াও প্রাচীনকালে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ এবং মহা-মনীষী Homer, Vergil, Pliny, Plutarch, Herodotus, Diodorus ও Emperor Julian প্রভৃতি এবং মধ্যযুগে Beaumont and Fletcher ও Shakespeare প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থে দাড়ীর সম্বন্ধে কত তথ্যই না লিপিবদ্ধ রহিয়াছে? বর্ত্তমান যুগে বিগত শতাব্দীতে James Ward, R. A., 'Defence of the Beard' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের দোহাই দিয়া দাড়ী জন্মান-সম্বন্ধে অষ্টা-দশটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"What would a Jupiter be without a beard? Who would countenance the idea of a shaved Christ!" ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে আর একজন ইংরেজ 'Shaving, a breach of the Sabbath and a hin-drance to the spread of the Gospel' নামে একখানা গ্রন্থ

লিখিয়াছেন। এই অবস্থায় আমার মনে হয় মহাযশাঃ দাড়ীর তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী Post-graduate chair of Research into the History and Antiquity of Beards প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিধেয়। গবেষণার এমন বিস্তৃত বিষয় আর কি হইতে পারে? শ্রীমৎ শ্মশ্রু কালে অনাদি এবং দেশে সর্ব্বব্যাপী, কালভেদে ইঁহার উৎকর্ষ অপকর্ষ, আদর অনাদর, অভাব প্রাদুর্ভাব, স্বল্পতা ও প্রাচুর্য্য, ঋজুত্ব ও বক্রত্ব, হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা প্রভৃতি এবং দেশভেদে ইঁহার ঘনত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি, বর্ণভেদ ও অগণিত প্রকার-ভেদ এবং বর্ণাদি-ভেদে পরিধায়ীর প্রকৃতিভেদ ও জাতিভেদ বিশেষ গবেষণার বিষয় সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্যকর ও সহজপাচ্য আহারে ইঁহার কোমলত্বের বৃদ্ধি এবং শুষ্ক, অপুষ্টিকর ও দুষ্পাচ্য আহারে ইঁহার সজারুর শলাকার ন্যায় কঠিনত্বের বৃদ্ধি হয়। মেঁদিপাতা ও নানাবিধ কলপের দ্বারা ইঁহার বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়। ইহার সম্বন্ধে এত কাহিনীর লুপ্তোদ্ধার হইয়াছে ও হইতে পারে যে তদ্দ্বারা দাড়ীর একটী প্রকাণ্ড অষ্টোত্তর-শত পর্ব্ব মহাভারত রচিত হইতে পারে। আশা করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান Vice-Chancellor ইতিহাসজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় আমার এই suggestionটী বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

পূজনীয় 'নব্যভারত' সম্পাদক মহাশয়, আপনি নব্য-ভারতের আপামর সকলের মুখপাত্র এবং মুকুল-যৌবন হইতে মধুর বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত একান্ত নিষ্ঠার সহিত শ্মশ্রু ধারণ করিয়া ইঁহার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, সেই জন্য দাড়ীর জন্মপত্রিকা ও ন্যায্য অভিযোগ আপনার দেশবিশ্রুত পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া তাহা আপনার নিকট অর্পণ করিলাম। আপনি দয়া করিয়া ইহা মুদ্রিত, ও সম্ভবপর হইলে শ্মশ্রুদেবের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক দুই এক ছত্র

লিপিবদ্ধ, করিলে নিরতিশয় সুখী হইব। আপনার জয়-জয়কার হউক, যতদিন আপনি দাড়ীর সম্মান রক্ষা করিবেন, ততদিন আপনার অসম্মান করে কাহার সাধ্য !

উপসংহার।

'নব্যভারতে' প্রকাশিত 'দাড়ীর কথা'-শীর্ষক প্রবন্ধটীকে কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া, 'শ্মশ্রু-সংহিতা বা দাড়ীর কথা' এই নূতন নামে উপরে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ফলে প্রবন্ধটী স্থানে স্থানে (anachronism) কালব্যতিক্রম-দোষে দুষ্ট হইল। সময়াভাবে তাহা সংশোধন করিতে পারিলাম না। আশা করি সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ এই ত্রুটী উপেক্ষা করিবেন। প্রবন্ধটীর সহিত বঙ্গের পুরুষশার্দ্দূল স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির কিঞ্চিৎ যোগ আছে। এই কথা তাঁহার দেহত্যাগের পর প্রসঙ্গক্রমে 'বঙ্গবাণী'তে লিখিয়াছিলাম। এই খানেও তাহা উল্লেখ করিতেছি। 'নব্যভারতে' প্রবন্ধটী প্রকাশিত হওয়ার পর সংস্কৃত কলিজিয়েট্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক বন্ধুবর রসিকলাল রায়ের নিকট একদিন শুনিলাম আমার বহুমানাস্পদ সতীর্থ, বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক, রসরাজ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বিদ্যারত্ন মহাশয় আমার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া, স্বীয় 'অনুপ্রাসের অট্টহাসে' যে অফুরন্ত আমোদপ্রিয়তা ও হাস্য-পরিহাসের নমুনা বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন তাহারই একটু ছিটাফোঁটা প্রবন্ধ-লেখককে লক্ষ্য করিয়াও ব্যয় করিয়াছিলেন।

রসরাজের appreciationএ উৎসাহিত হইয়া মনে করিলাম প্রবন্ধটীর

'শ্মশ্রু-সংহিতা' নামকরণ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে মুদ্রণ ও 'গুঁফো-সরস্বতী'র নামে উৎসর্গ করিলে কেমন হয়? কয়েকদিন পরে একটু আমোদ করিবার জন্য mood বুঝিয়া আশুতোষের নিকট এই প্রস্তাব করিব, এই ভাবিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। কিন্তু আমাকে আর moodএর অপেক্ষা করিতে হইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সহকারী রেজিষ্ট্রার্ সতীর্থ সুহৃদ্বর চন্দ্রভূষণ মৈত্র পূর্ব্বেই আমার উক্ত প্রবন্ধের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। আমি সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি বলিলেন, 'দাড়ীর সম্বন্ধে নাকি রগড় ক'রে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে?' আমি বলিলাম "'শ্মশ্রু-সংহিতা' নাম দিয়া বইয়ের আকারে প্রবন্ধটী গুঁফো সরস্বতীর নামে dedicate কর্‌তে চাই।" আশুতোষ তাঁহার সেই চিরপরিচিত প্রাণকাড়া ঐন্দ্রজালিক হাসি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, 'এই নামের copyright তো পাঁচকড়ির, তা'র permission নিয়ে আপনি ইহার যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচকড়ি তা'র monopoly ছাড়বে কি? তা'র অনুমতি না নিয়ে ব্যবহার কর্‌লে সে যদি তা'র copyright এর infringementএর জন্য নালিশ করে, তা'হলে Justice Mookerjee হয় তো তা'র পক্ষেই decree দিবেন।' বন্ধুবর দেবীপ্রসন্ন বাবু আমার নিকট এই গল্প শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া আশুতোষের উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলেন। আশুতোষ এখন পরলোকে। ইহলোক ও পরলোকে সম্বন্ধ আছে। তাই ঈপ্সিত নূতন নামকরণ করিয়া আজ প্রবন্ধটী তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম। আশা করি ইহা তাঁহার প্রসন্নতা-লাভে সমর্থ হইবে।

ললিত বাবু তাঁহার 'দাড়ী-মাহাত্ম্য'-নামক প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে আমার এই প্রবন্ধটী মুদ্রিত করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন।

ESTD. 1883
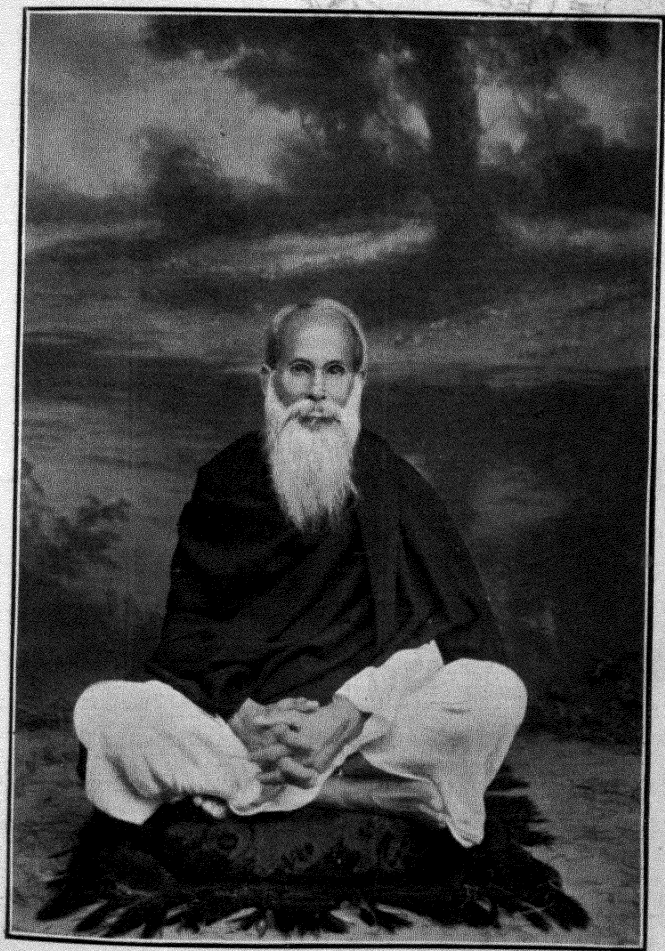
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়

(৩৩ পৃঃ ও পরিশিষ্ট ১৮৩—২১০ পৃঃ)

আইন-মতে লিখিত অনুমতি আবশ্যক। এতদ্দ্বারা আমি সানন্দে তাঁহাকে এই অনুমতি দিলাম। ললিত-কৌমুদীর সহিত ক্ষীণ খদ্যোতালোকের সমাবেশ কিরূপ শোভন হইবে তাহা তিনিই জানেন।*

আর একটী কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। ভরসা এই, কথাটী অরসিকে রহস্য-নিবেদন হইবে না। আমি যখনই ললিত বাবুর সুঠাম ও সুললিত মুখচ্ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার কেবল এই কথাই মনে হয়, আহা, এমন সাধের চিবুক 'রইল পড়ে, আবাদ করলে ফলত সোনা?' যিনি সাহারায় ফোয়ারা ছুটাইতে পারেন, তিনি যে তাঁহার উর্ব্বর চিবুকক্ষেত্রটীকে আবাদ

* বন্ধুবর বিনয় ও সৌজন্য-বশতঃ নিজেকে যতই খাটো করুন, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব, আমার অকিঞ্চিৎকর 'দাড়ী-মাহাত্ম্য' অপেক্ষা যে তাঁহার 'শ্মশ্রুসংহিতা' বা 'দাড়ীর কথা' শতগুণে শ্রেষ্ঠ ইহাতে সন্দেহ নাই। সমজদার পাঠকের উপর বিবাদ-মীমাংসার ভার রহিল। বন্ধুবর যে এই vein আর cultivate করিলেন না, এই বড় আপশোষ। অন্ততঃ, তিনি যখন 'গুঁফো-সরস্বতী'র গুণমুগ্ধ, তখন 'গোঁফের কথা' বা 'গুম্ফ-সংহিতা' প্রণয়ণ করিলেও দাড়ী-গোঁফ যুগলে মিলিত ভাল। যাহা হউক, জ্ঞানী দার্শনিক-দিগের দোষ এই যে তাঁহারা অনেকেই যে সত্য প্রচার করেন, নিজ-জীবনে সে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন না। কিন্তু আমার এই পুরাতন সতীর্থের জ্ঞান-গবেষণার এইটুকু তারিফ করিতে হয় যে, তিনি (লেখনী)-মুখে যাহা বলিয়াছেন কাযেও তাহা দেখাইয়াছেন, আযৌবন বক্ষোবিলম্বী শ্মশ্রু ধারণ করিয়া দাড়ীর সম্মান ও নিজের বাক্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের চক্ষুঃকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য তাঁহার সেই দীর্ঘ-শ্মশ্রুল মুখমণ্ডলের আলোকচিত্র প্রবন্ধের অঙ্গরাগ-স্বরূপ মুদ্রিত হইল। 'দাড়ী-মাহাত্ম্যে'র পাদটীকায় (৩৩পৃঃ) উপরে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া পাঠককে পুরাতন 'নব্যভারত' এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পাঠককে পুরাতন ফাইল্ আর ঘাঁটিতে হইল না, শ্রীশ বাবু আমার অনুরোধে তাঁহার প্রবন্ধটি আমার পুস্তকের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সংসাধন করিয়া ইহার উপাদেয়তার উৎকর্ষসম্পাদন করিয়াছেন। এতদুভয় কার্য্যের জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে পুরাতন সতীর্থের সহিত পুনর্মিলন হইল—সুকুমার সাহিত্যের মারফত। সকলই মা-সরস্বতীর কৃপা। ইতি—

গ্রন্থকার।

ও তৃণশষ্পে শোভিত না করিয়া সাহারাবৎ পতিত জমিতে পর্য্যবসিত করিয়া রাখিবেন, আর গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে অলীক মৃগতৃষ্ণিকার চিত্র-মাত্র অঙ্কিত করিয়াই দাড়ীহত্যারূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন—এ কেমনতর কথা! দাড়ীঘাতকের দাড়ীমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—ভাবিলেই অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটী অলঙ্কার যুগপৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ত্তা ও কার্য্যের অভেদত্ব যখন শাস্ত্র-সম্মত, তখন দেখি ললিত বাবু স্বয়ং একটী জীবন্ত মূর্ত্ত Oxymoron (বিরোধালঙ্কার)! এইরূপ বিসদৃশ দৃশ্যের দর্শন, এমন কি চিন্তন পর্য্যন্ত আর এই দীন বন্ধুর প্রাণে বরদাস্ত হইতেছে না। সুধু তাই কি?—আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, কোন রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাই ইহা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অতএব সমজদার সুরসাল রসরাজের নিকট সমগ্র স্বদেশবাসীর সনির্ব্বন্ধ আনুপ্রাসিক অনুরোধ এই যে, তাঁহার সুদুর্ল্লভ সংসারলীলা-সমাপনের সহিত সুমধুর সাহিত্যলীলা সংবরণ করিবার পূর্ব্বে জীবনের সামঞ্জস্য-সংরক্ষণ ও সার্থকতা-সম্পাদনের জন্য অন্ততঃ জন্মশোধ আর একটীবার সুলম্বিত, সুবিন্যস্ত ও সুদর্শন শ্মশ্রুলীলার পেখম বিস্তার করিয়া তাঁহার উদ্দাম উদ্ভ্রান্ত রসবন্যার প্লাবনে বঙ্গদেশকে সিক্ত করিয়া দিয়া যাইতে আজ্ঞা হয়। * ইতি। ২৪এ জুন, ১৯২৭ শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়

* 'ক্ষৌরকর্ম্ম ও নির্ব্বেদ' (২২—২৫ পৃঃ) তথা 'দাড়ীমাহাত্ম্য' (৩৫—৩৬ পৃঃ) প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সকল কথাই বলিয়াছি, নিজের কথাও ছাড়ি নাই। এখন মরণকালে মরণকামড়ের মত দাড়ী আঁকড়াইয়া ধরিলে বড়ই বিসদৃশ হইবে। অথচ বন্ধুবরের এই অনুরোধ রক্ষা না করিলেও অকৃতজ্ঞতা হইবে। উভয়-সঙ্কট বটে। ইহার একমাত্র মীমাংসা, যদি কখনও গুরুকৃপায় ৺কেদারনাথ ও ৺বদরীনারায়ণ-দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে মাসাধিক কাল দুর্গম পথে ক্ষৌরকারের অভাবে কেশশ্মশ্রু-বৃদ্ধি হইবে, বন্ধুবরকে সেই জঙ্গলী মূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি বলিয়া বুঝাইব। ইতি গ্রন্থকার।

সম্পূর্ণ

ফোয়ারা

শোভন (চতুর্থ) সংস্করণ

সুন্দর সিল্কের কভারের উপর মরুভূমি ও ফোয়ারার ত্রিবর্ণ চিত্র, বুক্-এণ্ডে কাশীর মন্দিরঘাট প্রভৃতি বিচিত্র দৃশ্য। পরিশিষ্ট নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে আলো, ব্যর্থ প্রয়াস, সাহিত্যের নেশা ও নূতন চুট্‌কী আছে। ফোয়ারার আর নূতন পরিচয় কি দিব? ইহা ভাবের ফোয়ারা, ভাষার ফোয়ারা, হাসির ফোয়ারা, রসের ফোয়ারা। গরুর গাড়ী, সুখের প্রবাস, বিরহ, কৃষ্ণকথা, বোধোদয়ের ব্যাখ্যা, বর্ণমালার অভিযোগ, পত্নীতত্ত্ব, পাণ, প্রত্যেকটিই রসে ভরপূর।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"আপনি বঙ্গ-সাহিত্যে এমন একটী ফোয়ারা দান করিলেন, 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে ভোগ মজা নিরবধি'।"

"ভাষার কোমলতায়, ভাবের মধুরতায়, বিকাশের দক্ষতায়, প্রয়োগের শিষ্টতায়, ললিতকুমারের রসিকতা সাহিত্যের সম্পৎশোভা-সম্বর্দ্ধক।"

বঙ্গবাসী

"সত্যই রসের ফোয়ারা। রচনায় পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু পাণ্ডিত্যের চেয়ে সরসতার জন্যই ফোয়ারার আদর বেশী হইবে।"—**বঙ্গদর্শন**

"ষোলটি বিষয় সুললিত সরস ভাষায় লিখিত। প্রতি প্রবন্ধে কৃতিত্বের পরিচয়। যিনি পড়িবেন তিনিই মোহিত হইবেন।" **নব্যভারত**

"হাস্যরসের অবতারণায় লেখকের দক্ষতা অসাধারণ। এ হাস্যরস-ধারায় এতটুকু পঙ্কিলতা নাই। পাঠে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষালাভ হয়।" **ভারতী**

"এই পুস্তক জীবনসংগ্রামে বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালীর অবসরকালকে হাস্যময় করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানেও পরাঙ্মুখ হইবে না।"— **প্রবাসী**

পাগলা ঝোরা

তামাকু-তত্ত্ব, শ্যামের বাঁশী, বিবাহে বিবিধ বাধা, বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষ, বঙ্কিম-চর্চ্চরী, ভর্ত্তার উত্তর (বিখ্যাত 'স্ত্রীর পত্রে'র জবাব), ধর্ম্মে মতি, কাশীবাস প্রভৃতি ১৮টি প্রবন্ধ এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ফোড়ার ফাঁড়া ও অভিনব লীলাশুক সংযোজিত হইয়াছে। ইহা 'ফোয়ারা'রই মত হাস্য-রসের ফোয়ারা, কেবল শেষ দিকে করুণ-রসের সমাবেশ।

"কৌতুক-রচনার আঠারো ধারা।" **প্রবাসী**

"এই গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্র ও শেষ প্রস্তাব 'কাশীবাস' প্রথমে বাদ দিয়া পাঠকগণ পুস্তকখানি পড়িবেন, তাহা হইলে অতুল আনন্দ উপভোগ করিবেন ; লেখকের মুন্সীয়ানায় মুগ্ধ হইবেন, শত মুখে প্রশংসা করিবেন। তাহার পর 'কাশীবাস' ও উৎসর্গ-পত্র পড়িয়া লেখকের গভীর বেদনার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিবেন— 'পাগলা-ঝোরা' নাম সার্থক হইবে।" **ভারতবর্ষ**

"এই গ্রন্থে 'তামাকু-তত্ত্ব' 'মশক-সঙ্কট' প্রভৃতি সতেরোটি সরস সহাস ও 'কাশীবাস' নামে একটি অশ্রু-সজল সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে। কৌতুক-সন্দর্ভগুলিতে বহু স্থলে লেখক সহজ সত্যের সহিত সরল হাস্যধারা মিশাইয়া দিয়াছেন। কোথাও অশ্লীলতার পাঁক নাই। গ্রন্থকারের 'ফোয়ারা'র ন্যায় 'পাগলা-ঝোরা'ও বাঙ্গালী পাঠকের অবসর-টুকুকে প্রমোদহাস্যে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল করিবে।" **ভারতী**

"ফোয়ারা অপেক্ষা এই গ্রন্থখানিতে অধ্যাপক মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা অধিকতর উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শেষ সন্দর্ভটি পুত্র-শোকাতুর পিতার মর্ম্মভেদী হৃদয়োচ্ছ্বাস। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর।" **বসুমতী**

কাব্যসুধা

সুন্দর রেশমী কাপড়ে বাঁধাই

এই নাটক-নভেলের অবাধ প্রচারের দিনে যাহাতে আমাদের গৃহ-লক্ষ্মীগণ নাটক-নভেল হইতেও ননদ-ভাজে, শ্বাশুড়ী বৌএ ও বোনে বোনে সদ্ভাব-সম্প্রীতির আদর্শ আহরণ করিয়া পারিবারিক জীবনে তাহার অনু-বর্ত্তন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার, প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যা-য়িকাবলিতে ও সাধারণতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে এই তিনটি সম্পর্কের যে সকল চিত্র আছে, সেগুলির তুলনায় সমালোচনা ও সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে একান্নবর্ত্তী পরিবার-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইহা গৃহে গৃহে নারী-সমাজে পঠিত হইলে লঘুসাহিত্য-পাঠের অপকারিতা সংশোধিত হইবে।

স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত—

"এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রিত গার্হস্থ্য-জীবনের সৌন্দর্য্য আপনি এতই সুন্দরভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া মনে হয় যথার্থই 'কবিতা-রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।' আপনার এই সমালোচনা কেবল সাহিত্যবিষয়ক নহে, মনস্তত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ববিষয়ক প্রচুর শিক্ষা দান করে।"

"আশা করি, এই সুলিখিত ও সুদৃশ্য বইখানি গৃহলক্ষ্মীদিগের নিকট সমাদৃত হইবে এবং সমালোচনা বিষয়ের একখানি উৎকৃষ্ট বই বলিয়া সাধারণ সাহিত্যিকদিগেরও সমাদর লাভ করিবে।"—**প্রবাসী**

"নূতন আলোকসম্পাত করিতেছেন।……বাঙ্গালী মাত্রেই বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের সকলকেই এই 'কাব্যসুধা' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"—**ভারতবর্ষ**

"The learned Professor has done the reading public of Bengal a distinct service by reprinting in a collected form the essays .....The book is nicely printed and elegantly bound in silk."—**The Bengalee.**
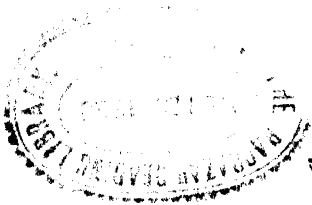
অনুপ্রাস

একাধারে ভাষাতত্ত্ব ও রসরচনা। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা-কর্ত্তৃক অঙ্কিত চারিবর্ণে মুদ্রিত হরগৌরীর মনোরম চিত্রসমেত।

প্রবাসী, মানসী, ভারতী, নব্যভারত, ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে প্রশংসিত।

"এ সংগ্রহ কেবলমাত্র শব্দের তালিকা নয়; ললিত বাবু বিচিত্র শব্দকে সংলগ্ন ভাবের মালায় গাঁথিয়া রসিকতায় সরস করিয়া তুলিয়াছেন।......অনুপ্রাস-আলোচনা-প্রসঙ্গে এই পুস্তকে এত খাঁটি বাংলা শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে যে কোষকার, ব্যাকরণকার, ভাষার অন্তর্নিহিত ধাঁচার অনুসন্ধান-কর্ত্তা ইহার মধ্যে অনেক মশলা পাইবেন।"—**প্রবাসী**

সখী

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশ-নন্দিনী, মৃণালিনী প্রভৃতিতে যে সকল সখীত্বের সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহাতে সে গুলির বিশদ আলোচনা আছে। পুস্তকের প্রথম অংশে সখীর কার্য্য ও প্রয়োজনীয়তা, সখীর শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচার আছে।

"সমালোচনায় সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় আছে। বাংলা সাহিত্যে এ রকম বই নূতন।"—**প্রবাসী**

"সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির ও কাব্যসৌন্দর্য্যবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বইখানি ছোট, কিন্তু মূল্যবান্।"—**বসুমতী**

(পরিবর্দ্ধিত) **ককারের অহঙ্কার** (২য় সংস্করণ)

নিষ্ক্রয় এক শিকি ও এক আনা, এক কথায় পাঁচ আনা। পকেট সংস্করণ, পরিষ্কার কাগজ, চমৎকার ছাপা। এই সাহিত্যকৌতুক অবকাশ-যাপনের পক্ষে আবশ্যক, কেননা আরামদায়ক।

'কেতাবের কভার কমনীয়—ককারের অহঙ্কার উপভোগ্য যোগ্য।' —**বসুমতী**।

'হাস্যরসাত্মক রচনা। পাঠকের হৃদয়ে যে হাস্যরসের সঞ্চার করে, তাহা ক্ষণিক, কিন্তু দীপ্ত ও উজ্জ্বল।'—**মানসী**।

'গভীর ভাষাজ্ঞানের পরিচয় এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে। সুন্দর লিপিচাতুর্য্য। পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম।'—**নব্যভারত**

'ককার-বহুল শব্দাবলীর সংগ্রহে ও বিন্যাসকৌশলে লেখকের কৃতিত্ব আছে।'—**হিতবাদী**।

'এই বই পড়িলে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের সাহায্য হয়; অনেক জানা কথার কৌতুককর সমাবেশ দেখিয়া আনন্দ হয় এবং যাহা অজানা এমন কথার ইঙ্গিত পাইলে তাহা জানিবার জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল হয়।' —**প্রবাসী**।

"বইখানি পড়িতে বেশ মজা লাগে—কথার ফাঁকে ফাঁকে একটা হাসির তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। লেখক গোড়া হইতেই এমনই তীব্র কৌতূহলের সঞ্চার করিয়াছেন যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ করিতেই হইবে। কোথাও গবেষণার প্রয়াস নাই, বিষয়টি যেমন লঘু, তেমনই স্বচ্ছ, সরল ইহার বর্ণনাভঙ্গী। বিশ্রামক্ষণটুকুকে আনন্দমুখর করিবার পক্ষে পুস্তিকাখানি উপাদেয় হইয়াছে।'—**ভারতী**।
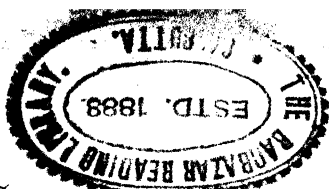
(পরিবর্দ্ধিত) **কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব** (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ইহাতে নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ, অন্যান্য কবির অঙ্কিত সমশ্রেণীর কয়েকটী নায়িকার সহিত তুলনা, নায়িকার পরিবেষ্টনী ও নামের উপযোগিতা, কাব্যের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে 'গল্পের গঠন' (structure of the story) নামে একটি নূতন পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা রচনার রস সৌন্দর্য্য কৃতিত্ব বিশেষত্ব অতি বিচক্ষণ পাণ্ডিত্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার বই অতি অল্পই আছে ; ইহা তাহাদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে।"

—প্রবাসী

"গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্যবলে ললিতকুমার বঙ্কিম-প্রতিভার ষোলকলা বিস্তার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

—নব্যভারত

"শ্রীযুক্ত ললিতবাবু এই পুস্তকে তাঁহার অতুলনীয় সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; যাঁহারা কপালকুণ্ডলা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই এই তত্ত্ব পাঠ করা উচিত।"— ভারতবর্ষ

"ইউরোপীয় সাহিত্যের এবং এদেশীয় প্রাচীনতর সাহিত্যের অনুরূপ সৃষ্টির সহিত তুলনা করিয়া তিনি কপালকুণ্ডলার যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।"— প্রতিভা

"On the whole the volume appears to us to strike out a completely new path in the department of Criticism in our lIterature."—BENGALEE.